জহির রায়হান

রচনাবলী

দ্বিতীয় খন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির রায়হান রচনাবলী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী
সম্পাদিত

আহমদ পাবলিশিং হাউস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ১৯৮১
মাঘ ১৩৮৭

পঞ্চম মুদ্রণ | এপ্রিল ২০১০
বৈশাখ ১৪১৭

প্রচ্ছদ | রফিকুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ZAHIR RAIHAN RACHANABALI [2nd Part] Edited by Dr. Ashraf Siddiqui, Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. 1st Edition : January 1981 & 5th Print : April 2010
Price : Tk. 250.00 only.
ISBN 984-11-0389-1
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাইয়ুম চৌধুরী

বন্ধুবরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কখন প্রথম দেখা হল অমর কথাশিল্পী জহির রায়হানের (শহীদ) সঙ্গে? হ্যাঁ, –তিনি তখনও অমর হন নি, সাহিত্যের আসরে গতায়াৎ শুরু হয়েছে মাত্র– দেখা হল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শহীদ মিনারের দিকের তখনকার অস্থায়ী বাঁশের বেড়া দেওয়া শেডে, যেখানে থাকতেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক শহীদ আলিম চৌধুরী, তখন অবশ্য মেডিক্যালের উপরের শ্রেণীর সিনিয়র ছাত্র, যিনি জহির রায়হানেরই আত্মীয়, মেডিক্যাল কলেজের সতীর্থ এম. এ. কবীরের সঙ্গে বের করতেন, 'খাপছাড়া', 'যাত্রিক', প্রভৃতি পত্রিকা। সে-সব পত্রিকায় আমিও লিখেছি নিয়মিত। জহির সেখানে আসতেন পরিধানে পাজামা-সার্ট, বেটেখাটো মানুষটি গল্প করতেন, বেশ কিছুটা লাজুক, পড়তেন সম্ভবত জগন্নাথ কলেজে আই. এস-সি। জহিরের প্রথম গল্প 'হারানো বলয়' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানতে পেরেছি, ঐ 'খাপছাড়া' অথবা 'যাত্রিক' পত্রিকায়। জহির এই পত্রিকা দু'টির ব্যাপারে, যতদূর মনে পড়ে পরিশ্রমও করতেন, কারণ মেডিক্যালের উপরের শ্রেণীর দু'জন সিনিয়র ছাত্রের কারো পক্ষেই প্রেসে দৌড়-ঝাঁপ, লেখা জোগাড় বা প্রুফ দেখা সম্ভবত সম্ভব ছিল না। মরহুম ড. চৌধুরী ছিলেন যদিও সম্বন্ধে আমার চাচা-শ্বশুর, তবু তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে, প্রায় সময়ই থাকতেন আমার শ্বশুরালয়ে, ৩৭ নাজিমুদ্দিন রোডে যেখানে হন্তদন্তভাবে প্রুফ বা লেখাসহ কখনও দেখা যেত জহিরকে। পরিচয় হয়েছিল আমার স্ত্রীর ছোট ভাই লতিফ চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি ভাষা আন্দোলনের সময় সম্ভবত ছিলেন কারা-সঙ্গী। জহিরকে তখনই মনে হ'ত খুব ব্যস্ত, হাতে যেন কত কাজ, এতটুকু যেন সময় নেই। এরপর দেখা হয়েছে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজের (মরহুম) জনসন রোডের 'চিত্রালী' অফিসে, '৫৮ বা '৬০-এ, তখনও খুব ব্যস্ত, পাজামার বদলে তখন পেন্ট হাওয়াই শার্ট –। তবে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে, যতদূর মনে পড়ে, খুব সজাগ মনে হত না। এরপর ১৯৬৯-৭০ এর শেষের দিকে, সেই উত্তাল গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে হঠাৎ করেই এলেন, চিরাচরিত ব্যস্তসমস্ত, ১০নং গ্রিন রোডের বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে, কয়েক বছর পূর্বের দৈনিক বাংলা পত্রিকা এবং একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে প্রাচীন তথ্যপঞ্জি ঘাটতে। আমি বোর্ডের পরিচালক। গবেষণা বিভাগের শ্রদ্ধেয় আলী আহমদ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল- কতদিন এসেছিলেন, কখন আসতেন খবর রাখা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত– কোন ফিল্মের কাহিনীর ব্যাপারে তথ্য প্রয়োজন ছিলো, কি সে প্রয়োজন– কাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের কোন গবেষক নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আই.এস-সি পাশ করে জহির মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন শুনেছি, হয়তো '৫৭-৫৮-তে ডাক্তার হয়ে বের হতেও পারতেন কিন্তু তা হবার নয়। ১৯৫৮-৫৯-এ তাকে দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ক্লাসে। এ সম্বন্ধে তার একজন সতীর্থ বলেছেন :

'ছাত্র হিসেবে সিরিয়াস ছিলেন না। হপ্তায় একদিন কিংবা বড় জোড় দু'দিন ক্লাসে আসতেন। দু-একটা ক্লাস করেই হুট করে চলে যেতেন। ক্লাসে আসতেনও এমন সময় যখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, ক্লাসে রুলকলও প্রায় শেষ। চুপটি মেরে পেছনের বেঞ্চিতে বসতেন। হাতে খাতাপত্র থাকত না, টিওটোরিয়েলও জমা দিতে দেখিনি কোনদিন। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার বা সেমিনারে বসে বই পড়ার অছিলায় আড্ডা মারার সময় ছিল না তার। ভীষণ ব্যস্ত মনে হত তাকে; যেন ব্যবসায়ী কেউ, সখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এসেছেন [শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, ১৯৭৩, মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পৃ ২৬৮] তখনই সম্ভবত চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, হয়তো নতুন স্বপ্নে রোমাঞ্চিত, পরে আর তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করতে দেখা যায় নি। কিন্তু দেখা গেল বাংলাদেশের উন্মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে হাজার বছরের বাংলাদেশ তার ক্যানভাস আর সেখানে ছবি আঁকছেন তিনি কলম আর ক্যামেরার মাধ্যমে। সেখানেও ছিল সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে, ছলনা, বঞ্চনা ও কপটতার বিরুদ্ধে।

জহিরের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ, আরেক শহীদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের অনুজ। নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কিন্তু ধর্মপরায়ণ ও রক্ষণশীল পরিবারে ৫ই আগস্ট ১৯৩৩ সালে তাঁর জন্ম। বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ছিলেন আলিয়া মাদ্রাসার মুদাররেস– স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ এবং কিছুটা রক্ষণশীল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জহির পড়াশোনা করেন কলকাতার বিখ্যাত মিত্র ইন্সটিটিউশনে– পরে আলিয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগে। বাবার হয়তো ইচ্ছা ছিল পুত্র কালে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর বাবা কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। জহির নোয়াখালী গ্রামের বাড়ি চলে যান। সেখানে আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৫০ সনে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ সনে আই.এস-সি পাশ করেন। এরপর কিছুদিন মেডিক্যালে পড়ে ১৯৫৬-৫৮-এর সেসনে, ১৯৫৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স পাশ করেন। কিছুদিন এম.এ. পড়াশোনা করলেও শেষ পর্যন্ত, পূর্বেই উক্ত হয়েছে, পরীক্ষা দেয়া তাঁর হয় নি।

অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার শুধু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। অগ্রজের প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, জহিরও এসব আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁকে কারাগারে আটক থাকতে হয়। মুক্তিলাভের পর চলচ্চিত্রের দিকে একাগ্রতার জন্য সম্ভবত তিনি কলকাতার প্রমথেশ মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফী স্কুলে ফটোগ্রাফী শেখার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু যতদূর শোনা যায়, বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ আদান-প্রদানের অসুবিধার জন্য তিনি খরচ চালাতে অসমর্থ হন এবং ঢাকায় ফিরে আবার আই.এস-সি ক্লাসের পড়ায় মগ্ন হন। ছাত্রজীবনে ছেদ পড়ার আগেই ১৯৫৬-এর শেষের দিকে উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরার' পরিচালক লাহোরের স্বনামপ্রসিদ্ধ কারদার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি তাকে তার সহকারী মনোনীত করেন। এরপর চিত্র পরিচালক সালাউদ্দিন ও এহতেশামের সহকারী হিসেবেও তাঁর কাজ করার সুযোগ ঘটে। 'যে নদী মরু পথে' ও 'এ দেশ তোমার আমার' ছবি দু'টিতে জহির ছিলেন তাদের নির্ভরযোগ্য সহকারী। ১৯৫৬-এ ঢাকায় ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা জহিরের জন্য রূপালি সোনালি দিগন্তের হাতছানি নিয়ে এলো। নিজেই হলেন এরপর পরিচালক। ১৯৬১-এ মুক্তি পেল 'কখনো আসেনি'। এরপর বাংলা উর্দু ও ইংরেজি ছবি-'সোনার কাজল' 'কাচের দেয়াল' 'বেহুলা', 'জীবন থেকে নেয়া', 'আনোয়ারা', 'সঙ্গম', 'বাহানা', 'জ্বলতে সুরুজ কে নীচে', 'লেট দেয়ার বি লাইট', (অসমাপ্ত) ইত্যাদির বিস্ময়কর আবির্ভাব। এছাড়াও আরও প্রযোজনার সঙ্গেও ছিলেন যুক্ত। ইংরেজি ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছিল তার বাংলা উপন্যাস 'আর কতদিন'-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ছবি শেষ না হতেই এলো পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াবহ কালো কুটিল রাত্রি। জহির গেলেন মুজিবনগর, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ নিয়ে তৈরি করলেন প্রামাণ্য চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'। তারই তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠলো বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়ন' এবং আলমগীর কবিরের 'লিবারেশন ফাইটার্স'। ১৯৬১–১৯৭১, মাত্র এই কয় বছরে চলচ্চিত্র শিল্পে যে অবদান রাখেন তা সত্যি বিস্ময়কর। উপযুক্ত ট্রাডিশন বা ট্রেনিং না থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশে যে কিরূপ প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে এবং প্রতিভাশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিত্র শিল্পে যে কি নতুন নতুন টেকনিক বা দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারে তার প্রমাণ– দুর্লভ প্রমাণ– জহির রায়হান। তাঁর বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন পুরস্কারেও সম্মানিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভুবনে তাঁর কি অবদান এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের পরিচয়– সে আর এক ভুবনের কথা। স্কুল জীবনে বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায় কোথায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সে পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো গবেষণার অপেক্ষায়। তবে যতদূর জানা যায়, দশম শ্রেণীতে পাঠকালে ১৯৪৯-এ বামপন্থী পত্রিকার কলকাতার 'নতুন সাহিত্যে' তাঁর 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। জহিরের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি; একটি গল্প সংকলন, অন্য পাঁচটি উপন্যাস। 'সূর্যগ্রহণ' (১৩৬২ গল্প-সংকলন),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাস ঃ 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৩৬৭), 'হাজার বছর ধরে', (১৩৭১), 'আরেক ফাল্গুন' (১৩৭৫) 'বরফ গলা নদী' (১৩৭৬) এবং 'আর কত দিন' (১৩৭৭)। 'হাজার বছর ধরে' ১৯৬৪-তে আদমজি পুরস্কার লাভে ধন্য হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী তাঁকে ১৯৭২-এ মরণোত্তর একুশে ফেব্রুয়ারি পুরস্কার দানে সম্মানিত করে। আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপ, খেটে খাওয়া মানুষ, বাংলার মমতাময়ী মা ও নারী ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। তাঁর সাহিত্যের চরিত্র ও মটিফ-মটিফিম্ বিচিত্র– নিতান্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে এসব চরিত্র চিত্রণ সম্ভব নয়। পরিচিত প্রকৃতি পাঠশালা থেকেই এসব মটিফ-মটিফিম্ সংগৃহীত– সন্দেহমাত্র নেই।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, ঢাকা এসে শুনলেন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার নিখোঁজ ১৪ই ডিসেম্বর থেকে। উন্মাদের মত খুঁজতে লাগলেন ভাইকে সর্বত্র– এমন কি রেডক্রসের সাহায্যে পাকিস্তান পর্যন্ত– যদি বন্দি হয়ে নীত হয়ে থাকেন। '৭২ এর ৩০শে জানুয়ারি মিরপুরে কারফিউ জারি করে সার্চ পার্টি পাঠান হল, কোন এক গোপন সংবাদ পেয়ে হাবিলদার হানিফের সঙ্গে নিজেই গেলেন মিরপুরে ভয়াবহ ১২ নং সেকসনে। সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। চক্রান্ত জাল ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেই হলেন পৃথিবীর জঘন্যতম এক দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ চক্রান্তের শিকার। জহির রায়হান রচনাবলী প্রকাশনার পর পাঠক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য ধারণার যোগসূত্র হবে আরও গভীরতর, নতুন যুগের সমালোচকগণ লিখবেন তার গ্রন্থের উপর আরও বিস্তৃত আলোচনা। প্রয়োজন হবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনারও। বাংলা একাডেমীর শহীদ বুদ্ধিজীবী রচনাবলী প্রকল্পের এই খণ্ডগুলি আহমদ পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হবেন– এ বিশ্বাস আমাদের আছে। গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের তথ্য সংকেত ও টীকা-টিপ্পনী অংশে আরও বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য কোন্ কোন্ পত্র-পত্রিকায় এবং কবে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয় সে সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকবে। জহির রায়হান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এখনও অপ্রতুল। এই অবস্থায় কোথাও ভুলত্রুটি থেকে গেলে তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অবশ্যই তা পরিশোধিত হবে– এ আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এ রচনাবলীর বহুল প্রচার কাম্য।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মে ১৯৮০

ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

আর কত দিন ❑ ১৩—৩৪

তৃষ্ণা ❑ ৩৫—৭৮

কয়েকটি মৃত্যু ❑ ৭৯—১০৪

জহির রায়হানের গল্পসমগ্র ❑ ১০৫—২২৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

শহীদ জহির রায়হান

জন্ম : ৫ আগস্ট ১৯৩৩, মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কত দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই।
শেষ নেই মৃত্যুরও।
তবু মানুষ মানুষকে হত্যা করে।
ধর্মের নামে।
বর্ণের নামে।
জাতীয়তার নামে।
সংস্কৃতির নামে।
এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে।
হিংসার এই বিষ লক্ষ কোটি মানব সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।
জীবনকে জানবার আগে।
বুঝবার আগে।
উপভোগ করার আগে।
ঘৃণার আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে অসংখ্য প্রাণ।

কিন্তু। মানুষ মরতে চায় না।
ওরা বাঁচতে চায়।
এই বাঁচার আগ্রহ নিয়েই গুহা-মানব তার গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।
সমুদ্র সাঁতরেছে।
পাহাড় পর্বত পেরিয়েছে।
ইতিহাসের এক দীর্ঘ যন্ত্রণাময় পক্ষ পেরিয়ে সেই গুহা-মানব এগিয়ে এসেছে অন্ধকার থেকে আলোতে।
বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে।
মানুষের এ এক চিরন্তন যাত্রা।
জ্ঞানের জন্যে।
আলোর জন্যে।
সুখের জন্যে।
তবু আলো নেই।
তবু অন্ধকার

অন্ধকারের নিচে সমাহিত মৃত নগরী।
প্রাণহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তার অবয়ব।
দীর্ঘ প্রশস্ত পথগুলোতে কবরের শূন্যতা।
ভাঙ্গা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো। আর মৃতদেহ।
কুকুরের।
বিড়ালের।
পাখির।
আর মানুষের।
একটা।
দুটো।
তিনটে।
অগণিত।
জীবনের স্পন্দনহীন নগরী শুধু এক শব্দের তাণ্ডবের হাতে বন্দি।
যেন অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার বন্য ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করছে।
যেন অনেকগুলো পাগলা কুকুর।
কিম্বা রক্তপিপাসু সিংহ। বাঘ।
অথবা একদল মারমুখো শূকর শূকরী।

আর সেই বন্যতার ভয়ে ভীত একদল মানুষ নোংরা অন্ধকারে একটি ঘরের ভেতরে; ইঁদুর যেমন করে তার গর্তের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে আছে।

আতঙ্কে অস্থির মুখ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে ওদের।
একদল ছেলে বুড়ো মেয়ে।
যুবক। যুবতী।
আর একটি সন্তান-সম্ভবা মহিলা।
অন্ধকারের আশ্রয়ে নিজেদের গোপন করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা।
একটা বাচ্চা ছেলে খুক্‌খুক্ করে কাশলো।
সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘুরে তাকালো ওর দিকে।
দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছে। খবরদার, আর শব্দ করো না।
যদি না পারো দু'হাতে চেপে রাখো।
নইলে ওরা আমাদের অস্তিত্বের কথা টের পেয়ে যাবে।
তাহলে কারো রক্ষা নেই।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটি স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে শুয়ে। যন্ত্রণাকাতর মুখে চারপাশে তাকাচ্ছে সে।

সবাই তাকে দেখছে। শব্দ করো না।
কয়েকটা আরশুলা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেলো বাইরে।

মুহূর্তে সবার মুখ ফেকাসে হয়ে গেলো।

শ্বাস বন্ধ হলো।

এই বুঝি মৃত্যু এলো।

দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো। শুনুন। দরজা খুলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। পাশের বাড়ির বুড়ি মায়ের কণ্ঠস্বর। বিশ্বাস করুন। আমি আপনাদের বাঁচাতে এসেছি। কোন ভয় নেই। দরজা খুলুন।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

ভেতর থেকে কেউ কোন উত্তর দিলো না ওরা।

কে যেন চাপা স্বরে বললো, না না, দরজা খুলো না। ওদের কোন বিশ্বাস নেই। বাইরে শব্দ শুনতে পাচ্ছো না? ওরা ওই বুড়িটাকে পাঠিয়েছে। আমাদের খুন করবে।

সেই শব্দের দানব ধীরে ধীরে কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

শুনুন। দরজা খুলুন। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দোহাই আপনাদের দরজা খুলুন। আবার সেই বুড়ি মা'র কণ্ঠস্বর।

একটা ছেলে সামনে এগিয়ে যেতে আরেকজন পেছন থেকে ধরে ফেললো। কোথায় যাচ্ছো?

দরজা খুলে দেবো।

না। না। না। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর এক সঙ্গে প্রতিবাদ করলো।

না। না। না।

কেন?

ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।

মরতে হলে বিশ্বাস করেই মরবো। ছেলেটি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো।

এক ঝলক আলো এসে পড়লো আতঙ্কিত মুখগুলোর ওপরে। একটা চাপা আর্তনাদ করে ওরা পরস্পরের বাহুর নিচে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলো। না। না। আমরা আলো চাই না।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ি মা। হাতে তার জ্বলন্ত একটা মোমবাতি। চোখ জোড়া শান্ত। স্নিগ্ধ।

আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আসুন। আমার সঙ্গে আসুন আপনারা।

অনেকগুলো ভয়ার্ত চোখ। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

আসুন। আমার সঙ্গে আসুন।

আসন্ন মৃত্যুর চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে ওরা শ্রেয় মনে করলো।

হয়তো তাই, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ওরা।

বুড়ি মা'কে অনুসরণ করে এগিয়ে এলো সামনে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটিকে দু'জনে দু'দিক থেকে সাবধানে তুলে নিলো। ধুলোয় ভর্তি অপরিসর করিডোর দিয়ে কয়েকটা ইঁদুর ছুটে বেরিয়ে গেলো এপাশ থেকে ওপাশে। চমকে উঠলো সবাই।

মোমবাতির সলতেটা বার কয়েক কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কিছু না। ইঁদুর। বুড়ি মা সবার দিকে তাকিয়ে ভরসা দিলো।

করিডোরটা যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে একটা সরু সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় এসে বুড়ি মা দেখলেন তাঁর তিন সন্তান সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে ওরা এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

মনে হলো মায়ের আচরণে ওরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নি। মা এগিয়ে গেলেন সামনে।

একটা ছোট্ট গলির মতো ঘর। রান্নাঘর ওটা।

বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে চুলোয় আঁচ দিচ্ছিলো। ঘুরে তাকালো ওদের দিকে। তার চোখেমুখে কৌতূহল।

ঘরের মাঝখানে ছাদের কাছাকাছি কাঠ দিয়ে তৈরি একটা বাক্সঘর।

সিঁড়ি লাগানো।

বুড়ি মা বললেন, ভয়ের কিছু নেই। আপনারা ওর মধ্যে লুকিয়ে থাকুন। আমি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেবো। কেউ টের পাবে না।

আশ্রিত মানুষগুলো বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

আমি জানি ওর মধ্যে থাকতে আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হবে। কিন্তু প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই পৃথিবীতে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে বাক্সঘরের মধ্যে উঠে গেলো ওরা।

উনিশ জন মানুষ।

বাচ্চা। বুড়ো। পুরুষ। মেয়ে। যুবক। যুবতী।

আর আসন্ন সন্তান-সম্ভবা মহিলাটি।

বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দিলেন বুড়ি মা। সিঁড়িটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

রাস্তায় সহস্র ধ্বনির একত্রিত পাশবিক চিৎকার।

পশুরা হল্লা করছে।

এটা তুমি ঠিক করলে না মা।

দোরগোড়ায় সন্তানের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলেন বুড়ি মা।

কেন? কি হয়েছে? স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে তাকালেন তিনি।

প্রথম জন বললো, কেউ যদি টের পায় তাহলে?

দ্বিতীয় জন বললো, তাহলে ওরা আমাদেরকেও মেরে ফেলবে।

তৃতীয় জন বললো, এটা ঠিক করলে না মা।

মা তিনজনের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, কতগুলো নিরপরাধ মানুষকে আমাদের চোখের সামনে মেরে ফেলবে আর আমরা চেয়ে দেখবো। তপুর কথা ভাবো একবার। তোমাদের ভাই। সে এখন কোথায়? তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে? সহসা থামলেন বুড়ি মা।

মুহূর্তে তাঁর মুখখানা বিষাদে ছেয়ে গেলো। আস্তে করে শুধালেন, তপুর কোন খোঁজ বের করতে পারলে না তোমরা?

না।

পশুরা হল্লা করছে বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের মন আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

এখানেও জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই।

প্রশস্ত পথ জুড়ে ভাঙ্গা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো। আর মৃতদেহ।

কুকুরের।

বিড়ালের।

শুকর ছানার।

পাখির।

আর মানুষের।

চারপাশে একবার তাকালো তপু।

ধ্বনির পশুরা তাড়া করছে ওকে।

ডানে। বাঁয়ে। সামনে। পেছনে।

চারপাশে থাকে।

তপু ছুটছে। পালাচ্ছে সে প্রাণপণে।

সহসা সামনে একটা খোলা দরজা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। ওটা একটা সিঁড়িঘর। ঘোরান সিঁড়ির উৎস মুখে লুকিয়ে থাকার মতো এক টুকরো অন্ধকার। ভেতরে এসে তার আত্মগোপন করলো তপু।

শব্দের রাক্ষসগুলো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে নীরবে বসে বসে নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ধাবমান গতিটাকে আয়ত্বের অধীন আনার চেষ্টা করতে লাগলো সে। ভাঙ্গার শব্দ শুনলো।

কাছে কোথায় যেন সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছে ওরা।

একটা আর্তনাদ শোনা গেলো। না। না।

তপু এবার যে ঘরে এসে আশ্রয় নিলো তার কোন কিছুই অক্ষত নেই।

বিছানা। আসবাব। বই। কাপড়। কাচ। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

তপুর মনে হলো ওর হাত পা সব ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে।

দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলছে সে। ধীরে ধীরে চারপাশে তাকালো।

কাকে যেন খুঁজলো। অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো সে। ইভা!

কোন সাড়া নেই।

পাশের বাথরুমে খোলা কল থেকে একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বেসিন উপচে পানি গড়িয়ে পড়ছে নিচে। বাথটবে কয়েকটা মৃতদেহ। রক্ত আর পানির মধ্যে ডুবে আছে।

ইভার মা।

বাবা।

ছোট ভাই।

মরিয়া হয়ে ইভাকে খুঁজতে লাগলো তপু।

কয়েকটা কাচের টুকরো ছিটকে গেলো মেঝের ওপর।

ইভা। ইভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার সেই পশুদের চিৎকার।

কবাটের আড়ালে আত্মগোপন করতে গিয়ে পিঠের সঙ্গে নরোম কি যেন ঠেকলো তার। সভয়ে পিছিয়ে আসতে ইভার চেতনাহীন দেহটা মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়লো।

ইভা! তপু চমকে উঠলো।

ইভার ধমনি দেখলো সে।

বুকে মাথা রেখে তার হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। বেঁচে আছে।

দু'হাত ভরে বেসিন থেকে পানি এনে ওর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলো সে।

ইভা চোখ মেলে তাকিয়ে চিৎকার করে আবার চোখ বন্ধ করলো। না। না। দোহাই তোমাদের আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না।

তপু ডাকলো। শোন ইভা, আমি তপু। চেয়ে দেখো, আমি তপু। জবার মতো লাল চোখ জোড়া আবার খুললো মেয়েটি। যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। সহসা শিশুর মতো কেঁদে উঠে তপুর বুকে মুখ লুকালো মেয়েটি।

আকাশ কালো করা জমাট মেঘগুলো বৃষ্টির রূপ নিয়ে অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ছে মাটিতে। আর অসংখ্য অগণিত লোক সেই বর্ষণের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে এক হাঁটু পানি আর কাদা ডিঙ্গিয়ে হেঁটে চলেছে।

নানা বর্ণের।

নানা বয়সের।

কেউ দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত।

কেউ জরাগ্রস্থ।

কেউ আবার হিংস্র দানবের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

ওরা পালাচ্ছে।

আমরা এখন কোথায়? একজন আর একজনকে প্রশ্ন করলো। আমরা এখন কোথায়?

ইন্দোনেশিয়ায়। না ভিয়েতনামে। না সাইপ্রাসে।

কোথায় আমরা।

জানি না।

আমার বাড়িঘরগুলো ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। জমি দখল করে নিয়েছে। আল্লা ওদের ক্ষমা করবে ভেবেছো। কোন দিনও না।

ঘর। বাড়ি। মাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলো এক হাঁটু পানি আর কাদা ডিঙ্গিয়ে হেঁটে চলেছে। আর তাদের মাঝখানে বুড়ি মা ঘুরে ঘুরে সবার কাছে যাচ্ছেন। সকলকে দেখছেন। সবার চেহারার দিকে খুঁটিয়ে তাকাচ্ছেন তিনি। তাঁর সন্তানকে খুঁজছেন। আপনারা কেউ দেখেছেন কি তাকে? আসার পথে কোথাও দেখেছেন কি? মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। শ্যামলা রঙ। দেখতে বেশ লম্বা। আপনারা কেউ দেখেছেন কি? সবার কাছে একটি প্রশ্নই করেছেন বুড়ি মা। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওর কপালের বাঁ পাশে একটা কাটা দাগ আছে। ছোট বেলায় বিছানা থেকে পড়ে কেটে গিয়েছিলো। আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো কি?

সবার কাছে ওই একটি প্রশ্ন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মা। কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই নিজের ভাবনা আর চিন্তায় মগ্ন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের কথা নিয়ে দু'দণ্ড আলাপ করার অবকাশ নেই।

আপনি দেখেছেন কি? ওর নাম তপু। হ্যাঁ, আমার ছেলের নাম। ও নামে কাউকে দেখেছেন কি?

তপু, তাই না? হ্যাঁ মনে হচ্ছে দেখা হয়েছিলো। মানে ঠিক কোথায় দেখা হয়েছিলো স্মরণ করতে পাচ্ছি না। অত কি আর মনে থাকে মা। গ্রামকে গ্রাম ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। কত মেরেছে জিজ্ঞেস করছো? তার কি কোন হিসেব আছে। এক বছর নদীতে কোন স্রোত ছিল না। মরা মানুষের গাদাগাদিতে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শকুনরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে দু'বছর ধরে। এখনো খাচ্ছে।

মা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

নিজের সন্তানের নির্মম মৃত্যুর কথা ভেবে অবিরাম বৃষ্টি ধারার মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

দু'চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রু, বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে, দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো নিচে।

তুমি কাঁদছো কেন গো। কেঁদে কি হবে। আমার দিকে চেয়ে দেখো। আমি তো কাঁদি না। অফুরন্ত মিছিলের একজন বললো। ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে হিরোশিমায়। আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটা এক সাদা কুত্তার বাড়িতে বাঁদী ছিলো। তার প্রভু তাকে ধর্ষণ করে মেরেছে আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে হত্যা করেছে ভিয়েতনামে। আর আমার ভাই, তাকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মেরেছে ওরা। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালবাসতো।

কিন্তু আমি তো কাঁদি না। তুমি কাঁদছ কেন?

বিষণ্ন বুড়ি মা স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই লোকটার দিকে। লোকটা থামলো না। এক হাঁটু পানি আর কাদা ডিঙ্গিয়ে সে এগিয়ে গেলো সামনে। সহস্র শরণার্থীর অবিরাম মিছিলে।

পাগলা কুকুরের হল্লা বেড়েই চলেছে।

মরিয়া হয়ে ওরা তাড়া করছে তপুকে। ইভাকে।

ওরা দু'জনের ছুটছে। প্রাণপণে।

টুকরো টুকরো ইটে ভরা শহুরে রাস্তাগুলোতে আলো ঝলমল করছে। আর ওরা অন্ধকার খুঁজছে।

একটুখানি অন্ধকার পেলে তার ভেতরে দু'জনে আত্মগোপন করবে ওরা। সহসা তপু একটা ইটের টুকরো তুলে নিলো হাতে। রাস্তার পাশে জ্বলা বাতি লক্ষ্য করে ইটটা ছুঁড়ে মারলো সে।

বাতি নিভে গেলো।

কাচের টুকরোগুলো ছিটকে গেলো নিচে।

আরেকটা ইটা বাড়িয়ে দিলো ইভা।

আরেকটা বাতি নিভে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নতুন খেলায় মেতেছে ওরা।

ইভা আর তপু।

ইট সংগ্রহ করে এগিয়ে দিচ্ছে ইভা।

আর একটার পর একটা বাতি ভেঙ্গে চলেছে তপু।

ঝলমলে আলো সরে গিয়ে অন্ধকার নেমে এলো পথে। আর সেই অন্ধকারের এককোণে নীরবে লুকালো ওরা দু'জনে।

পাগলা কুকুরগুলো হন্যে হয়ে খুঁজেছে ওদের।

শূকরছানাগুলো চিৎকার জুড়েছে সারা পথ জুড়ে।

তপুর সারা দেহ গড়িয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে।

ইভার বুকটা ওঠানামা করছে দ্রুত তালে।

ইভা। তপু ডাকলো।

কি। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো ইভা।

ভয় লাগছে?

না। তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাই না।

আচ্ছা ইভা। তপু আবার বললো, তুমি আমাকে ভালবাসতে গেলে কেন বল তো?

জানি না। ইভা মিষ্টি করে হাসলো। ভালো লেগেছে। ভালো লাগে। তাই ভালোবাসি।

গির্জার ঘন্টাগুলো মৃদু শব্দে বেজে উঠলো।

বুড়ো পাদ্রি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন।

দোরগোড়ায় কারা যেন করাঘাত করছে।

বুড়ো পাদ্রি মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবলেন।

তারপর এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

ইভা আর তপু বাইরে দাঁড়িয়ে।

ওদের বিপর্যস্ত চেহারা আর বসনের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন বুড়ো পাদ্রি।

আমরা আপনার এখানে একটু আশ্রয় পেতে পারি কি? শুধু একটা রাতের জন্যে?

ওদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বুড়ো পাদ্রি।

দূরে শূকর শূকরীর হল্লা শুনলেন।

ইঙ্গিতে ওদের ভেতরে আসতে বললেন তিনি।

দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিলেন।

গির্জার ভেতরে এক প্রশান্ত নীরবতা।

শুধু ওদের পায়ে চলার শব্দগুলো উঁচু দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ এক প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে।

একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে এনে ওদের আশ্রয় দিলেন বুড়ো পাদ্রি।

এখানে কেউ তোমাদের খোঁজ পাবে না। নিশ্চিত থাকতে পারো।

বুড়ো পাদ্রি শুধোলেন, তোমরা কি ক্ষুধার্ত? কিছু খাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বুড়ো পাদ্রি ফিরে যাচ্ছিলেন, হয়তো খাবারের খোঁজে। সহসা নিচে প্রার্থনালয় থেকে অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার ধ্বনি শুনলেন।

বিস্মিত হলেন তিনি।

সামনে এসে দেখলেন।

প্রার্থনালয় ভরে গেছে সাদা ধবধবে মানুষের ভিড়ে।

বুড়ো পাদ্রিকে দেখে চিৎকার করে উঠলো ওরা।

ওই নিগ্রোগুলোকে ওখান থেকে বের করে দাও। আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

না, না, ওরা তো নিগ্রো নয়। বুড়ো পাদ্রি বিড়বিড় করে বললেন। তোমরা ভুল করছো। ওরা নিগ্রো নয়।

মিথ্যে কথা। সাদা ধবধবে মানুষগুলো আবার চিৎকার জুড়ে দিলো। আমরা দেখেছি, একটা নিগ্রো ছেলে আর মেয়েকে তুমি গির্জার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছো। বের করে দাও ওদের।

বুড়ো পাদ্রি বিব্রত বোধ করলেন।

ফিরে এসে ভেজানো দরজাটা খুলে ইভা আর তপুকে দেখলেন তিনি।

দেখলেন। একটি নিগ্রো ছেলে আর একটি মেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তের জন্যে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন বুড়ো পাদ্রি।

বিশ্বাস হলো না।

আবার দেখলেন।

আবার তাকালেন।

না। নিগ্রো ছেলে আর মেয়ে তো নয়। ইভা আর তপু বসে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে তাঁকে। এতক্ষণে শ্বাস নিলেন তিনি প্রাণ ভরে।

প্রার্থনালয়ের কাছে সেই সাদা ধবধবে মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিলাষে ফিরে এসে বুড়ো পাদ্রি দেখলেন, প্রার্থনালয় শূন্য। শূন্য চেয়ারগুলোতে একটি মানুষের অস্তিত্বও নেই। বার কয়েক মাথা নাড়লেন তিনি।

অস্বস্তিতে।

তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্র বাইবেলটা বের করে জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগলেন বুড়ো পাদ্রি ।

বদ্ধঘরের মধ্যে নীরবে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে বুড়ো পাদ্রির বাইবেল পাঠ শুনলো ইভা আর তপু।

সহসা তপু শুধালো, কি ভাবছো ইভা।

ইভা বললো, যদি পৌঁছতে না পারি?

নিশ্চয়ই পারবো। তপু সাহস দিলো তাকে।

ইভা আবার বললো, কিন্তু সেখানেও যদি- কথাটা শেষ করলো না সে। শুধু মুখ তুলে তাকালো তপুর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে ভয়ের কিছু নেই ইভা। তপু ধীরে ধীরে জবাব দিলো।

ওখানে আমার মা আছেন। বাবা আছেন। আমার তিনটে ভাই আছে আর একটি বোন। ওরা সবাই তোমাকে পেলে খুব খুশি হবে ইভা। তুমি দেখে নিও। ওরা ভীষণ ভালবাসবে তোমায়।

আমি শুধু তোমার ভালবাসা চাই। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো ইভা। সারাটা জীবন শুধু তোমাকে ভালবাসতে চাই। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই তপু। আমি একটা সুন্দর ঘর বাঁধতে চাই। আমি সুখ চাই। শান্তি চাই। বলতে বলতে দু'চোখ ভরে অশ্রু জমে এলো তার।

তপু ধীরে ধীরে ইভার মুখখানা কাছে টেনে নিলো। চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু বিন্দুগুলো আঙ্গুলের স্পর্শে আদর করে মুছে দিয়ে বললো, কেঁদো না ইভা। কাঁদছো কেন? ইভা আস্তে করে বললো, বাবা মা'র কথা ভীষণ মনে পড়ছে তাই।

বাক্সঘরের মধ্যে আশ্রিত উনিশ জন মানুষ।
বাচ্চা। বুড়ো। পুরুষ। মেয়ে। যুবক। যুবতী।
আর আসন্ন সন্তান-সম্ভবা মহিলাটি।

খোঁয়াড়ের মধ্যে হাঁস মোরগগুলো যেমন গাদাগাদি হয়ে থাকে তেমনি। তেমনি আছে ওরা। কতগুলো মানুষ।

জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে। সাধারণ এক আতঙ্কের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। একটু নড়াচড়া করার পরিসর নেই। মাথা সোজা করে বসবে সে সুযোগ নেই। কারণ বুকের কাছ থেকে মাথাটা তুলতে গেলেই ছাদের সঙ্গে লাগে।

মই বেয়ে উঠে বাক্সঘরের দরজা খুললেন বুড়ি মা।

এক টুকরো আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো ওদের চোখেমুখে। কয়েক ঢেউ বাতাসে পোকা-মাকড়ের মতো মানুষগুলো নড়েচড়ে উঠলো। বুড়ি মা খাবার নিয়ে এসেছেন।

উনিশ জোড়া ক্ষুধার্ত চোখ ঝাঁপিয়ে পড়লো খাবারের থালার উপরে। খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগলো ওরা।

বুড়ি মা স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বাইরে এখন গোলমাল কিছুটা কমেছে। আপনারা নিচে নেমে এসে কিছুক্ষণ চলাফেরা করুন।

হাত পাগুলো ছড়িয়ে বসুন।

উনিশ জোড়া চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

ওদের নিচে নামার জন্যে মইটা ধরে দাঁড়ালেন বুড়ি মা।

কিন্তু বাক্স থেকে বেরুতে গিয়ে ওরা অনুভব করলো হাত পাগুলো আর সোজা করতে পারছে না। বুকের কাছ থেকে মাথাটা তুলতে গিয়ে দেখলো মেরুদণ্ডে টান পড়ছে। ব্যথা লাগছে।

দীর্ঘদিন একটা বাক্সের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বন্দি হয়ে থাকতে থাকতে ওরা ধীরে ধীরে দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু হাত পাওলো সোজা করে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ওরা।

চতুষ্পদ মানুষগুলো।

সহসা বাইরে আবার সেই হিংস্রতার ধ্বনি শোনা গেল।

সচকিত হলো উনিশটি প্রাণ।

বিকলাঙ্গ মানুষগুলো পাখির মতো কিচমিচ শব্দ তুলে মইটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তালাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন মা।

বুড়ো বাবা বিছনায় বসে বসে তছবি শুনছেন।

তিন সন্তান উৎকর্ণ হয়ে বন্য ধ্বনি শুনছে।

চৌদ্দ বছরের মেয়েটি হঠাৎ বললো, বাবা, কারা যেন কড়া নাড়ছে। বুড়ো বাবা অস্বস্তিতে তছবি নামিয়ে রাখলেন। তিনি সন্তানের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, বাতিগুলো সব নিভিয়ে দাও। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো তাঁর।

মা চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন। কানে কানে বললেন, ওঘরে গিয়ে ওদের একেবারে চুপ থাকতে বলে এসো। যেন কোন রকম শব্দ না করে, যাও। বলে স্বামীর দিকে তাকলেন তিনি। দরজায় করাঘাতের মাত্রা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। বুড়ো বাবা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। দরজা খুলে দেবেন তিনি।

বুড়ি মা।

তাঁর তিন সন্তান।

আর চৌদ্দ বছরের মেয়েটি।

AMARBOI.COM

সবাই গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে সিঁড়ির মাথায় নীরবে দাঁড়িয়ে। বুড়ো বাবা দরজা খুললেন। বাইরে থেকে বন্য হিংস্রতা চিৎকার করে উঠলো। বাড়ির ভেতর থেকে ওদের বের করে দাও।

এখানে কেউ নেই। বিশ্বাস করো। এখানে কেউ নেই। বুড়ো বাবা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা।

এক সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ চিৎকার জুড়লো তোমরা কাদের আশ্রয় দিয়েছো আমরা জানি। নিজেদের ভালো চাও তো ওদের আমাদের হাতে দিয়ে দাও।

তোমরা ভুল করছো। আমাদের এখানে কেউ নেই।

কিন্তু ওরা বিশ্বাস করলো না। বুড়ো বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ভেতরে এসে ঢুকলো ওরা! তারপর পুরো বাড়িটা তচনচ করে ফেলতে লাগলো।

বাক্সঘরে তখন কবরের নীরবতা।

মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো ওরা।

ভয়ে।

আতঙ্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই মুহূর্তে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটির প্রসব বেদনা উঠেছে। একটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সে। উনিশ জন মৃতপ্রায় মানুষ চরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিশুটির জন্ম প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

না। না। এখন নয়।

এখন নয়।

মুমূর্ষ মহিলাটি যন্ত্রণার অস্থিরতায় বারবার নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর ঘর্মাক্ত দেহটাকে আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

সেও চায় না এ মুহূর্তে শিশুটির জন্ম হোক।

কিন্তু! সবাইকে হতাশ করে দিয়ে উনিশ জন মানুষের অভিসম্পাত কুড়োতে কুড়োতে শিশুটি ভূমিষ্ট হলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে, উনিশ জনের একজন সেই বাচ্চাটির গলা টিপে ধরলো।

নিচে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওরা এখন এ ঘরে এসে আশ্রিত মানুষগুলোকে খুঁজছে। প্রসূতির চোখ জোড়া হয়তো পৃথিবীর প্রতি ঘৃণায় একবার কুঞ্চিত হলো। তারপর বিবর্ণ মণিতে প্রাণের চিহ্ন রইলো না। আর বাচ্চাটার সঙ্গে সঙ্গে তার মা-ও মারা গেলো।

মৃত মহিলার স্বামী হতবিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেদিকে। সহসা কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়তে গিয়ে নিজেই মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরলো।

না। না। এখন নয়।

এখন কান্নাও নয়।

এখন শুধু নীরবে দু'টি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করো আর নিজেদের আসন্ন মরণ সম্ভাবনার কথা ভেবে ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকো।

মৃত্যুর বন্যতার শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না।

ওরা কান পাতলো।

ভাল করে শোনার চেষ্টা করলো।

শুনলো। বুড়ি মা নিচে থেকে বলছেন। আর ভয়ের কিছু নেই, ওরা চলে গেছে।

বুড়ি মা'র কণ্ঠস্বর শুনে মৃত মহিলার স্বামী পরক্ষণে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

তার মৃত স্ত্রীর জন্যে।

তার মৃত নবজাতকটির জন্যে।

ইভা আর তপু তখন ছুটছে।

পালাচ্ছে ওরা।

দীর্ঘ পথ চলায় ওরা ক্লান্ত। বিবর্ণ বিধ্বস্ত।

তবু জীবনের জন্য।

বাঁচার জন্যে।

সুখের জন্যে।

ওরা ছুটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা থমকে দাঁড়ালো ওরা।

ইভা আর তপু।

দেখলো। সামনে সীমাহীন সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রের সৈকতে, অফুরন্ত ঢেউয়ের পটভূমিকায় একটি ক্রুশ আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। ক্রুশের পেছনে লাল টকটকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

কে? ক্রুশবিদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে সহসা প্রশ্ন করলো ইভা। অনেকক্ষণ কোন জবাব দিলো না তপু। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

তারপর বললো, যিশু।

যিশু।

হ্যাঁ। যিশুখৃষ্ট। ওরা গতকাল তাঁকে হত্যা করেছে।

দু'জোড়া চোখ বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

যেন এক অনন্ত সময়ের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে ওরা।

সহসা আবার সেই হিংস্র বন্য ধ্বনি তাড়া করে এলো।

পাগলা কুকুরগুলো খোঁজ পেয়ে গেছে ওদের।

শূকর শূকরীরা চিৎকার করে আসছে পেছনে।

ইভার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার ছুটলো তপু।

প্রাণপণে ছুটছে ওরা।

সহসা। কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো ওরা। চারপাশে অসংখ্য মৃতদেহ।

ছেলে। বুড়ো। মেয়ে। শিশু।

তপু আর ইভা চমকে উঠলো।

দেখলো। সেই অসংখ্য মৃতদেহের মাঝখানে ওদের দু'জনের মৃতদেহও পড়ে আছে।

নিজের মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ইভা।

তাকালো তপু।

বুখেনওয়াল্ডে।

না। অসউইজে।

না। স্ট্যালিনগ্রাডে? অথবা ভিয়েতনামে?

ভয়ে শিউরে উঠে তপুর বুকে মুখ লুকালো ইভা।

সহসা কাছাকাছি কোথায় যেন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করলো তপু। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে।

দু'জনে মাথা তুলে তাকালো ওরা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। মৃতদেহগুলোর মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো ইভা আর তপু। কিছুদূর এসে দেখলো। একটি মৃত মা মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। তার স্তন থেকে চুইয়ে পড়া দুধে আর রক্তে মাটি ভিজে গেছে।

পাশে চার পাঁচ বছরের একটি আহত ছেলে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

আর।

একটি শিশু আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়ে তীব্র কান্না জুড়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত মায়ের স্তনের ওপর পরনের কাপড়টা টেনে দিলো ইভা। মাটি ঢেকে দিলো।
আহত ছেলেটিকে কোলে নিলো তপু।
শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো ইভা।
তারপর আবার ছুটতে লাগলো ওরা।
সামনে অগুনতি লোক। বাস্তুহারাদের অফুরন্ত মিছিল।
নানা বর্ণের।
নানা গোত্রের।
নানা ধর্মের।
দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত। শীর্ণ। জীর্ণ।
ক্ষতবিক্ষত অবয়ব।
ওদের মাঝখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যে হতবিহ্বল হয়ে গেলো ইভা আর তপু।
তোমরা কোত্থেকে আসছো?
ইন্দোনেশিয়া থেকে।
ভিয়েতনাম থেকে।
গ্রিস থেকে।
সাইপ্রাস থেকে।
জেরুজালেম থেকে।
হিরোশিমা থেকে।
কোথায় যাচ্ছো? কোথায় যাবে তোমরা?
আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে যেতে চাই।
আমরা আলো চাই।
তোমরা কোথায় যাচ্ছো? একজন বুড়ো প্রশ্ন করলো ওদের।
তপু ইতস্তত করে বললো। আমার মা বাবা ভাই বোনের কাছে।
তোমার নাম? তোমার নাম কি? সহসা আরেকজন শুধালো।
আমার নাম তপু।

তপু? লোকটা এগিয়ে এলো সামনে। ও হ্যাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা হয়েছিলো, তিনি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন আমাদের। তোমার খোঁজ জানতে চাইছিলেন।

বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতে ইভা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো।
মিছিল এগিয়ে গেলো সামনে।

বুড়ি মা আশ্রিত মানুষগুলোর জন্যে রান্নার আয়োজন করছিলেন। তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়েটি সাহায্য করছিলো তাঁকে।

বুড়ো বাবা তাঁর ঘরে একখানা জায়নামাজের উপরে বসে তছবি গুনছিলেন আনমনে।
আর বক্সঘরের বাসিন্দারা শুঁয়োপোকার মত হাত পা গুটিয়ে ঝিমুচ্ছিল বসে বসে।
এমন সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এমনি সময় তপুর মৃত্যুর খবর নিয়ে এলো তিন সন্তানের একজন। সকলকে ডেকে এক ঘরে জড়ো করলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো।

বললো। তপু মারা গেছে। তপুকে মেরে ফেলেছে ওরা।

মুহূর্তে চমকে উঠলো সবাই।

বুড়ি মা, বাবা চৌদ্দ বছরের মেয়েটি আর দুই ভাই।

বুকের উপরে হাত দু'খানা জড়ো করে ক্ষীণ একটা আর্তনাদের ধ্বনি তুলে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়লেন বুড়ি মা।

শুকনো দু'চোখ ভিজে এলো।

মনে হলো যেন সন্তানের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি।

তপু মরে পড়ে আছে রাস্তার উপরে উপুড় হয়ে।

তপুর মৃতদেহ একটি গাছের সঙ্গে ঝুলছে।

ঘরের ভেতরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তপু। চারপাশে রক্তের স্রোত বইছে।

তপুকে ওরা ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে মেরেছে।

তপুর মৃতদেহটা ওরা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

তপু মরে পড়ে আছে একটা নর্দমার ভেতর।

এক মুহূর্তে তপুর করুণ মৃত্যু দৃশ্যগুলো চোখের সামনে যেন দেখতে পেলো ওরা।

বুড়ি মা। বাবা। তিন সন্তান আর চৌদ্দ বছরের মেয়েটি। সহসা একজন ছুটে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা দা'টা হাতে তুলে নিলো। আরেক ভাই নিলো একটা ছুরি।

তৃতীয় জন একটা লোহার শিক।

তিন জোড়া চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ওরা।

সহসা পেছন থেকে ছুটে এসে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন বুড়ো বাবা। না। ওদের তোমরা হত্যা করতে পারবে না।

কেন?

কেন?

কেন?

তিন কণ্ঠ এক হয়ে প্রশ্ন করলো।

ওরা তো কোন দোষ করে নি। বুড়ো বাবা জবাব দিলেন। ওরা তোমাদের আশ্রিত। ওরা অসহায়। ওদের কেন হত্যা করবে।

কারণ ওরা সেই ধর্মের লোক যারা আমার ভাইকে খুন করেছে।

ওদের জাত এক।

ধর্ম এক।

বর্ণ এক।

গোষ্ঠী এক।

ভাষা এক।

ওদের খুন করে আমরা প্রতিশোধ নেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না! বুড়ো বাবা যেন সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী আর ভাষা এক বলে ওরা দোষী নয়। ওরা তো তপুকে খুন করে নি।

ওরা করে নি, ওদের জাত ভাইরা করেছে। সহসা বাঘিনীর মতো স্বামীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বুড়ো মা। সরে যাও সামনে থেকে। সরে যাও।

বাক্সঘরের মধ্যে জানোয়ারের মতো থাকা মানুষগুলো তখন পরম নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে।

মই বেয়ে উপরে উঠে এলো তিন ভাই।

ধীরে ধীরে দরজাটা খুললো ওরা।

ওদের চোখে মুখে রক্তের নেশা। মনে হলো যেন মানুষের চেহারা সরে গিয়ে কতগুলো হিংস্র বন্য পশুর মুখ ওদের কাঁধের ওপর ঝুলছে।

একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমন্ত মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছিলো। সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে।

তার হাসির শব্দে চমকে উঠলো তিন তস্কর।

হাত থেকে দা আর ছুরি নিচে মেঝেতে খসে পড়ার আওয়াজে বাক্সঘরের বাসিন্দারা জেগে গেলো সবাই। ওরা অবাক হয়ে খোলা দরজায় দাঁড়ানো তিন ভাই এর দিকে তাকালো।

ওদের সে দৃষ্টি যেন সহ্য করতে পারলো না তিন ভাই।

ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে নিলো।

একজন বললো, ও কিছু না। তোমরা কেমন আছো দেখতে এসেছিলাম। ঘুমোও এখন। ঘুমিয়ে পড়ো।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো ওরা।

AMARBOI.COM

চারপাশে ধু ধু বালির চর।

আর আলকাতরার মতো যেন অন্ধকার।

ভয়াবহ ক্লান্তির অবসাদে ভেঙ্গে পড়া তপু আর ইভার দু'চোখে গভীর উৎকণ্ঠা।

একটি জীবন কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবে। কুড়িয়ে পাওয়া আহত ছেলেটি একটু পরে মারা যাবে। তার চোখ জোড়া বিবর্ণ হয়ে এসেছে, শুকনো ঠোঁট জোড়া ঈষৎ নেড়ে কি যেন বলতে চাইছে সে।

একটু পানি জোগাড় করতে পারো? ইভা অনুনয়ের সঙ্গে তাকালো তপুর দিকে। ওর মুখে দেবো।

উঠে দাঁড়ালো তপু। সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মৃতপ্রায় ছেলেটির জন্যে পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়লো সে।

তপু ছুটছে।

চারপাশে শুধু শুকনো বালি আর বালি।

এক ফোঁটা পানির অস্তিত্ব নেই কোথাও।

আরো অনেকক্ষণ পর যখন অবসন্ন দেহ আর হতাশ মন নিয়ে ফিরে এলো তপু, তখন আহত ছেলেটি মারা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণার্ত ঠোঁট জোড়া তার ঈষৎ খোলা।

পাশে বসে আছে ইভা।

আর মাটিতে শুয়ে থাকা শিশুটি আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে। মুখে তার নিষ্পাপ হাসি।

ইভা কাঁদছে। দু'গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে তার।

তপু কিছু বললো না। ওর মাথার উপরে নীরবে একখানা হাত রাখলো শুধু।

তারপর।

তারও অনেক অনেক পরে আহত ছেলেটির শেষ কৃত্যের জন্যে একটা কবর খোঁড়ার চেষ্টা করলো ওরা।

মাটি এখন মনে হলো পাথরের মতো শক্ত।

ছোট্ট একটা কবর খুঁড়তে গিয়ে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলো দু'জনে। কিছু মাটি তোলার পর অবাক হয়ে দেখলো চারপাশ থেকে স্রোতের মতো পানি এসে কবরটা ভরে যাচ্ছে।

দু'হাতে পানি ফেলে দিয়ে কবরটাকে শুকোবার চেষ্টা করলো তপু, পারলো না।

অফুরন্ত পানি শুধু বেড়েই চলেছে।

ধীরে ধীরে সেই পানির মধ্যে মৃতদেহটাকে নামিয়ে দিলো ওরা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়ালো দু'জনে।

ইভা মৃদুস্বরে বললো, আমি আর পারছি না।

তপু বললো। আর একটু পথ। এই পথটুকু পেরিয়ে গেলে আর কোন ভয় নেই ইভা। আমরা তখন নিরাপদ সীমানার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবো।

সামনে একটা জলে ভরা নাতিদীর্ঘ ঝিল।

দু'পাশ তার মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসে ভরা।

এখানে সেখানে দু'একটা গাছ। ইতস্তত ছড়ানো।

ঘাসের ওপর এসে বসলো ওরা।

তপু আর ইভা।

বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো ইভা।

জানো, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

তপুও শুয়ে পড়লো।

উপরে বিরাট বিশাল সীমাহীন আকাশ।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তপু বললো, এখন আর আমাদের কোন ভয় নেই ইভা।

ইভা ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি একটু হাসলো। আমি এখন কি ভাবছি বলতো?

কি ভাবছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের পরে আমাদের জীবনটা কেমন হবে, তাই। আমাকে ছেড়ে কিন্তু তুমি কোথাও যেতে পারবে না। যেখানে যাবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। সারাক্ষণ তোমার পাশে পাশে থাকবো।

কি মজা হবে তাই না?

আর আমি কি ভাবছি জানো?

কি?

আমি যখন সারাদিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবো, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমার নাম ধরে ডাকবো। আশে পাশের বাড়ির লোকগুলো সবাই চমকে তাকাবে সে দিকে। তুমি দরজা খুলেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে, এতো দেরি হলো যে?

আমি বলবো। কি বলবো বল তো?

তুমি বলবে অনেক কাজ ছিলো তাই।

না না। আমি বলবো। কাজের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে একটা মিষ্টি কবিতা লিখেছি, তাই।

তুমি শব্দ করে হেসে উঠে বলবে। কই দেখি, দেখি। দেখাও না।

না, এখন না।

কখন?

যখন পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। এই পৃথিবীর একটি মানুষও জেগে থাকবে না। তুমি আমি পাশাপাশি বসবো। দু'জনে দু'জনকে দেখবো। তখন শোনাবো তোমাকে।

কি সুন্দর তাই না। ইভা ধীরে ধীরে বললো।

বাচ্চা ছেলেটা ইভার বুকে মুখ গুঁজে নীরবে ঘুমুচ্ছে।

তপু আর ইভার চোখেও ঘুম নেমে এলো একটু পরে। বহুদিন পরে ঘুমুচ্ছে ওরা।

শহরটা এখনো মৃত।

ক্ষতবিক্ষত।

এখানে সেখানে এখনো অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে।

কুকুরের।

বিড়ালের।

মানুষের।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো তপু আর ইভা।

জনশূন্য পথ দিয়ে চলতে গিয়ে ক্ষণিকের ভুলে যাওয়া আতঙ্কটা যেন ধীরে ধীরে আবার উঁকি দিতে লাগলো ওদের মনের মধ্যে। তপুর দিকে তাকালো ইভা।

আমার ভয় করছে।

না। না। ভয়ের কোনই কারণ নেই ইভা। আমরা এসে পড়েছি।

একটা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো।

আমাদের বাড়ি। তপু আস্তে করে বললো।

ইভা মুখ তুলে বাড়িটাকে এক পলক নিরিখ করলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার কয়েক কড়া নাড়লো তপু।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার কড়া নাড়লো।

আবার।

সহসা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেলো।

তপু দেখলো। তার মা। বুড়ি মা।

পেছনের সিঁড়িতে সারে সারে দাঁড়ানো তার বুড়ো বাবা।

তিন ভাই।

আর চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটি।

তপুকে দেখে চমকে উঠলো সবাই।

মা। বাবা। ভাই। বোন।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মা। তপু! তপু! তুই বেঁচে আছিস?

না। না। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো ইভা।

তপু চমকে তাকিয়ে দেখলো।

বুড়ি মায়ের হাতজোড়া রক্তাক্ত। যেন এই একটু আগে, এক সমুদ্র রক্তের মধ্যে হাতজোড়া ডুবিয়ে এসেছেন তিনি।

বাবার হাতে একটা চকচকে দা। দা-এর ডগা থেকে তাজা রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

ভাইদের হাতে লোহার শিক। তাজা খুনে ভরা।

না। না। মায়ের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো তপু।

ইভা ততক্ষণে বাচ্চা ছেলেটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আবার ছুটতে আরম্ভ করেছে।

তীব্রবেগে তাকে অনুসরণ করলো তপু।

না। না। না।

শব্দের রাক্ষসগুলো আবার তাড়া করছে পেছন থেকে।

পাগলা কুকুর নয়।

শূকর শূকরী নয়।

কতগুলো মানুষ।

কতগুলো চেনা মুখ।

মায়ের। বাবার। ভাইয়ের। বোনের।

পেছন থেকে ছুটে আসছে। ছুটে আসছে ওদের হত্যা করার জন্যে। প্রাণপণে ছুটছে তপু আর ইভা।

বাচ্চা ছেলেটা বুকের মধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে। তার তীব্র কান্নার শব্দে মনে হলো যেন মৃত শহরটা থরথর করে কাঁপছে। ওকে আরো জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো ইভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর পারি না। আর পারি না। গভীর যন্ত্রণায় পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ইভা।

তপু এসে হাত ধরলো ওর।

ওরা ছুটছে।

শব্দের রাক্ষসগুলো তাড়া করছে পেছন থেকে।

ওরা ছুটছে।

তারপর।

অনেক অনেক অন্ধকার পথের শেষে। সহসা নিজেদের সেই অফুরন্ত মিছিলের মাঝখানে আবিষ্কার করলো ওরা।

তপু আর ইভা।

একটা সীমাহীন সমুদ্রের পাড় ধরে মানুষগুলো এগিয়ে চলেছে সামনে।

ছেলে। বুড়ো। মেয়ে। শিশু। যুবক। যুবতী।

দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত অবসন্ন।

জীর্ণ। শীর্ণ। বিবর্ণ।

ক্ষতবিক্ষত দেহ। আর অবয়ব।

আমরা কোথায়?

ভিয়েতনামে না ইন্দোনেশিয়ায়।

জেরুজালেমে না সাইপ্রাসে।

ভারতে না পাকিস্তানে।

কোথায় আমরা?

জানো, ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায়।

ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়।

আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা আফ্রিকাতে।

আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলি করে।

আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতো।

বলতে গিয়ে দু'চোখের কোণে দু'ফোটা অশ্রু মুক্তোর মতো চিকচিক করে উঠলো বুড়োটার।

ওর পাশে এসে দাঁড়ালো তপু আর ইভা।

তারপর সমুদ্রের পাড় ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ওরা।

সামনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি সুন্দর সকাল।

বুড়ো রাত বিদায় নেবার আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তার শেষ চিহ্নটুকু এখানে সেখানে ছড়ানো। চিকন ঘাসের ডগায় দু' একটি পানির ফোঁটা সূর্যের সোনালি আভায় চিক্‌চিক্ করছে।

চারপাশে রবিশস্যের ক্ষেত। হলদে ফুলে ভরা। তারপর এক পূর্ণ-যৌবনা নদী। ওপাড়ে তার কাশবন। এপাড়ে অসংখ্য খড়ের গাদা।

ছেলেটির বুকে মুখ রেখে, খড়ের কোলে দেহটা এলিয়ে দিয়ে, মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। ওর মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ঠোঁটের শেষ সীমানায় শুধু একটুখানি হাসি চিবুকের কাছে এসে হারিয়ে গেছে। ওর হাত ছেলেটির হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখা। দু'জনে ঘুমোচ্ছে ওরা।

ছেলেটিও ঘুমিয়ে।

তার মুখে দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি। মনে হয় অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছিলো ওরা। চুলের প্রান্তে এখনো তার কিছু রেশ জড়ানো রয়েছে।

সহসা গাছের ডালে বুনো পাখির পাখা ঝাঁপটানোর শব্দ শোনা গেলো। মটরশুটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা ধবধবে খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেলো কাছের অরণ্যের দিকে।

খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐক্যতান। সমতালে এগিয়ে এলো ওরা। যেখানে ছেলেটি আর মেয়েটি এই পৃথিবীর অনেক চড়াই উৎরাই আর অসংখ্য পথ মাড়িয়ে এসে অবশেষে এই স্নিগ্ধ সকালের সোনা-রোদে পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার করে ছিলো।

ভালোবাসি।

বলেছিলো। এই রাত যদি চিরকালের মতো এমনি থাকে। এই রাত যদি আর কোনদিন ভোর না হয় আমি খুশি হবো।

বলেছিলো। ওই যে দূরের তারাগুলো, যারা মিটিমিটি জ্বলছে তা'রা যদি হঠাৎ ভুল করে নিভে যেতো, তা'হলে খুব ভালো হতো।

আমরা অন্ধকারে দু'জনে দু'জনকে দেখতাম।

বলেছিলো। হয়তো কিছুই বলে নি ওরা।

শুধু শুয়েছিলো।

আঠার জোড়া আইনের পা ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে এসে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের।

ওরা তখনো ঘুমুচ্ছে।

তারপর।

আমার কোন জাত নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাংসল হাতজোড়া ভেজা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বুড়ো আহমদ হোসেন বললো। আমার কোন জাত নেই। আমি না হিন্দু, না মুসলমান, না ইহুদি, না খৃষ্টান। আমার জাত তুলে কেউ ডেকেছো কি এক ঘুষিতে নাক ভেঙ্গে দেবো বলে দিলাম।

আশেপাশের টেবিলে যারা ছিলো তারা বিরক্তির সঙ্গে এক নজর তাকালো ওর দিকে।

ছোকরা গোছের একজন দূর থেকে চিৎকার করে বললো, বুড়ো ব্যাটার ভীমরতি হয়েছে। রোজ এক কথা। বলি এ পর্যন্ত ক'টা লোকের নাক ভেঙ্গেছো শুনি?

আহমদ হোসেনের কানে সে কথা পৌঁছলো না। কপালে জেগে ওঠা ঘামের ফোঁটাগুলো বাঁ হাতে মুছে নিয়ে সে আবার বলতে লাগলো। আমি কিচ্ছু জানি না। না জাত। না ধর্ম। না তোমাদের আইন-কানুন। এর সবটুকুই ফাঁকি। চোখে ধুলো মেরে মানুষ ঠকানোর কারসাজি। শুনতে যদি ভালো না লাগে, নিষেধ করে দাও তোমাদের এই আস্তাকুঁড়ে আর আসবো না। এখানে চা খেতে না এলেও আমার দিন কাটবে।

আহা চটছেন কেন, আমি কি আপনাকে আসতে বারণ করেছি কোন দিন। না, করছি। চা-খানার মালিক নওশের আলী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু, বুড়ো চুপ করলো না।

কাপ থেকে খানিকটা চা পিরিচে ঢেলে নিয়ে মুখের কাছে এনে আবার পিরিচটা নামিয়ে রাখলো সে। হয়েছে, ওসব মিষ্টি কথায় মন ভোলাতে চেও না। ছেলেটাকে যখন কুড়ি বছর ঠুকে দিলো তখন কোথায় ছিলে সব? পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটি মাত্র ছেলে আমার। কোর্ট শুদ্ধ লোক বললো, বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, আর হাকিম কিনা সাজা দিয়ে দিলে আঁ।

পনের বছর আগে সাজা পাওয়া এবং একমাত্র ছেলের চিন্তায় আহমদ হোসেনের চোখজোড়া সজল হয়ে এলো। বার্ধক্যের চাপে কুঞ্চিত মাংসের বেষ্টনী ভেদ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো। বাদামি চায়ের ঈষৎ উষ্ণ লিকারে।

বুড়ো কাঁদছে।

শওকত তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। ওর ইচ্ছে হলো এ মুহূর্তে একবার বুড়ো আহমদ হোসেনের পাশে বসতে। চায়ের কাপটা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে দু'টো কথা বলতে ওর সঙ্গে।

কিন্তু থাক।

যে কাঁদছে সে কাঁদুক।

কান্নার সাগরে সান্ত্বনার সীমা খুঁজে নেবে বুড়ো আহমদ হোসেন।

শওকত জানে, এই দিন যখন শেষ হয়ে যাবে, যখন কালো বোরখায় ঢাকা রাত আসবে, তখন আর এমনি করে কাঁদবে না আহমদ হোসেন। তখন এই শহরের প্লাস্টার ঝরা সরু আঁকাবাঁকা গলিতে নামহীন অসংখ্য ছেলেমেয়ের জন্ম-মৃত্যুর হিসেব লিখে বেড়াবে সে।

কত হলো?

একান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার চুরানব্বই জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো রাতে সহসা কোনো রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে গেলে বুক পকেট থেকে হিসেবের খাতাটা বের করে বলবে। একান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার চুরানব্বই জন। ক্ষয়ে যাওয়া গুটিকয় কালচে দাঁতের ফাঁকে বিকৃত এক হাসির আমেজ ছড়িয়ে সে বলবে। যাবে একদিন? চলো না কাল রাতে।

না।

ভয় হচ্ছে বুঝি? ওখানে গেলে কেউ তোমাকে চিনে ফেলবে।

বদনামের ভয়, তাই না? কিন্তু কি জানো, ওখানে যারা যায় তারা কারো কথা মনে রাখে না। ওটাই ও জায়গার বিশেষত্ব। আজ পনেরো বছর ধরে দেখে আসছি। আসে আর যায়। বামুন কায়েথ বলো, আর মোল্লা মৌলভী বলো, সব ব্যাটাকে চিনে রেখেছি। দিনের বেলা কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সেজে অফিসে যায় আর যেই না সন্ধে হলো, অমনি বাবু মুখে রুমাল গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ে গলিতে। বলে আবার হাসবে আহমদ হোসেন। একটা আধপোড়া বিড়িতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আবার সে শুরু করবে, এই শহরের নাম না জানা অসংখ্য দেহ-পসারিণীর গল্প।

দিন যত যাচ্ছে পিঁপড়ের মতো বাড়ছে ওরা বুঝলে? বাদামতলীর নাম শুনলে তো নাক সিটকাও। আর এই যে নিওন বাতির শহর রমনা ভাবছো এটা একেবারে পিঁপড়ে শূন্য তাই না? খোদার কছম বলছি এখানকার পিঁপড়েগুলো আরো বেশি পাজী। শালার সাহেবের বাচ্চারা ওদের গে গার্ল বলে ডাকে। যেন, নাম পাল্টে দিলেই ধর্ম পাল্টে গেলো আর কি? বলে বিকট শব্দে হেসে উঠবে বুড়ো আহমদ হোসেন। তারপর হিসেবের খাতাটা বুক পকেটে রেখে দিয়ে আর কোন কথা না বলে হঠাৎ সে আবার চলতে শুরু করবে। এক পথ থেকে আরেক পথ। অন্য পথের মোড়ে।

বুড়ো আহমদ হোসেন তখনো কাঁদছে।

চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত।

লম্বা দেহ। ছিপছিপে শরীর। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বাতাসের ভার সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু কাছে এসে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শুকনো শরীরের মাংসপেশীগুলো অত্যন্ত সবল এবং সজীব। ময়লা রঙের চামড়ার গায়ে অসংখ্য লোমের অরণ্য। হাতে-পায়ে, বুকে এবং কণ্ঠনালীর সীমানা পর্যন্ত সে অরণ্যের বিস্তৃতি। রুক্ষ হাতের তালু। খসখসে। অগুনিত রেখায় ভরা। চোখজোড়া বড় বড়। মণির রঙ বাদামি। কিন্তু তার মধ্যে কোন মাধুর্য নেই। আছে এক তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালা। মণির চারপাশে যে সাদা অংশটুকু রয়েছে তার মাঝে ছিটেফোঁটা লাল ছড়ানো। কখনো সেটা বাড়ে। কখনো কমে। চোখের খুব কাছাকাছি ভ্রূ-জোড়ার অবস্থিতি। মোটা। মিশকালো। ধনুর মতো বাঁকা কিন্তু লম্বায় ছোট। চলতে চলতে হঠাৎ যেন থেমে গেছে ওটা। সহসা দেখলে মনে হয়, সারা মুখে কোথাও কোন লাবণ্য নেই। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করলে ধীরে ধীরে একটা অব্যক্ত সৌন্দর্য ধরা পড়ে। যার সঙ্গে আর কারো তুলনা করা যেতে পারে না। মাঝারি নাক। মাংসল। আর ঠিক নাকের মাঝখানটায় একটা কাটা দাগ। চওড়া কপাল বয়সের সঙ্গে তাল রেখে সামনের অনেকখানি চুল ঝরে পড়ায় সেটাকে আরো প্রশস্ত দেখায়। মুখের গড়নটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিম্বাকৃতি। পুরু ঠোঁট জামের মতো কালো। তেমনি মসৃণ আর তেলতেলে। যখন ও হাসে, তখন মুক্তোর মতো দাঁতগুলো ঝলমল করে উঠে। চিবুকের হাড়জোড়া সুস্পষ্টভাবে উঁচু আর তার নিচের অংশটুকু হঠাৎ যেন একটা খাদের মধ্যে নেমে গেছে। খাদের শেষ প্রান্তে একটা বড় তিল। মাথাভরা একরাশ ঘন চুল। অমসৃণ এবং অনাদৃত। রাস্তায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালো শওকত। একখানা যাত্রীবাহী বিমান প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে চলেছে পোতাশ্রয়ের দিকে। এক্ষুণি নামবে। তার শব্দ বিলীন হয়ে যাওয়ার আগেই কে যেন পাশ থেকে ডাকলো। বাড়ি যাবেন নাকি?

শওকত চেয়ে দেখলো, মার্থা গ্রাহাম।

মার্থা একটা রিক্সায় বসে। শওকতকে দেখে ওটা ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়েছে সে। ওর হাতে একটা পাউরুটি আর ছোট একটা চায়ের প্যাকেট।

মার্থা ডাকলো, ব্যাপার কি, এই রাস্তার ওপরে একঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন? বাসায় যাবেন না, আসুন।

শওকত সহসা হেসে উঠলো। আশ্চর্য!

কি?

মনে হচ্ছে আমাকে বাসায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে রোজ আপনি এখানে রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

লজ্জায় মার্থার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে গেলো। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, আমিও কিন্তু এর উল্টোটি বলতে পারতাম। কিন্তু বলবো না। তা'হলে আপনি রাগ করবেন। মার্থার গলার স্বরে কোথায় যেন এক টুকরো ব্যথা ঈষৎ উঁকি দিয়ে গেলো।

শওকত ততক্ষণে উঠে বসেছে রিক্সায়।

গলির মোড়ে কামারের দোকানের সামনে কয়েকটা লম্বা টুলের ওপরে যারা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলো, তারা দেখলো। আজও একখানা রিক্সা থেকে নামলো মার্থা আর শওকত।

আড়চোখে একবার ওদের দিকে তাকালো শওকত। ওরা দেখছে। ইশারায় দেখাচ্ছে অন্যদের। যাক, ভালোই হলো। আজ রাতটার জন্যেও কিছু মুখরোচক খোরাক পেলো ওরা। তাসের আড্ডা কথার কাকলিতে ভরে উঠবে। উষ্ণ চায়ের লিকার আর নয়া পয়সায় কেনা নোনতা বিস্কিটের সঙ্গে জমবে ভালো। মার্থা গ্রাহামকে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবে ওরা।

কিন্তু কেন? আমি তো ওদের সাতপাঁচে থাকিনে। আমি তো সেই সকালে কাজে বেরিয়ে যাই, আবার রাতে ফিরি। আমি তো কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কারো পাকা ধানে মই দেইনে। তবু কেন ওরা আমাকে নিয়ে অত হল্লা করে?

বলতে গিয়ে ওর নিকষ কালো চোখের মণি জোড়ায় দু'ফোঁটা পানি ছলছল করে উঠেছিলো। সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে শওকতের দিকে তাকিয়েছিলো মার্থা গ্রাহাম।

সহসা কোন উত্তর দিতে পারে নি শওকত। ওর শুধু বুড়ো আহমদ হোসেনের কথা বার বার মনে পড়ছিলো। মার্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একদিন বলেছিলো, ওটা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগ। ওটাও এক রকমের ক্ষুধা, বুঝলে? আজ পনেরো বছর ধরে এই শহরের অলিতে গলিতে পইপই করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদের খুব ভালো করে চেনা আছে আমার। বাদামতলীর ঘাট বলো, ছক্কু মিয়ার চা-খানা কিম্বা খান সাহেবের কাফে হংকং বলো আর তোমাদের ওই বিলেতি ঢঙের যত দিশি ক্লাব সব ব্যাটার ধর্ম এক, বুঝলে। সবাই এক রোগে ভুগছে, এক ক্ষুধায় জ্বলছে। শোন, কাছে এসো, কানে কানে একটা মোক্ষম কথা বলে রাখি তোমায়, বয়সকালে কাজে দেবে। শোন, কোনদিন যদি কোনখানে কোন ছেলে কিম্বা বুড়োকে দেখো কোন মেয়ের নামে বদনাম রটাচ্ছে, তা'হলে জানবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কিন্তু রয়েছে। বলতে গিয়ে বিকট শব্দে হেসে উঠেছিলো বুড়ো আহমদ হোসেন। দাড়ির জঙ্গলে আঙুলের চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে পরক্ষণে আবার বলেছিলো। সেই ছেলে কিম্বা বুড়ো বুঝলে? তারা যদি কোনদিন একান্ত নিরালায় সে মেয়েটিকে হঠাৎ কাছে পেয়ে যায়, তা'হলে কিন্তু জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে তার পায়ের গোড়ালি জোড়ায় ব্যথা ধরিয়ে দেবে। গুলতানী নয় বাবা, নিজ চোখে দেখা সব। এই শহরের কোন্ বুড়ো কোন্ মেয়েকে নিয়ে কোন্ রেস্তোঁরায় যায় আর কোন্ মাঠে হাওয়া খায়, সব জানা আছে আমার। বলতে গিয়ে একরাশ থুথু ছিটিয়েছে আহমদ হোসেন।

মার্থাকে নিয়ে রিক্সা থেকে নামলো শওকত। পকেটে হাত দিতে যেতে মার্থা থামিয়ে দিয়ে বললো। দাঁড়ান, আমি দিচ্ছি।

বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট ব্যাগটা থেকে কয়েক আনা খুচরা পয়সা বের করলো মার্থা। সামনের লাল রকটার ওপরে একটা কুষ্ঠ রোগী কবে এসে ঠাঁই নিয়েছে কেউ জানে না। হাত পায়ের নখগুলো তার ঝরে গেছে অনেক আগে। সারা গায়ে দগদগে ঘা। চোয়াল জোড়া ফুটো হয়ে সরে গেছে ভেতরে। আর সেই ছিদ্র বেয়ে লাবাস্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। কাঁধে। বুকে। উরুতে। চারপাশে অসংখ্য মাছির বাসা। ভনভন করে উড়ছে। বসছে। আবার উড়ছে।

রিক্সা বিদায় দিয়ে মার্থা আর শওকত ভেতরে এলো। দেড় হাত চওড়া অপরিসর বারান্দার মুখে কে যেন একটা কয়লার চুলো জ্বালিয়ে রেখেছে। তার ধুঁয়োয় চারপাশটা অন্ধকার হয়ে আছে। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওদের। সহসা দু'জন মহিলা দু'পাশের করিডোর থেকে বেরিয়ে চিৎকার করতে করতে উঠোনের দিকে এগিয়ে গেলো।

আরে, মেরে ফেললো তো।

ক্যায়া হুয়াঁ?

কি অইছে আঁ?

মার, মার। মার না।

আরে ছাড়, ছেড়ে দে বলছি, নইলে মেরে হাড্ডি মাংস গুঁড়ো করে দেবো বলে দিলাম।

আরে আয়ি বড়ি মারনে ওয়ালী।

ত্রিকোণ উঠোনের মাঝখানে মহিলারা প্রচণ্ড কলহে মেতে উঠেছে। এ ওর চুল ধরে টানছে। এ ওর পিঠের ওপর একটানা কিল-ঘুষি মারছে।

দু'টো নেড়ি কুত্তা ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে বার বার লাফাচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা সাহেব বারান্দায় নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ থামিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। জাহান্নামে যাবে সব। হাবিয়া দোজখে যাবে।

এর চেয়ে বড় দোজখ আর কোথাও আছে নাকি? কে যেন জবাব দিলো জটলার ভেতর থেকে। বাইরের এই হট্টগোল শুনে মাওলানা সাহেবের তৃতীয় স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে মুখ বের করে তাকিয়েছিলো। সেদিকে চোখ পড়তে মাওলানা সাহেব গর্জে উঠলেন। তু ক্যায়া দেখ্‌তি হ্যায় আঁ? আন্দার যা।

মেয়েটি সভয়ে পর্দার নিচে আত্মগোপন করলো। উঠোনের কোলাহল চরমে উঠেছে।

মার্থা এক নজর তাকালো শওকতের দিকে। তারপর আরো দুটো সরু করিডোর পেরিয়ে আরো অনেক দরজা পেছনে ফেলে ঘরে এসে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলো সে।

শওকত এগিয়ে গেলো সিঁড়ির দিকে।

জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। আলো থেকে এলে পাশের মানুষটাকেও ভালো করে দেখা যায় না। পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে জ্বালালো সে, আর তার আলোতে যেন ভূত দেখলো শওকত। সিঁড়ির নিচে জড়ো করে রাখা একগাদা আবর্জনার মাঝখানে জুয়াড়িদের একজন লোক খলিল মিস্ত্রীর বউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে। অভাবিত আলোর স্পর্শে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো ওরা। তারপর ছুটে পালিয়ে গেলো দু'জন দু'দিকে।

বুড়ো আহমদ হোসেন আজ এখানে থাকলে হয়তো পকেট থেকে হিসেবের খাতাটা বের করে তাতে আরো একটা নাম যোগ করতো আর বলতো এ আর এমন কি দেখলে ভায়া। শোন, এক সাহেবের গল্প বলি। ব্যাটা দিশি সাহেব। বিলিতি নয়। সেই সাত বছর আগের কথা বলছি, তখন পঞ্চাশের ঘরে বয়স ছিলো ওর। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। তাদের ঘরে নাতি-পুতিও হয়েছে। একদিন এক স্বদেশী মদের দোকানে বিদেশী মদ খেতে খেতে ব্যাটা বললে, দেখো আহমেদ, আমরা কি রোজ এক রেস্তোঁরায় বসে খানা খাই? মোটেই না। আজ কাফে হংকংয়ে। কাল লা-শানীতে। পারশু কসবায়। রোজ মুখের স্বাদ পাল্টাচ্ছে। খাবারের ঘ্রাণ বদলে যাচ্ছে। সেখানেই তো আনন্দ। তুমি কি মনে করো মানুষ কি চিরকাল এক রকম খাবার খেয়ে সুখে থাকতে পারে?

এখানে এসে একবার থামবে বুড়ো আহমদ হোসেন। বার্ধক্যের চাপে কুঞ্চিত চোখজোড়া আরো ছোট করে এনে, দাড়িয়ে অরণ্যে এক বন্য হাসি ছড়িয়ে সে আবার বলবে। ওর কথার গূঢ় অর্থ কিছু বুঝলে? আরে ভায়া, চোর যে চুরি করে, তারও একটা দর্শন আছে। খুনি যে খুন করে সেও জানে বিনা কারণে সে খুন করে নি। হাতের কাঠিটা মাটিতে পড়ে যেতে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারপাশে। আর আলো জ্বালতে সাহস পেলো না শওকত। দিয়াশলাইটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো সে। বারান্দায় পাটি পেতে বসে আজমল আলীর বুড়ো মা নাতি-পুতিদের ডালিম কুমারের গল্প বলছে।

তারপর ডালিম কুমার সাদা ধবধবে একটা ঘোড়ায় চড়ে, ছুটছে তো, ছুটছে তো ছুটছে। হঠাৎ সামনে পড়লো একটা বিরাট নদী। আর তার মধ্যে ইয়া বড় বড় ঢেউ। দেখে তো ডালিম কুমার মহাভাবনায় পড়ে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো দুটো সরু বারান্দা পেছনে ফেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো শওকত। তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লো।

এ বাড়িতে কত ভাড়াটে আছে কেউ বলতে পারবে না। ক'টা ঘর হিসেব করে দেখতে গেলে একটা লোক হয়তো একদিন ধরেও কোন খেই পাবে না। এক করিডোর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বার বার সে ওই একই করিডোরে ফিরে আসবে। কিম্বা ঘর গুনতে গুনতে সে কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে, আর ফিরে আসার পথ পাবে না।

অনেকের সঙ্গে এ ক'বছরে আলাপ হয়েছে শওকতের। কারো নাম জানে। কারো জানে না। কারো সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে স্মরণ-শক্তির বরাত জোরে হয়তো চেহারা দেখে চিনে ফেলে। এ বাড়ির ভাড়াটে। দু' একটা কুশল সংবাদ বিনিময়। তারপর ছ'মাস ন'মাস আবার চার চক্ষুর মিলন হলো। তখন হয়তো চেনার চেষ্টা করেও বার বার ভুল হয়।

দুয়ারে পায়ের শব্দ হতে ঘুরে তাকালো শওকত। মার্থা গ্রাহাম ভেতরে দাঁড়িয়ে। হাতে ধরে রাখা পিরিচে এক টুকরো পাউরুটি।

ব্যাপার কি, অন্ধকারে বসে আছেন? মার্থা অবাক হলো। ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনটা তুলে এনে শওকতের কাছ থেকে কাঠি চেয়ে নিয়ে ঘরে আলো জ্বালালো মার্থা।

হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললো, রুটিটা খেয়ে নিন।

হাতমুখ ধুয়ে অনেকটা সজীব হয়ে এসেছে মার্থা। পায়ের রঙটা কালো তেলতেলে। টানা টানা একজোড়া চোখ, হাল্কা ছিমছাম দেহ। তাকালে মনেই হয় না যে ওর বয়স তিরিশের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো মুখের ওপরে পাউডারের হাল্কা প্রলেপ বুলিয়েছে সে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ লাল লিপিস্টিক। হাত কাটা একটা গাউন পরেছে মার্থা। সোনালি চুলগুলো কাঁধের দু'পাশে ছড়ানো। প্লেট থেকে রুটির টুকরোটা ওর হাতে তুলে দিয়ে মার্থা আবার বললো। চাকুরির কোন খোঁজ পেলেন?

না।

সেই ওষুধের কোম্পানিতে যাওয়ার কথা ছিলো আজ দুপুরে। গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

ওরা কি বললো?

বললো, লোক নিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। শওকত এক দৃষ্টিতে হ্যারিকেনটার সলতেটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মার্থা তার হাতের নখগুলো চেয়ে চেয়ে দেখলো। বাইরে বারান্দায় খুক করে শব্দ হতে সেদিকে ফিরে তাকালো মার্থা।

কয়েক জোড়া সন্ধানী দৃষ্টি জানালার পাশ থেকে অন্ধকারে আত্মগোপন করলো। হ্যারিকেনের আলোয় দাঁড়ানো মার্থা মৃদু হাসলো। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে চাপা স্বরে বললো। একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন নাতো?

শওকত মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে, বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্থা ইতস্তত করে বললো। যতদিন চাকরি না পান, আমার ওখানে খাবেন। কি দরকার শুধু শুধু দুটো চুলো জ্বালিয়ে?

শওকত সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মার্থা আবার বললো, আমি এখন চলি, দেরি হলে আবার রাতকানা লোকটা খেঁকিয়ে উঠবে। আপনি কি বাইরে বেরুবেন?

না, শওকত আস্তে করে জবাব দিলো।

একটু পরে শূন্য পিরিচটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মার্থা। বলে গেলো, ওই কথা রইলো কিন্তু। শেষে ভুলে যাবেন না।

ও চলে যাবার পর অনেকক্ষণ একঠায় বসে রইলো শওকত। মার্থাকে নিয়ে চিন্তে করলো। সেই কবে, কতদিন আগে আজ মনেও নেই। হয়তো সাত-আট বছর হবে। কিম্বা এগারো-বারো। দেখতে তখন আরো অনেক সুন্দরী ছিলো মার্থা। রোজ সন্ধেবেলা বেকারিতে রুটি কিনতে আসতো। তখন থেকে ওকে চেনে শওকত। সেই সময় ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। মাঝে মাঝে মাকে সঙ্গে নিয়ে আসতো মার্থা। সে এক দজ্জাল মহিলা। মার্থা কিন্তু স্বীকার করতে চায় না। বলে, না মায়ের মনটা ছিলো ভীষণ নরম। আপনারা তাকে খুব কাছে থেকে দেখেন নি কিনা তাই চিনতে ভুল করেছেন। আসলে কি জানেন, আমার মায়ের জীবনটা বড় দুঃখে কেটেছে। ভরা যৌবনে, মানে সেই যুদ্ধের শেষের দিকে মা হঠাৎ বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এক নিগ্রোকে বিয়ে করে বসলেন। আমার বয়স তখন বারোতে পড়ি পড়ি করছে। মা আমাকে ত্যাগ করলেন না। সঙ্গে নিয়ে রাখলেন। আর এই নিগ্রোটা, বুঝলেন? অদ্ভুত লোক ছিলো সে। মাকে ভীষণ ভালোবাসতো। দূর থেকে কতদিন আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হতো, মার বয়স বুঝি আমার চেয়েও কমে গেছে। মা ঘরময় ছুটোছুটি করতো। গলা ছেড়ে হাসতো। অকারণে বিছানায় গড়াগড়ি দিতো আর হঠাৎ কখনো কি খেয়াল হতো জানি না, দৌড়ে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় সারা মুখ ভরে দিতো আমার। একদিন একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিলো। এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেদিন, জানি না কি একটা সুখবর ছিলো। আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, সেই নিগ্রোটা মাকে দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে। আমাকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে মা ভীষণ লজ্জা পেলো। চাপা স্বরে বললো, আহ্ কি করছো। ছেড়ে দাও। মার্থা দেখছে সব। আহ্, ছাড়ো না। মার্থা।

নিগ্রোটার কিন্তু কোন ভাবান্তর হলো না। সে একবার শুধু ফিরে তাকালো আমার দিকে, তারপর মাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। মা তার কোলের মধ্যে চুপটি করে বসে লজ্জায় রাঙা মুখখানা আমার থেকে আড়াল করে বললো, ছিঃ মেয়েটা কি ভাবছে বলতো।

নিগ্রোটা কিছু বললো না। শুধু ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

তারপর।

কি আশ্চর্য। একদিন সকালে নিগ্রোটা তার কাজে বেরিয়ে গেলো। আর ফিরলো না।

একদিন। দু'দিন এমনি করে একটি মাস, একটা বছর কেটে গেলো। যে গেলো সে আর এলো না। মা কান্নাকাটি করলেন। গির্জায় গিয়ে কতবার কত নামে যিশুকে ডাকলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কিছুই হলো না। পরে একদিন শুনলাম, সেই নিগ্রোটা তার দেশে, তার ছেলেমেয়ে আর বৌয়ের কাছে ফিরে গেছে।

সেই থেকে মা যেন কেমন বদলে গেছেন। আর সব কিছুতেই আমাকে সন্দেহ করতে লাগলেন তিনি। আমি কোন ছেলের সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতে গেলে তিনি ভীষণ রাগ করতেন। যেন আমি মস্ত বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলছি এমনি একটা ভাব করতেন তিনি।

হ্যাঁ, তাই যেদিন ওর মা সঙ্গে আসতো, সেদিন একেবারে চুপটি করে থাকতো মার্থা। কারো সঙ্গে কথা বলতো না। কোনদিকে তাকাতো না। আর যেদিন সে একা আসতো, সেদিন ওকে দেখে অবাক হতো সবাই। হাসছে। কথা বলছে। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছে। আর দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে এদিক সেদিক।

তারপর একদিন এক অক্সেন ওয়ালার ছেলে পিটার গোমেসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো ওর। ভিক্টোরিয়া পার্কের গির্জায় অনেক আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে পিটারের হাতে বিয়ের আংটি পরিয়ে দিলো মার্থা গ্রাহাম।

তখন ওর চেহারায় অন্য এক জীবনের চমক এসেছে। স্বামীকে নিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরোয় মার্থা। সিনেমায় যায়, রেস্তোরাঁয় খায়। রাতে বল নাচে।

কিছুদিনের মধ্যে বেশ মুটিয়ে গেলো মার্থা। তারপর অনেকদিন ওর কোন খোঁজ পায়নি শওকত। মাঝে একবার শুনেছিলো, একটা মৃত সন্তান প্রসব করেছে সে। ঢাকা ছেড়ে চাটগাঁয়ে আছে স্বামীর সঙ্গে।

এর মধ্যে একদিন বেকারিতে রুটি কিনতে এসে হু হু করে কেঁদো উঠলেন মার্থার মা। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে রেখে বোকার মতো ওর দিকে চেয়েছিলো শওকত। মার্থা মারা গেছে।

আমার মেয়ে মার্থা, ও আর বেঁচে নেই। ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছলেন তিনি। রুমাল ভিজে গেলো কিন্তু অশ্রুর অবাঞ্ছিত বন্যা থামলো না।

হ্যারিকেনের সল্‌তেটা আরো কমিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো শওকত।

নিচের সেই কলহ এখন থেমে গেছে। যার যার ঘরে ফিরে গেছে ওরা। নেড়ি কুত্তা দু'টো উঠোনের এক কোণে যেখানে কয়েক জন জুয়াড়ি তাসের আসর জমিয়ে বসেছে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

একটা চোখ বন্ধ করে দিয়ে আরেক চোখের খুব কাছে এগিয়ে এনে সাবধানে তাস দেখছে খলিল মিস্ত্রী। কেউ যদি দেখে ফেলে সেই ভয়ে। সব কিছুতে অমনি সাবধানতা গ্রহণ করে সে। রোজ সকালে যখন কাজে বেরিয়ে যায় তখন বাইরে থেকে ঘরে তালা দিয়ে যায় খলিল মিস্ত্রী। বউ ভিতরে থাকে। রাতে বাইরে থেকে আসার সময় ঠোঙায় করে বউয়ের জন্যে সন্দেশ নিয়ে আসে খলিল। ওর চোখেমুখে আনন্দের চমক। তালা খুলে ঘরে ঢুকে বউকে অনেক আদর করে খলিল মিস্ত্রী। কাছে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

বুড়ো আহমদ হোসেন বলে, এটাও একটা রোগ, বুঝলে? এক রকমের ক্ষুধা। একজনকে অনন্তকাল ধরে একান্ত আপন করে পাওয়ার অশান্ত ক্ষুধা। ঈর্ষা থেকে এর জন্ম। ঈর্ষার এর মৃত্যু। এ ব্যাটারা কবিতা পড়ে না বলেই এদের এই অধঃগতি। মনে নেই সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটা? 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' আবার সেই হাসি। কালচে দাঁতের ফাঁকে হাসছে বুড়ো আহমদ হোসেন।

শওকত দেখলো, তিনটে তাসকে পরম যত্নে হাতের চেটোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে খুঁটিয়ে দেখছে খলিল মিস্ত্রী। সে যদি জানতো, যে লোকটি তার পাশে বসে তাস খেলেছে; যার সঙ্গে দিনের পর দিন সে হাসি-ঠাট্টা আর কৌতুকে মশগুল হয়ে পড়েছে, সে লোকটা আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সিঁড়ির নিচে তার বউকে নিয়ে শুয়েছিলো। সে যদি জানতো, যে তালা দিয়ে সে তার বউকে রোজ বন্ধ করে যায় তার আরেকটা চাবি এর মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, তাহলে?

খলিল মিস্ত্রী এর কিছু জানে না। হয়তো কোনদিন জানবেও না। তার অজ্ঞানতা তাকে শান্তি দিক।

নিচে, থিয়েটার কোম্পানির ছেলেমেয়েরা গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে নাচের মহড়া দিচ্ছে। কয়েকটা ছেলে-বুড়ো-মেয়ে এসে জুটেছে সেখানে। মহড়া দেখছে। হাসছে। কথা বলছে।

বেশ আছে ওরা। শওকত ভাবলো।

বউ-মারা কেরানিটা উঠোন পেরিয়ে উপরে আসছে। রোজকার মতো আজও দেশি মদ গিলে এসেছে সে। পা টলছে। ঠোঁট নড়ছে। পরনের পাঞ্জাবিটা পানের পিকে ভরা। শওকতের গা ঘেঁষে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো সে। এর পরের-অনুচ্ছেদটুকু অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারে শওকত।

বউ-মারা কেরানিটা ধীরে ধীরে তার ঘরে ঢুকবে। কিছুক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। তারপর হঠাৎ তার রুগ্ন বউটির কান্নার আওয়াজ শোনা যাবে। বালিশে মুখ চেপে কাঁদবে সে।

তাসের জুয়ো যেমনি চলছিলো, তেমনি চলবে।

নাচের মহড়া থামবে না।

মাওলানা সাহেব বারান্দায় বসে একমনে তছবি পড়ে যাবেন।

শুধু উঠোনে বসে থাকা নেড়ি কুত্তা দু'টো উপরের দিকে ঘেউ ঘেউ করবে। আর বাইরের রকে বসা কুষ্ঠ রোগীটার দু' চোয়ালের ছিদ্র দিয়ে একটানা লালা ঝরবে।

নির্লিপ্ত রাত্রির নীরবতায় শিহরণ তুলে রুগ্ন বউটি আরো অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে। তারপর যখন তার কান্না বন্ধ হয়ে যাবে, তখন রাতকানা লোকটার দোকান-ঘরে তালা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে মার্থা। মার্থা গ্রাহাম। মায়ের দেয়া নাম।

আলনা থেকে ময়লা জামাটা নামিয়ে নিয়ে পরলো শওকত। শুকনো চুলের ভেতরে আঙ্গুলের চিরুনি বুলিয়ে নিলো। বাইরে বেরুবে সে। গন্তব্যের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।

হয়তো একবার সেই পুরানো বেকারিতে যাবে। কিম্বা, লঞ্চ কোম্পানির অফিসে না হয় গুজরাটী সাহেবের ওষুধের দোকানে।

একটা চাকুরি ওর বড় দরকার। ভাবতে গিয়ে নিজের মনে ম্লান হাসলো শওকত। গত উনিশ বছর ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়েও এখনো জীবনের একটা স্থিতি এলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে খিদিরপুরের জাহাজ ঘাটে, তারপর এক বাঙালি বাবুর আটা-কলে। মাঝে কিছুকাল একটা রেলওয়ে অফিসে। ফাইল ক্লার্ক। তারপর কোন এক নামজাদা রেস্তোরাঁয় কাউন্টারে। ছ'মাস। সেটা ছেড়ে এক মলম কোম্পানির দালালি করেছে অনেক দিন। এক শহরে থেকে অন্য শহরে। ট্রেনে, স্টীমারে। এরপর বছর দু'য়েক জনৈক সূতো ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছে শওকত। তারপর আগাখানী আহমদ ভাইয়ের আধুনিক বেকারিতে। ওখানে বেশ ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলো না। ছেড়ে দিয়ে একটা আধা সরকারী ফার্মে টাইম ক্লার্কের চাকুরি নিলো শওকত। দশটা-পাঁচটা অফিস। মন্দ লাগতো না। কিন্তু ফাটা কপাল। বেতন বাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো। আর তার খেসারত দিতে গিয়ে সাত দিনের নোটিশে সে অফিস ছাড়তে হলো। সেই থেকে আবার বেকার।

ঘর থেকে বারান্দায় পা দিতেই একজন মোটা মহিলা ঝাড়ু হাতে চিৎকার করতে করতে সামনে দিয়ে ছুটে গেলো। একটা বাচ্চা ছেলেকে তাড়া করছে সে। একটা বিড়াল ওদের পিছু পিছু দৌড়ুচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার বাঁকে তিন হাত উঁচুতে দু'পাশে দুটো জানালা। একটা জানালা থেকে আরেকটা জানালায় কে যেন এক টুকরো কাগজ ছুঁড়ে দিলো। সেটা যথাস্থানে না পৌঁছে শওকতের সামনে এসে পড়লো। একেবারে পায়ের কাছে।

মুখ তুলে উপরে তাকালো শওকত।

স্কুল মাস্টার মতিন সাহেবের মেয়ে জাহানারা জানালার পেছন থেকে মুখ বের করে তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো।

আড়চোখে অন্য জানালার দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো শওকত।

আজমল আলীর ছেলে হারুন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

সিঁড়ি থেকে কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলো শওকত। খুলে দেখলো একখানা চিঠি।

মেয়েলী হাতের গুটি গুটি লেখা। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ছাদে এসো। অনেক কথা আছে। দেখা হলে সব বলবো।

চিঠিখানা ধীরে ধীরে আবার বন্ধ করলো শওকত। উপরে চেয়ে দেখলো, জাহানারার অর্ধেকটা মুখ আর একজোড়া ভয়ার্ত চোখ অধীর আগ্রহে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চিঠিটা বন্ধ জানালার কার্নিশে রেখে দিয়ে নিচে নেমে গেল শওকত। করিডোরে একটা বাচ্চা ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। ঝাড়ু হাতে মহিলা গজ গজ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে উপরের দিকে। বিড়ালটা এখনো ওর পিছু পিছু চলেছে।

মার্থার ঘরের দরজায় ছোট্ট একটা তালা ঝুলছে। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। আজ দু' বছর ধরে রাতকানা লোকটার ওষুধের দোকানে কাজ করছে সে। চাটগাঁয়ের খালেদ খান যেদিন তাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেলো সেদিন চারপাশে অন্ধকার দেখেছিলো মার্থা।

এ চাকুরিটা পেয়ে বেঁচে গেছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত মার্থা। তাকে দেখে প্রথম দিন চমকে উঠেছিলো শওকত।

কুড়ি একুশ বছরের একটা সুদর্শন ছেলের সঙ্গে এ বাড়িতে এসে উঠলো মার্থা। ঘর ভাড়া নিলো। স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিলো সবার কাছে। বেশ ছিলো ওরা।

একদিন ওকে একা পেয়ে শওকত জিজ্ঞেস করলো। মা'র কাছ থেকে শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন। সামনে এখন ভূত দেখছি নাতো?

মা? মা'র কথা বলবেন না। মার্থা ভ্রূ কুঁচকে বললো। নিজের ব্যাপারে সবাই অমন অন্ধ হয়। মা যখন বাবাকে ছেড়ে সেই নিগ্রোটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলো, তখন কোন অন্যায় হয়নি আর আমি গোমেসকে ছেড়ে মস্ত বড় পাপ করে ফেলেছি, তাই না?

ও! শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। তা'হলে লোকে যা বলছে সব সত্যি?

কি?

আপনি এই ছেলেটিকে বিয়ে করেছেন?

না, বিয়ে এখনো হয়নি। হবে। এখানে এসে থামলো না মার্থা। যেন তার মনের অনেক জমে থাকা কথা কারো কাছে ব্যক্ত করে হাল্কা হতে চাইছিলো সে। তাই বললো, মায়ের ইচ্ছেকে সম্মান দিতে গিয়ে গোমেসকে বিয়ে করেছিলাম আমি। মিথ্যে বলবো না, ওর সঙ্গে আমি সুখেই ছিলাম। আমি যা চাইতাম সব দিতো সে। যা বলতাম সব করতো। স্বামী হিসেবে ওর কোন দোষ আমি এখনো দিইনে। খালেদের সঙ্গে গোমেস নিজে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। একদিন রাতে একটা বল নাচের আসরে। বলতে গিয়ে থামলো মার্থা। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে কি যেন চিন্তা করলো সে। তারপর হঠাৎ করে বললো। কি আশ্চর্য দেখুন তো, আপনারা সবাই আমাকে কালো বলে ক্ষ্যাপাতেন। মা বলতেন, আমার গায়ের রঙটা নাকি রীতিমত কুৎসিত। গোমেস অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুই বলতো না। আর খালেদ, ওর কথা কি বলবো আপনাকে, ও সত্যি বড় ভালোবাসে আমায়, নইলে আমার গায়ের এই কালো রঙের কেউ এত প্রশংসা করতে পারে? আমার চোখের মধ্যে ও কি পেয়েছিলো জানি না। বলতে গিয়ে ঈষৎ লজ্জা পেলো মার্থা। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে বললো। ও বলতো। এত সুন্দর চোখ ও নাকি এ জীবনে দেখেনি। জানেন? রোজ একটা করে ও চিঠি দিতো আমায়, আর কোনদিন আমাকে একা কাছে পেলে এমন বাড়াবাড়ি করতো যে, আমি নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম।

এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মার্থা বললো। আজ বিকালে এ আসুক আপনার সঙ্গে আলাপ করে দেবো।

তারপর। একমাস। দু'মাস তিন মাস।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে সত্যি। কিন্তু মার্থার জীবনে তার মায়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অমন অবিকলভাবে ঘটে যাবে সে কথা মার্থা কেন শওকতও কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি।

করিডোর পেরিয়ে উঠোন, গিজ গিজ করছে লোকে।

কেউ কাঠ কাটছে। কেউ থালাবাসন মাজছে। কেউ চুলো ধরিয়েছে। কেউ চান করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউ-মারা কেরানির মার খাওয়া বউটি কলের পাশে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা লম্বা ঘোমটা। যেন তার ক্ষতভরা মুখখানা সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার জন্যে ওটা অত লম্বা করে টেনে দিয়েছে সে।

থিয়েটার পার্টির একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা পুরানো গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজাচ্ছে ওর সঙ্গীরা 'ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমারে করেছে রাণী।' উঠোন পেরিয়ে সামনের করিডোরে এসে পড়লো শওকত।

বউ-মারা কেরানিটা বাজার থেকে ফিরছে।

জুয়াড়িদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো। মাছ কত দিয়ে কিনেছেন?

কেরানি জবাব দিলো, বারো আনা।

জুয়াড়ি বললো। খুব সস্তায় পাইলেন দেখি।

বাড়ির সদর দরজা পেরিয়ে নেমে এলো শওকত।

এক ফালি রোদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীটা চুপচাপ বসে। হাত পায়ের নখ খুঁটছে আর পিটপিট করে তাকাচ্ছে চারপাশে। অদূরে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে মার্বেল নিয়ে খেলছে।

শওকত রাস্তায় নেমে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে তাতে আগুন ধরালো।

কয়লা কুড়োন ছেলেমেয়ের দল ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরছে।

নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলে চলেছে ওরা। রেলওয়ে ইয়ার্ডের কালো ধোঁয়ার ফাঁকে আকাশ দেখা যায় না। চারপাশে ইঞ্জিনের সিটি আর পুশ পুশ শব্দ। বিকেলের রোদে চিকচিক করছে রেল লাইনগুলো। একটা দু'টো করে সেগুলো ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো শওকত। মুখ তুলে তাকাতে দেখলো, অদূরে একটা পানির ট্যাঙ্কের নিচে হারুন আর জাহানারা। নিবিড় ভঙ্গীতে পায়চারি করছে আর কি যেন আলাপ করছে ওরা।

শওকতের পায়ের গতি শ্লথ হয়ে গেলো।

চারপাশে কত লোক আসছে, যাচ্ছে, কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। নিবিষ্ট মনে দু'জনে দু'জনের কথা শুনছে। বলছে। এরই নাম বুঝি ভালাবাসা। শওকত ভাবলো। আর ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের একটা অসম্পূর্ণ ছবি সহসা স্মৃতির কোণে উঁকি দিয়ে গেলো ওর। শহরে নয় গ্রামে।

আমন ধানের মরশুম তখন। সারা মাঠ জুড়ে সোনালি ফসলের সমারোহ। চাষিরা দল বেঁধে ধান কাটছে। গলা ছেড়ে গান গাইছে। ভারায় ভারায় ধান কাঁধে করে বয়ে এনে বাড়ির উঠোনে পালা দিচ্ছে ওরা। ওদের মুখে হাসি, কোমরে লাল গামছা জড়ানো। সবার চলার মধ্যে একটা চপল ভঙ্গী। ব্যস্ততার ভাব। চাষী-বউদের পরনে লাল পাড়ের চেক শাড়ি। উঠোনে গরু দিয়ে ধান মাড়াচ্ছে ওরা। রোদে মেলে দিয়ে শোকোচ্ছে সেগুলো। দল বেঁধে ধান ভানছে ঢেঁকিতে।

সবার চোখে মুখে মনে এক অসীম আনন্দের আমেজ। তার মাঝে একটি মেয়ে। অনেকটা যেন এই জাহানারার মতো দেখতে। শেখদের ছোট মেয়ে আয়েশা। বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়ছে। যৌবনের প্রথম ঢেউ এসে সবে তার দেহে প্রথম চুম্বন এঁকে দিয়ে গেছে।

বাংলার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অপুষ্ট বুকে আর অপূর্ণ অধরে তখনো কারো ছোঁয়া লাগে নি। শীতের শিশির ঝরা সকালে বাড়ি বাড়ি মোয়া বিক্রি করে বেড়াতো সে। হঠাৎ কখনো গাছের ডালে পাখি ডেকে উঠলে চমকে সেদিকে তাকাতো। দূরে কোন রাখালিয়া বাঁশির শব্দ শুনলে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়াতো মেয়েটি। ধান ক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটতে গিয়ে কখনো কোন দমকা বাতাসে গায়ের আঁচলখানা সরে যেতে লজ্জায় রাঙা হয়ে চারপাশে সভয়ে দেখতো আয়েশা। কেউ দেখে ফেললো নাতো?

তখনো সারা গাঁয়ে নবান্নের উৎসব। চাষী-বউরা রসের সিন্নি রেঁধে মসজিদে পাঠাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি নতুন গুড়ের পিঠে তৈরি করছে ওরা। রাতভর পুঁথি পড়া আর কবি গানের আসর।

এমনি সময়ে আয়েশার খবর শুনে আঁতকে উঠলে সবাই। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে মাঠে ছুটে এলো ছেলে বুড়ো মেয়ে। সোনালি ধানের বুক উঁচু ক্ষেত। তার মাঝখানে শুয়ে জীবনের শেষ ঘুম ঘুমাচ্ছে আয়েশা। চারপাশের পাকা ধান গাছগুলো অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। অনেকগুলো পাকা ধান ঝরে পড়ে আছে শুকনো মাটির বুকে। যে টুকরিতে করে মোয়া বিক্রি করতো সেটাও পাওয়া গেলো অদূরে। মোয়াগুলো সব ছড়িয়ে আছে চারপাশে। সোনালী ধানের কোলে শুয়ে আছে আয়েশা। ওর সারা মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। ওর অপুষ্ট স্তনের কোল ঘেঁষে দুটো ক্ষত। রক্তের একজোড়া ফিনকি বোঁটা ছুয়ে গড়িয়ে পড়েছে একগোছা ধানের শীষের উপরে।

হঠাৎ একটা ট্রেনের তীব্র হুইসেলের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলো শওকত। ও যে লাইনে দাঁড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে আসছে ট্রেনটা। ইঞ্জিনের ভেতর থেকে মুখ বের করে বুড়ো ডাইভার চিৎকার করে উঠলো আব্বো হো ক্যায়া?

শওকত তাকিয়ে দেখলো, জাহানারা আর হারুন অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। এতক্ষণের একান্ত ঘনিষ্ট আলাপে ওদের ছন্দপতন ঘটলো।

শওকত নিজেই যেন লজ্জা পেলো। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে ফিরে গেল শওকত।

কাউন্টারে অনেক লোকের ভিড়

সবার সঙ্গে একগাল হেসে কথা বলছে মার্থা। সবার সব রকমের চাহিদা চটপট পূরণ করতে হচ্ছে ওকে। ক্রেতাদের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে এক নজর চোখ বুলিয়েই শো কেসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। স্যরি কড লিভার অয়েল ফুরিয়ে গেছে। বিকাডেক্স আছে। বসুন, এক্ষুণি দিচ্ছি।

কি বললেন? হ্যাঁ, সকালে একটা। দুপুরে একটা আর রাতে ঘুমোবার আগে একটা। আচ্ছা থ্যাঙ্কস॥ পয়সাগুলো নিয়ে গিয়ে রাতকানা লোকটার হাতে পৌঁছে দিয়ে আবার কাউন্টারে ফিরে আসছে মার্থা।

গুড ইভিনিং মিস্টার হোসেন, আপনার শরীর এখন কেমন আছে, ভালোতো?

মার্থার চোখেমুখে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা।

ওটাই ওর কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রেতাদের অসন্তুষ্ট করলে চলবে না। তাদেরকে সব সময় খুব আদরে সোহাগে সম্বোধন করতে হবে। যেন একবার এ দোকানে এলে বারবার ফিরে আসে।

বুড়ো আহমদ হোসেন বলে, শালার বিকার। বিকার। সব ব্যাটা বিকারে ভুগছে। মেয়ে দেখিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি, খদ্দের বাড়ানোর কারসাজি। পনেরো বছর ধরে অলি-গলি সব চষে ফেললাম আর এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনে। শোন, এক কেরানির কিচ্ছা বলি। বেতন মাসে দেড়শো টাকা পায়। পরিবারে পুষ্যি হলো আটজন। সত্তর টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে হয়, রইলো কত? আশি টাকা। ওই আশি টাকায় আটটি মানুষ এই শহরে বেঁচে থাকতে পারে? পারে না। কিন্তু পারছে। ঠিক পেরে যাচ্ছে। বলবে সেটা কেমন করে। তা'হলে শোন, সেই কেরানির একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি সবে পনেরোয় পড়ি পড়ি করছে। যখনি টাকার টান পড়ে তখনি পিতৃদেব কন্যাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সামনের মেসে পাঠিয়ে দেন। না, কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। টাকা ধার চাইতে। আর ওই যে মেসের কথা বললাম, ওখানে থাকে আট দশটি জোয়ান ছেলে। তিরিশের ধারে পাশে বয়স। বউ চালাবার মুরোদ নেই বলে বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু হাজার হোক পুরুষ মানুষতো, মেয়ে দেখলেই মজে যায়। হাতে টাকা না থাকলেও অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনে মেয়েটিকে ধার দেয়। তারপর ধরো একদিন সে টাকা ফেরত চাইতে এলো কেউ। পিতৃদেব বাড়িতে থেকেও নেই। দরজা খুলে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো। করুণ চোখ জোড়া মেলে তাকালো ছেলেটির দিকে।

ব্যাস। আর কি চাই। ছেলের মস্তিষ্ক ততক্ষণে গুলিয়ে গেছে। বলতে গিয়ে বিকার গ্রস্ত রোগীর মতো বার বার হাসে বুড়ো আহমদ হোসেন।

বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাউন্টারে দাঁড়ান মার্থার ব্যস্ততা লক্ষ্য করলো শওকত। তারপর ভেতরে পা দিতেই মার্থার চোখ পড়লো ওর দিকে।

এসো, আস্তে করে ওকে কাছে ডাকলো মার্থা। দেয়াল ঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বললো, মিনিট দশেক তোমাকে বসতে হবে। তারপর আমার ছুটি।

আরেকজন খদ্দেরের হাত থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আবার কাজে লেগে গেলো মার্থা।

শওকত বললো, আমি তা'হলে একটু ঘুরে আসি।

ঘুরে আসার নাম করে আবার চলে যেও না যেন। শো-কেস থেকে কি একটা ওষুধ খুঁজতে গিয়ে জবাব দিলো মার্থা।

শওকত বললো, না এই বাইরের ফুটপাথে ঘুরবো।

মার্থা বললো, থ্যাঙ্কস্। ওকে নয়, একজন গ্রাহককে। কাল রাত থেকে ওরা আপনির পালা চুকিয়ে দিয়ে দু'জনে দু'জনকে তুমি বলে সম্বোধন করছে।

প্রেম নয়। এমনি।

কাল রাতে ভাত খেতে বসে মার্থা বলছিলো, না, আপনি আর আমাকে আপনি আপনি করবে না তো, ভীষণ খারাপ লাগে।

ঠিক আছে, আজ থেকে না হয় তোমাকে তুমিই বলবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে। অবশ্য তুমি যদি আবার আপনি করে ডাকো, তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে।

কেন? আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি যদি আপনি বলি, সেটা ভালোই দেখাবে।

ভালো মন্দ বুঝিনে বাবা। বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে গিয়ে একদিন শুনে এসো। ছোট বড় বলে কিছু নেই। খোদা আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে তৈরি করেছেন। শুধু দুনিয়াতে পাঠবার সময় একটু আগে পরে পাঠাচ্ছেন। বুঝলে?

শুনে শব্দ করে হেসে উঠেছিলো মার্থা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

হয়নি। তবে এভাবে আরো মাস কয়েক বেকার থাকলে মাথাটা আপনা থেকেই খারাপ হয়ে যাবে। বলতে গিয়ে গলায় ভাত আটকে গিয়েছিলো ওর।

এক গ্লাস পানি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে মার্থা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেছিলো, কি হলো?

ও কিছু না। পানিটা খেয়ে নিয়ে শওকত জবাব দিয়েছিলো। অন্যের রোজগারের ভাত তো, গলা দিয়ে সহজে নামতে চাইছে না। কথাটা বলে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো সে।

মার্থা কিন্তু সহসা কোন জবাব দিতে পারে নি। শুধু একবার চমকে তাকিয়েছিলো ওর দিকে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছিলো, আমি তো তোমাকে বিনে পয়সায় খাওয়াচ্ছিনে। যে দিন টাকা আসবে হাতে, হিসেব করে সব চুকিয়ে দিয়ো।

তারপর আর একটা কথাও বলে নি মার্থা।

সকালে যখন ওর ঘরে চা আর রুটি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলো তখনো চুপ করে ছিলো সে। ওকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে শওকত পেছন থেকে ডেকেছিলো, শোন।

কি।

বিকেলে দোকানে থাকবে তো?

কেন?

না এমনি। ভাবছিলাম ওদিকে একবার যাবো।

দশ মিনিটের কথা বলে আধঘণ্টা পরে বাইরে বেরিয়ে এলো মার্থা। শওকত তখনো ফুটপাতে পায়চারি করছে।

অনেক দেরি করিয়ে দিলাম তোমার, পেছন থেকে এসে বললো মার্থা। তুমি নিশ্চয় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার শ্রাদ্ধ করছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, করছিলাম বৈকি।

সত্যি? মার্থারের চোখে মুখে হাসি। আজ সকালের মার্থা যেন বিকেলে এসে অনেক বদলে গেছে। একটা ফুটপাত ছেড়ে আরেকটাতে পা দিয়ে মার্থা বললো, শোন, এখন বাসায় ফিরবো না। একটা ছবি দেখবো আজ।

ছবি। সিনেমা?

হ্যাঁ! তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে। অবশ্য টিকেটের টাকাটা আমি পরে তোমার কাছ থেকে কেটে নেবো। ভয় পেয়ো না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এ রকম বাকি-বকেয়া চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত বুঝলো। সুযোগ পেয়ে ওকে একটা খোঁচা দিলো মার্থা। সারাদিন কি করে কাটালে? পথ চলতে চলতে মার্থা আবার শুধালো।

শওকত বললো, রোজ যেমন কাটে।

কোথাও গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কিছু হলো?

না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দু'জনে। সিনেমা হলের সামনে এসে মার্থা বললো, আজ আমি তোমার কথা একজনকে বলেছি।

কে।

তুমি চিনবে না! আমাদের একজন পার্মেনেন্ট খদ্দের, সরকারী অফিসের কর্তা ব্যক্তি, দু'চারটে লোককে চাকুরি দেয়ার ক্ষমতা আছে ওর।

কি বললে?

বললাম, তোমার একটা চাকুরি দরকার। এর আগে আরো অনেক জায়গায় কাজ করেছো।

অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর।

কি বলে আমার পরিচয় দিলে? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে টাকা বের করলো মার্থা। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি টিকেট কিনে এক্ষুণি আসছি। চারপাশের লোকজনকে দু'হাতে সরিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলো মার্থা।

রাতে যখন সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরলো ওরা, তখন পুরো পাড়াটা ক্লান্ত কাকের মতো ঝিমুচ্ছে। শুধু কুষ্ঠ রোগীটা এখনো জেগে। ওর চোখে ঘুম নেই।

উঠোনে পা দিয়ে মার্থা চাপা গলায় বললো, ছাদে একটা মেয়ের ছায়া দেখলাম।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ছাদের দিকে তাকালো শওকত।

কোথায়?

আমাদের পায়ের শব্দ শুনে সরে গেছে।

ও কিছু না।

আলকাতরার মতো অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পকেট থেকে দিয়াশলাইটা বের করে আগুন জ্বালালো শওকত।

মার্থা হঠাৎ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা তুমি ভূতে বিশ্বাস করো? মানে ঘোষ্ট?

হঠাৎ ভূতের কথা কেন?

না, এমনি। বল না, বিশ্বাস করো?

করি।

কোন দিন দেখেছো?

হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজ চোখে?

হুঁ।

সত্যি? মার্থা চোখ বড় বড় করে তাকালো ওর দিকে।

শওকত আরেকটা কাঠি জ্বালতে জ্বালতে বললো, দরজা খোল।

দিয়াশলাই-এর স্বল্প আলোতে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো ওরা। মার্থা একটা মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের ওপরে রাখলো।

সত্যি, তুমি নিজ চোখে দেখেছো?

কি।

ভূত!

হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে তোমাকেও দেখাতে পারি। ওই দেখো বলে মার্থার পেছনের দেয়ালে পড়া তার নিজের লম্বা ছায়াটাকে হাতের ঈশারায় দেখালো শওকতকে।

নিজের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে দিলো মার্থা। বাব্বাহ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যি। বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো সে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। শওকতের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললো, আমি দেখতে ভূতের মতো, তাই না?

শওকত অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলো, আমি কি তাই বললাম নাকি? ওর কথাগুলো মার্থারের কানে গেলো না। মনে হলো সে যেন কি চিন্তা করছে।

শওকত বললো, চুপ করে গেলে যে?

মার্থা ম্লান হেসে বললো, জানো, ছোট বেলায় রাস্তার ছেলেমেয়েরা আমাকে কালো পেত্নী বলে ডাকতো। আমি দেখতে খুব বিশ্রী, তাই না?

বারে, কালো হলে বুঝি কেউ দেখতে বিশ্রী হয়? শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। সত্যি বলছি, তুমি কিন্তু রীতিমত সুন্দরী।

মার্থা মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে। ওর চিবুকে আর চোখে এক ঝলক লজ্জা আর ঠোঁটময় এক টুকরো কৌতুকের হাসি কাঁপছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আস্তে করে বললো, সে আমি আর সেই বাচ্চাটি নেই বুঝলে। যাকগে, এ কথা বলার জন্যে তোমাকে আজ একটা স্পেশাল খাবার খাওয়াবো। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি ওগুলো গরম করে নিচ্ছি।

আরেকটা মোমবাতি ধরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো মার্থা। পাশাপাশি দু'খানা ঘর ওর। একটাতে ও শোয়।

আরেকটাকে বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করে। খান কয়েক বেতের চেয়ার। একটা টেবিল। আর কোন আসবাব নেই ঘরে। দেয়ালে দু'টো ছবি টাঙ্গানো। একটা মাতা মেরির, শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন তিনি, আরেকটা ক্রুশে বিদ্ধ পিতা যিশুর ছবি। খেতে বসে মার্থা বললো, তুমি এক কাজ করবে?

কি?

তোমার ঘরটা ছেড়ে দাও।

তারপর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘরে এসে থাকো। মার্থা সহজ গলায় বললো, দুটো কামরা আমার কোন কাজেই আসে না। একটাতে তুমি অনায়াসে থাকতে পারো। ভয় নেই, মাসে মাসে ভাড়ার টাকাটা ঠিক কেটে রাখবো। তাতে করে আমার সুবিধে হবে, আর তুমিও আপাতত নগদ বাড়ি ভাড়া দেবার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

পাগল না মাথা খারাপ! শওকত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো।

শওকত শান্ত স্বরে বললো, তা'হলে আর এ বাড়িতে থাকতে হবে না। সবাই মিলে ঝেঁটিয়ে বের করবে।

ও। মার্থা এতক্ষণে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, ঠিক আছে, মাঝখানের দরজাটা না হয় বন্ধ করে দেবো আমরা। তোমার এক ঘর, আমার এক ঘর। অন্য অনেক ভাড়াটেরা তো ওভাবেই আছে। কি, রাজি?

শওকত ম্লান হেসে বললো, দাঁড়াও, চট করে কিছু বলতে পারছি না। একটু চিন্তা করতে হবে। সব কিছুতেই তোমার অমন চিন্তা করতে হয় কেন বলতো? মার্থার কণ্ঠস্বরে শাসনের ভঙ্গী। আর কোনকথা শুনতে রাজি নই। কাল পরশুর মধ্যে তুমি শিফট করছো।

এর কোন উত্তর দিতে পারলো না শওকত। শুধু মনে মনে ভাবলো মার্থা যেন ওর সব কিছুর ওপরে ধীরে ধীরে তার কর্তৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবতে গিয়ে মৃদু হাসলো শওকত। মার্থা ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হাসছো কেন?

শওকত হাসি থামিয়ে বললো, এমনি।

মার্থা মাথা নাড়লো, মোটেই না। নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে। মোমের আলো মার্থার মসৃণ ত্বকে একটা স্নিগ্ধ আভার জন্ম দিয়েছিলো।

শওকত আস্তে করে বললো, ভাবছিলাম তুমি একটা আস্ত পাগল। রাতে কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো শওকতের। জেগে উঠে মনে হলো পুরো বাড়িটা ভেঙ্গে পড়বে। ছাদে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, উঠোনে ছেলে বুড়ো মেয়ের ভিড়। সবাই কলকল করে কথা বলছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। কিন্তু কারো কথা স্পষ্ট করে বোঝবার কোন উপায় নেই।

জেগে উঠেই মার্থার কথা মনে হলো শওকতের। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে। সেখানে লোকজনের ভিড়। ওদের কোন কথা শোনা কিম্বা ওদের কাছ থেকে কিছু জানার অপেক্ষা করলো না শওকত। ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে এড়িয়ে এলো সে। ওর ধাক্কা খেয়ে কে একজন চিৎকার করে উঠলো। আরে অ মিয়া চোখে দেহেন না। ধাক্কান ক্যান।

মাঝ সিঁড়িতে মার্থার সঙ্গে দেখা হলো। সে উপরে আসছিলো। তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

কি হয়েছে? উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলো মার্থা।

কি হয়েছে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললো শওকত।

ওহ্। মার্থা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে অনেকটা হালকা করে নিলো সে। আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোমার কিছু হয়েছে। ওর বিবর্ণ মুখখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছে। উহ, আমি যা ভয় পেয়েছিলাম। বলতে গিয়ে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো ওর।

শওকত বললো, কিন্তু।

জুয়াড়িদের একজন চিৎকার করে উঠলো। ওসব কিন্তু টিন্তু বুঝিনে। বাড়িটা একটা বেশ্যাখানা নয় যে, যার যেমন খুশি তাই করবে। মাওলানা সাহেব বললেন, তওবা, তওবা। এসব কোন্ দেশী বেলেল্লাপনা আঁ।

শওকত আর মার্থা এতক্ষণ নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলো যে এই হট্টগোলের আসল হেতু খোঁজার অবকাশ পায় নি। হাতের কাছে মোহসীন মোহসিন মোল্লাকে পেয়ে শওকত জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

অ খোদা, এতক্ষণেও কিছু শোনেন নি আপনি। মোহসিন মোল্লা অবাক হলো। ও কি কিছু বলার আগে মোবারক আলী বললো, কমু কি হালার, কলিকালের কথা। ছাদের উপরে মতিন সা'বের মাইয়া আর আজমল সাহেবের ছেইলা। বলতে গিয়ে ফ্যাসফ্যাস গলায় হাসলো সে।

মোহসিন মোল্লা ওর অসম্পূর্ণ কথাটা শেষ করে দিয়ে বললো, প্রেম করছিলো। ধরা পড়েছে।

মার্থা তাকালো শওকতের দিকে। ওর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। জাহানারাদের ঘরের দরজা জানালাগুলো সব বন্ধ। লজ্জায় বাইরে বেরোবার সাহস পাচ্ছে না হয়তো। বুড়ো মাস্টার, কারো সাতে পাঁচে থাকে না। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, বিকেলে ফেরে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা বলে না। আজ দশ বছরের ওপরে হলো এ বাড়িতে আছে কিন্তু কারো সঙ্গে কিছু নিয়ে একটু বচসাও করেনি কোনদিন। এ সময়ে তার মনের অবস্থাটা সহজে অনুমান করতে পারে শওকত।

মার্থা বললো, নাচিয়েদের ওখানে সেলিনা বলে একটা মেয়ে আছে না! ও নাকি প্রথমে দেখেছিলো বেশ ক'দিন আগে। জাহানারার মাকে ও হুশিয়ার করে দিয়েছিলো। কিন্তু ওর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি।

আজমল আলীর ঘরে বাতি জ্বলছে। ছেলের বাবা তিনি। তার এত লজ্জার কিছু নেই। জোয়ান বয়সে ছেলেরা অমন এক আধটু ফষ্টিনষ্টি করে। তবু ছেলেকে যে তিনি শাসন করেন নি তা' নয়। উত্তম-মধ্যম কিছু দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যে ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। জাহানারাদের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না তিনি।

মতিন মাষ্টারের বদ্ধ ঘরে বাতি জ্বলছিলো। এবার সেটাও নিভে গেলো। প্রতিবাদ করার মতো কিছু নেই ওদের। মেয়ে দোষ করেছে। হাতেনাতে ধরা পড়েছে। লোকে এখন কুৎসা গাইবেই। জোর করে ওদের মুখ বন্ধ করার কোন মন্ত্র কারো জানা নেই।

বারান্দা আর উঠোনের ভিড়টা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেছে অনেকে। কিন্তু কথার খৈ ফুটা এখনো বন্ধ হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত দেখলো বউ-মারা কেরানির বউটা বারান্দার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঘোমটার ফাঁকে চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।

জুয়াড়িরা বারান্দায় তাস নিয়ে বসে গেছে। বাকি রাতটা আর ঘুমিয়ে কি হবে। ভোরে ভোরে যারা কাজে বেরিয়ে যায় ওদেরই দু'একজন ইতিমধ্যে কলতলায় স্নান পর্ব সারার কাজে লেগে গেছে। শওকত বললো, ঘরে যাও মার্থা।

মার্থা বললো, আমার আর ঘুম আসবে না। তার চেয়ে এক কাজ করি শোন, তুমি বসো। আমি চট করে দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

শওকত কোন জবাব দিবার আগে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো মার্থা। বাইরে দু'একটা কাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। ভোর হবার আর দেরি নেই।

না। আর চলে না। এভাবে আর আমি পারছি না মার্থা। শওকতের গলার স্বর ভারি হয়ে এলো। ভাবছি কোথাও চলে যাব।

কোথায়?

কোথায় জানি না। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো শওকত। কোনো মফঃস্বল শহরে গেলে হয়তো কিছু জুটে যাবে।

মার্থা ম্লান হাসলো। ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে করে বললো। অমন স্বার্থপরের মতো চিন্তা করো কেন?

এতে আবার স্বার্থপরের কি হলো! ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো শওকত।

না, তেমন কিছু হয় নি। মুখখানা জানালার দিকে নিয়ে বাইরে তাকালো মার্থা। জাহানারাদের ঘরটা ওখান থেকে দেখা যায়। সে রাতের ঘটনার পরে জাহানারাকে ঘরের ভেতরে বন্ধ করে রেখেছে ওর মা। একদিন এক মিনিটের জন্যেও মেয়েটাকে বাইরে বেরুতে দেয় নি।

ওকে চুপ থাকতে দেখে শওকত পেছন থেকে আবার বললো, স্বার্থপর কেন বললে?

মার্থা বাইরে তাকিয়ে থেকে বললো, বললাম তো এমনি। কেন, তোমার কি খুব লেগেছে? জানালার কাছ থেকে সরে এলো সে। ওর গলার স্বরে ঈষৎ ঝাঁজ।

শওকত বললো, তোমাকে বললে তোমারও লাগতো। ওর গলার স্বরে ঈষৎ গাম্ভীর্য। দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ওরা। নিচের নাচিয়ের দল জোরে গ্রামোফোন বাজাচ্ছে আর হল্লা করছে। মাঝে মাঝে কি যেন কৌতুকে শব্দ করে হেসে উঠছে ওরা।

সহসা, মার্থা বললো, ওরা বেশ আছে। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো ওর।

শওকত নড়েচড়ে বসলো। মনে হলো যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। ছোট্ট করে বললো, হুঁ।

মার্থা জানালার পাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখলো তাকে, তারপর আবার বাইরে মুখখানা ফিরিয়ে নিলো সে। মোহসিন মোল্লার বউ তার ছ'মাসের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুধ খাওয়াচ্ছে আর কি একটা ছড়া কাটছে গুন্ গুন্ করে। সে দিকে চেয়ে থেকে মার্থা বললে', আমারো আর কিছু ভালো লাগছে না। ভাবছি কোথাও চলে যাবো।

যেতে ইচ্ছে হলে যাও না। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি। আমাকে ওসব কথা শুনাচ্ছো কেন? শওকতের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আমেজ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিলো সে। নাকি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো, তুমি চলে গেলে আমি খাবো কোথায়? চলবো কেমন করে।

আমি কি সে কথা বলেছি তোমায়? শওকত নিজেও ভাবতে পারেনি মার্থা অত জোরে চিৎকার করে উঠবে। ওর চোখে দু'ফোটা পানি টলমল করছে। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। রাগে কিম্বা অভিমানে। দুনিয়াতে শুধু নিজের দিকটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছো, অন্যের কথা একটুও ভাবো না।

বাইরে বারান্দায় দু'একজন উৎসাহী শ্রোতার ভিড় জমতে দেখে শওকত চাপা গলায় বললো, চিৎকার করছো কেন, আস্তে কথা বলা যায় না?

টপ করে একটা ফোঁটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে মুখখানা ওর দিকে থেকে আড়াল করে নিলো মার্থা। হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে, তারপর অত্যন্ত মৃদুগলায় বললো, চলি। বলে আর সেখানে অপেক্ষা করলো না সে।

টেবিলের ওপরে রাখা হ্যারিকেনের হলদে লালচেটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো শওকত। নিচে কুকুর দু'টো সেই কখন থেকে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। এখনো থামেনি। বারান্দায় যারা কান পেতে ছিলো, তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে ঘরে। বউ-মারা কেরানির বউটা মার খেয়ে কাঁদছে।

অস্থিরভাবে অনেকক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলো শওকত। কিছুই ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে দু'টো ইট খুলে নিয়ে কুকুর দুটোর মাথা লক্ষ্য করে মেরে ওদের চিরদিনের জন্যে চুপ করিয়ে দিতে। কিম্বা, বউ-মারা কেরানির বউটির গলা টিপে ধরে বলতে, চুপ করো। না, তাও নয়। ইচ্ছে করছে বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলতে, কোথায় নিয়ে যাবে বলছিলে আমায়। নিয়ে চলো। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে টেবিলের ওপর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিলো শওকত। তারপর অকস্মাৎ ওটাকে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে মারলো সে। ঝন্ ঝন্ শব্দে হ্যারিকেনের কাঁচটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

শব্দটা বেশ ভালো লাগলো শওকতের।

চারপাশে গাঢ় অন্ধকার।

মনে হলো যেন সতের বছর আগে ফিরে গেছে শওকত– সারা কোলকাতা অন্ধকার ব্ল্যাক আউট। খিদিরপুরের ডকে একটা আলোও জ্বলছে না।

মাটির নিচে অন্ধকার সেন্টারের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে সে। শুধু সে নয়। আরো অনেকে। ছেলে বুড়ো মেয়ের গাদাগাদি। একটা প্লেনের শব্দ হলো। দুটো। তিনটে। অনেকগুলো প্লেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেলো মাথার ওপর দিয়ে। পর পর কয়েকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেলো ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর থেকে কিছু মাটি ধসে পড়লো নিচে। গায়ের ওপরে। পাশের বুড়োটা চিৎকার করে উঠলো। ইয়া আল্লাহ।

একটা ছেলে একটা যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে চুপচাপ, হয়তো শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। একজন মা তার বাচ্চাটাকে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে। ওর একটা ছোট ছেলে সভয়ে তাকাচ্ছে চারদিকে।

বাইরে তখন জাপানিরা বোমা ফেলছে।

কতক্ষণ মনে নেই। অনেকক্ষণ হবে হয়তো। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে গেলো। একটি অস্থির নীরবতা। তারপর আবার সাইরেন বেজে উঠলো। প্রথমে একটা। তারপর, অনেকগুলো একসঙ্গে।

মাটির গুহা থেকে একে-একে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। তখনো অন্ধকার। আর ধুঁয়ো। মাথায় লোহার টুপি পরা এ-আর-পি'র লোকগুলো ছুটোছুটি করছে চারপাশে। ওদের হাতে টর্চ, পায়ে বুটজুতো।

অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পায়ের সঙ্গে কী যেন লাগছে ওর। ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলো শওকত। একটি মেয়ে। হ্যাঁ, ষোলো-সতেরো বছরের যে মেয়েটা সারাদিন ডকে ভিক্ষে করে বেড়াতো—সে। নরম বুকটা রক্তে ভিজে আরো নরম হয়ে গেছে। না। বেঁচে নেই? অনেকক্ষণ আগেই মরে গেছে।

শওকতের মনে হলো, বুক-উঁচু ধানক্ষেতের মাঝখানে শুয়ে-থাকা মেয়ে আমেনা। না আমেনা নয়, ভিখারিনি মেয়ে সকিনা।

না সকিনাও নয়। মার্থা।

অন্ধকারে একটা দীর্ঘ ছায়ার মতো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মার্থা।

মার্থা বললো, বেহায়ার মতো আবার এলাম। শওকতের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ইতস্তত চারপাশে তাকালো সে। বাড়ি কী হলো?

আমি নিভিয়ে দিয়েছি। আস্তে করে জবাব দিলো শওকত। ভেতরে এসো না, কাচে পা কাটবে। শেষের কথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে বললো সে।

মার্থা একবার মেঝের দিকে তাকালো। কিছু দেখতে পেলো না। তারপর মৃদু গলায় বললো, ভেতরে আমি আসবো না। ভয় নেই। তোমাকে একটা কথা জানাতে এসেছিলাম। কাল বিকেলে একবার দোকানে এসো। যে-লোকটাকে তোমার চাকরির কথা বলেছিলাম সে আসবে। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার। কথাটা শেষ করে আর সেখানে দাঁড়ালো না মার্থা। উত্তরের অপেক্ষা করলো না। খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো সে।

না। মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছে।

কিছুই ভালো লাগছে না ওর।

রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। কুকুরগুলো এখন আর চিৎকার করছে না। বউ-মারা কেরানির বউ কান্না থামিয়ে চুপ করে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে সে। কিম্বা মাতাল স্বামীর সেবা করছে। সারা বাড়িতে কেমন একটা ভয়াবহ নির্জনতা। যেন মানুষজন কেউ নেই।

হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হলো ওর। মনে হলো এই অন্ধকার-ঘরে একা থাকতে ভয় লাগছে আজ। বন্ধ-দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। সারাবাড়িতে গোরস্তানের নীরবতা আর কবরের মতো অন্ধকার। বাড়ির বিড়ালটাও আজ ঘুমুচ্ছে। একবারও তার ডাক শোনা যাচ্ছে না।

সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপ গুণে গুণে নিচে নেমে এলো সে। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত দিয়ে পাশের দেয়ালটাকে একবার পরখ করে নিলো। ঠিক আছে। ধীরে ধীরে মার্থার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো শওকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে করে একটা টোকা দিলো দরজায়।

কোনো সাড়া নেই।

আরেকটা দিলো। এবার একটু জোরে।

ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ হলো। কে! মার্থার গলার স্বর।

শওকত সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি মার্থা। আমি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না ওর। শুধু একটা অতি ক্ষীণ ধ্বনি বাতাসে ঈষৎ কাঁপন জাগিয়ে মিলিয়ে গেলো।

মার্থা তার ঘরে বাতি জ্বালালো।

দিয়াশলাই-এর কাঠির শব্দটাও কান পেতে শুনলো শওকত। ধীরে ধীরে ভেতর থেকে দরজাটা খুললো সে। হাতে ওর একটা মোমবাতি।

শওকতকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো মার্থা। বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। কিন্তু বলতে পারলো না। শওকত ওর হাতের মোমটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো। তারপর মুহূর্তে মার্থাকে দু-হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলো সে। শক্ত কাঠের মতো একটা দেহ। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো মার্থা। পারলো না। ওর শুকনো ঠোঁটে একটা তীব্র চুম্বন এঁকে দিলো শওকত। আরেকটা। আরো একটা।

না। জোর করে ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো মার্থা। তারপর ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়লো। বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। মার্থা কাঁদছে।

অসহায়ভাবে একবার বিছানার দিকে তাকালো শওকত। মার্থাকে এভাবে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি সে। কী করবে ভেবে পেলো না। একটু পরে শওকত অনুভব করলো ওর হাত-পা ভীষণভাবে কাঁপছে। আর হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকধুক শব্দ করছে। হঠাৎ শওকতের মনে হলো মার্থার কান্নার শব্দে যদি বাড়ির সবাই জেগে গিয়ে এদিকে আসে তাহলে? না। মার্থার এভাবে ডুকরে কান্নার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না শওকত। যেন কেউ মারা গেছে ওর। মার্থা বিলাপ করছে। শওকত সভয়ে তাকালো চারদিকে। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

অন্ধকার, একহাত দূরে কী আছে বোঝা যায় না। পুরো বাড়িটা তমিস্রায় ঢেকে আছে। একটা ইঁদুর কিচকিচ শব্দ তুলে পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ভয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। নিজের নিশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া পর শওকতের মনে হলো–আশেপাশের দেয়ালগুলো যেন দেখতে পাচ্ছে সে। এ দিকে আলো বাড়ছে। শওকত অবাক হলো, সিঁড়ির দিকে না গিয়ে পথ ভুল করে উঠোনে চলে এসেছে সে। এবার রীতিমতো ভয় করতে লাগলো ওর। হাত-পাগুলো অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। পথ হাতড়ে আবার সিঁড়ির দিকে ফিরে এলো শওকত।

কোথায় একটা বাচ্চাছেলে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। মা ছড়া কেটে শান্ত করার চেষ্টা করছে তাকে। ঘরে ফিরে এসে দরজায় খিল এঁটে দিলো শওকত। সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। যেন একটা প্রচণ্ড জ্বর এসে গায়ে এইমাত্র ছেড়ে গেলো। দরজায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। গলার নিচে ধুকধুক শব্দটা কমেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর। কলসি থেকে এক-গ্লাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে নিলো শওকত।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো ওর, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আড়মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে শুলো সে। চোখ খুললো। মেঝেতে অনেকগুলো কাঁচের টুকরো ছড়ান। দিনের আলোয় চিকচিক করছে। আবার চোখ বন্ধ করলো শওকত। সারাদেহে কী এক আলস্য। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে কাল রাতের কথা ভাবলো সে। আর তক্ষুণি মার্থার কথা মনে পড়লো ওর। মনে পড়লো রাতে ওর ঘরে যাওয়ার কথা। সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে উঠে বসলো শওকত। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। দালানের মাথার ওপর দিয়ে কড়া রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। এত বেলা পর্যন্ত এর আগে কোনোদিন বিছানায় শুয়ে থাকেনি সে। মার্থা কি এসেছিলো সকালে? হয়তো এসেছিলো। ওর কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিলে নিশ্চয় জেগে যেতো শওকত। না, মার্থা আসেনি। কাল রাতের সে ঘটনার পর হয়তো মনে মনে ওকে ঘৃণা করছে মার্থা।

মার্থা আর আসবে না।

ভাবতে গিয়ে বুকের নিচে একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করলো সে।

নাচিয়ে দলের মেয়ে সেলিনা কলতলায় চান করেছে। একটা তোয়েলে দিয়ে হাত-পা-মুখ রগড়াচ্ছে মেয়েটা। শূন্যদৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলো শওকত। ওর দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি নগ্ন পা-জোড়া ভেজা কাপড়ে ঢেকে দিলো সেলিনা। শওকতের কোনো ভাবন্তর হলো না। মেয়েটা আড়চোখে আবার তাকালো। মৃদু হাসলো সে।

বারান্দা থেকে সরে আবার ঘরে এলো শওকত। কি করবে বুঝতে পারছে না। খিধে পেয়েছে ভীষণ। কিছু খাওয়া দরকার। মগে করে পানি এনে বারান্দায় মুখ ধুতে বসলো সে।

আজমল আলীর ঘরের সামনে লোকজনের ভিড়। দেশের বাড়ি থেকে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসেছে। হারুনের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে ওরা। না। জাহানারার সঙ্গে নয়। আজমল আলীর নিজের বোনঝির সঙ্গে। স্কুলে পড়ে মেয়েটা। বিষয়-সম্পত্তি আছে।

হাতমুখ মুছে কাপড় পালটালো শওকত। ঘরময় কাচের টুকরোগুলো এখনো ছড়িয়ে রয়েছে। থাক। জাহান্নামে যাক সব। বাইরে বেরুবার পথে ভাঙা হ্যারিকেনটাকে অকারণে একটা লাথি মেরে ঘরের কোণে সরিয়ে দিয়ে গেলো সে।

মার্থার ঘরের দরজায় একটা তালা ঝুলছে। ভোরে-ভোরে বেরিয়ে গেছে সে। জাহান্নামে যাক মার্থা। আপনমনে বিড়বিড় করে উঠলো শওকত।

বাহার যা রাহে ক্যায়া? পেছনে মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো সে।

নাচিয়ে দলের মেয়ে সেলিনা তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একখানা তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। সামনে পড়ে-থাকা একরাশ ঘন কালো কুন্তল পিঠের ওপর সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বললো, বাহার যা রাহে ক্যায়া।

শওকত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। এ প্রশ্ন হঠাৎ কেন, বুঝতে পারলো না সে। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ। তামাটে চোখ। গাঢ় বাদামি অধর। মার্থার চেয়ে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর সেলিনা। অনেক বেশি জীবন্ত।

ক্যায়া দেখ রাহেঁ। মুখ টিপে পরিমিত হাসলো মেয়েটি। আকারণে লজ্জায় রাঙা হয়ে তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়টা টানতে গিয়ে আরো একটু সরিয়ে দিলো।

শওকত আস্তে করে বললো, কিছু না। বলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো সে। কোথায় যাচ্ছেন বললেন নাতো। এবার উর্দুতে নয়, বাংলায় প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

শওকত ঘুড়ে দাঁড়িয়ে বললো, বাইরে যাচ্ছি, কাজে। কেন, কিছু বলবেন নাকি?

হ্যাঁ।

বলুন।

ভেতরে আসুন, বলছি। অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রূজোড়া বাঁকালো মেয়েটি। ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি।

ইতস্তত করে ভেতরে এলো শওকত। আমার একটু তাড়া আছে। কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।

বলছি। অমন অধীর হচ্ছেন কেন, বসুন। চুলগুলো ধীরে ধীরে খোঁপাবদ্ধ করলো মেয়েটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট ঘর। প্রায় শূন্য। একটা চৌকি। এলোমেলো বিছানা। তাকে কতকগুলো শিশি-বোতল জড়ো করা। একটা ভাঙা আয়না। চিরুনি। কোণায় দড়ির ওপরে কতগুলো ময়লা কাপড়। পুরানো একটা ট্রাঙ্ক। চিত্রতারকাদের ছবিতে ভরা কয়েকটা ক্যালেণ্ডার।

কাল রাতে নিচে এসেছিলেন কেন? দেহটা ভেঙে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটি। সারা মুখে তার দুষ্টুমি-ভরা হাসি।

শওকতের মাথায় যেন বাজ পড়লো। ইতস্তত করে বললো, তার মানে?

কাল রাতে নিচে এসেছিলেন কেন? প্রত্যেকটা কথার ওপরে জোর দিয়ে টেনে-টেনে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শওকত। তারপর দৃঢ় গলায় বললো, আপনি কি বলতে চান?

আমি কি বলতে চাই। অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করলো সেলিনা। বাঁকা চোখে ওর দিকে একটু তাকিয়ে অকারণে রাঙা হলো সে। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, আমি বলতে চাই কাল রাতে আপনি নিচে এসেছিলেন?

হ্যাঁ, এসেছিলাম।

মার্থার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছিলাম।

ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছিলেন। দু-বার।

হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

মার্থার হাতে মোমবাতি ছিলো। ফুঁ দিয়ে সেটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

শওকতের গলা দিয়ে আর কথা সরলো না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো সে। একটা ডাইনি। একটা পিশাচ। শওকতের মনে হলো ওর কলজেটা গলার কাছে এসে আবার ধুকধুক শুরু করে দিয়েছে।

কি, চুপ করে গেলেন যে! বাদামি অধর-জোড়া জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলো সে। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত স্বর বের করে বললো, জাহানারার মত ইচ্ছে করলে আপনাকেও ধরিয়ে দিতে পারতাম। দিইনি, মায়া হয়েছিলো তাই।

শওকতের মনে হলা ওর স্নায়ুগুলো যেন ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে। পা-জোড়া ভীষণ ভারী হয়ে গেছে। নাড়তে পারছে না।

সেলিনা ওর হাতের তোয়ালেটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিন, বড় বেশি ঘামাচ্ছেন। মুছে নিন, আবার শব্দ করে হেসে উঠলো সে। আমিও বাইরে বেরুবো। বসুন, কাপড়টা পালটে নিই। বলে দরজার সামনে থেকে ঘরের কোণে যেখানে একটা দড়ির ওপরে অনেকগুলো ময়লা কাপড় ঝোলানো সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। যেতে যেতে বললো, এদিকে তাকাবেন না কিন্তু।

শওকতের সবকিছু তাকগোল পাকিয়ে গেছে। ভাবনার গ্রন্থিগুলো যেন সব ছিঁড়ে গেছে ওর। তবু ভাবতে চেষ্টা করলো সে। এখন কী করবে। পেছনে সেলিনার কাপড় পালটানোর খসখস শব্দ।

সহসা শওকত বললো, রাতে ঘুমোন না নাকি?

ঘুম! বিচিত্র এক ধ্বনি বেরুল মেয়েটির কণ্ঠে। ঘুম আমার আসে না। কেন?

দরজায় খিল এঁটে ঘুমোতে পারি না বলে। সেলিনা আবার খিলখিল হেসে উঠলো। কাঁচা হলুদ মাংসের দেহটা হরিদ্রা শাড়িতে পেঁচিয়ে নিয়ে শওকতের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। আরো বসতে ইচ্ছে করছে বুঝি?

শওকত সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো ওর।

করিডোরে কয়েকটা বাচ্চাছেলে মাটির পুতুল নিয়ে খেলা করছে বসে বসে। কলতলায় কতকগুলো এঁটো বাসন ছড়ানো। কয়েকটা কাক সেখানে খাবারের কণা খুঁজছে। কুকুরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে চিৎকার করে তাড়া দিচ্ছে ওদের। ছুটে যাচ্ছে কিন্তু ধরতে পাচ্ছে না। নিষ্ফল আক্রোশে শুধু লাফাচ্ছে।

আরো দুটো করিডোর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। কুষ্ঠরোগীটা রকের উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে। চারপাশে ভনভন করছে মাছি।

না। লোকটা পড়ে গলে পড়বে। কিন্তু মরবে না।

শওকত আপন মনে বিড়বিড় করলো। সেলিনা ওর খুব কাছ ঘেঁষে হাঁটছে। ওর কাঁধটা এসে মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে ওর গায়ে। শওকতের সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো। সহসা দৌড়ে গিয়ে একটা চলন্ত বাসের ওপরে উঠে পড়লো সে। পেছনে তাকালো না। তাকাবার সাহস হলো না ওর।

সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে আড়াল-করে-রাখা একজোড়া উদ্ধত যৌবন ওকে পেছন থেকে ব্যঙ্গ করছে। করুক। সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা শূন্য সিটের ওপর বসে পড়লো শওকত। কিন্তু পেছনে তাকানোর লোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না। আড়চোখে দেখলো, হরিদ্রা শাড়ির আঁচল বাতাসে পতপত করে উড়ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তেকে ধীরে ধীরে বাসার পথে ফিরে যাচ্ছে সেলিনা।

হুঁ, তারপর, বলো বলে যাও, থামলে কেন? চায়ের কাপটা শব্দ করে পিরিচের ওপরে নামিয়ে রাখলো বুড়ো আহমদ হোসেন। ঘিঞ্জি-গলির মাথায়, দরমায়-ঘেরা রেস্তোরাঁর অসমতল টুলের ওপরে দুজনে বসে।

শওকত বললো, বললাম তো সব। আর কী বলবো।

মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে, কী যেন আটকে ছিলো সেটা বের করলো বুড়ো আহমদ হোসেন। ভেজা আঙুলটা নাকের কাছে এনে শুঁকলো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, শালার তুমি একটা উল্লুক। মেয়েটাকে চুমু দিতে গিছলে কেন, কামড়ে দিতে পারলে না। কসম করে বলছি, তাহলে আর কাঁদতো না ও। আরে বাবা, এসব মেয়ে আমার অনেক দেখা আছে। সতেরো বছর ধরে দেখছি।

শওকত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। না না, তুমি মার্থাকে জানো না। ও খুব ভালো মেয়ে।

ভালো? কথাটা বলতে গিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বুড়োটা। কোন্ ব্যাটা আছে এই শহরে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে আমি ভালো। সব জোচ্চোর। বদমাশ। আমার ছেলেটাকে যেদিন কুড়ি বছর ঠুকে দিলো সেদিন বুঝে ফেলেছি, চিনি ফেলেছি সবাইকে।

বাদামতলির নিষিদ্ধ এলাকায় কী একটা খুনের মামলায় জড়িত হয়ে ছেলে তার জেল খাটছে। তার কথা মনে পড়ায় সহসা কথার বল্গায় লাগাম টানলো বুড়ো। বার্ধক্যের ছানি পড়া চোখজোড়া ছলছল করছে। অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলো সে। বাদামতলি খারাপ।

বাদামতলি খারাপ। আর তোমরা কী? ওই তো ব্যাটা আলি খান কনট্রাক্টর। ফরসা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। বুঁইবুঁই গাড়ি হাঁকায়। আলিশান বাড়িতে থাকে। তিন-তিনটে বউ ঘরে শালার। কেউ খোঁজ রাখে? রোজ রাতে দুই বউকে ব্যাটা বড় বড় সাহেবদের বাড়িতে ভেট পাঠিয়ে কনট্রাক্ট বাগায়। একটাকে রেখে গিয়েছে নিজের জন্যে। ওটা কাউকে ছুঁতে দেয় না। কেউ খোঁজ রাখে? বলতে গিয়ে খকখক করে কিছুক্ষণ কাশলো সে। মুখে-আসা থুতুগুলো আবার গিলে নিয়ে বললো–যাকগে, তোমার একটা চাকরির দরকার বলছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, যাই পাও একটা জুটিয়ে দাও। যদি তোমার খোঁজে থাকে। উৎসাহে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে এলো শওকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ চাটুকু একঢোকে গিলে নিয়ে বুড়ো আহমদ হোসেন বললো, দিতে পারি যদি করতে রাজি থাকো। চাকরি নয়। তবে চাকরিও বলতে পারো।

কি? শওকতের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

টুলের ওপরে একখানা পা তুলে নিয়ে উরু চুলকোতে চুলকোতে কী যেন ভাবলো বুড়ো। ভেবে বললো, কিছু না এই এদিকের মাল ওদিক করা আর কী?

তার মানে?

শওকতের সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁত বের করে নতুন বিয়ে করা বউ--এর মতো হাসলো বুড়ো আহমদ হোসেন। শোনো, তাহলে খুলেই বলি। তোমার কাজ হবে, যেই সন্ধে হলো অমনি, কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দেবো তোমায়, ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর কয়েকটা লোক দেখিয়ে দেবো তোমায়, প্রথম প্রথম অবশ্যই তোমার চিনে নিতে কষ্ট হবে, তারপর মাসখানেক কাজ করলেই ওদের ভাবভঙ্গি দেখে তুমি ঠিক বের করে নিতে পারবে। এই বের করাটাই হচ্ছে আসল কাজ। তারপর, একটা কথা শিখিয়ে দেবো তোমায়, ওই কথা গিয়ে ওদের কানে কানে বলবে। ব্যাস্। তারপরের কাজটা একেবারে শানির মত সহজ। কতকগুলো বাড়ি দেখিয়ে দেবো তোমায়। লোকগুলোকে সঙ্গে করে এনে সেই বাড়িগুলোতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। ছানিপড়া চোখে পিটপিট করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো বুড়ো আহমদ হোসেন। কি, রাজি?

শওকত উসখুস করলো। কাজটা ঠিক বুঝলাম না।

বুঝবে, বুঝবে, বুঝবে না কেন। আবার একগাল হাসলো বুড়োটা। শোনো, তাহলে আরো খুলে বলি। ওই-যে বাড়িগুলোর কথা বললাম, ওখানে খাসাখাসা কতকগুলো মেয়ে থাকে। আহা অমন উসখুস করছো কেন, পুরোটা শুনে নাও না। তুমি নিজে তো আর কিছু করছো না, তোমার কী এলো গেলো। তুমি তো শুধু বকরা ধরে আনবে। নগদানগদি টাকা।

মেয়ের দালালি করতে বলছো আমায়? বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো শওকত।

বুড়ো আহমদ হোসেন ঘোঁত করে উঠলো। এইতো এবার মুখ খারাপ করতে হয় আমার। আরে বাবা, যে-শালারা এসব কাজ করে বেড়ায় তারা লেখাপড়ায় তোমার চাইতে কম না, অনেক বেশি। নিজেকে কী অমন কেউকেটা ভাবো যে কাজটা নিতে লজ্জা করছে? আর ওই ছুঁড়িগুলো, ওরাও তোমার ওই নালা-খন্দ থেকে কুড়িয়ে আনা নয়। সব ভদ্র ঘরের মেয়ে। স্কুলে-কলেজে পড়ে। ঘর-সংসার করে। ইচ্ছে করলে কোনোদিন তুমি নিজেও গিয়ে দু-এক রাত শুয়ে আসতে পারো ওদের সঙ্গে। তোমার কী? টাকা রোজগোর হলেই হলো। ওরাও তো টাকার জন্যেই করছে এসব।

চলি এবার। এই অস্বস্তিকর প্রস্তাবের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে শওকতের। সে উঠে দাঁড়ালো।

ব্যাস্। পছন্দ হলো না তো। বুড়ো আহমদ হোসেন শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করে বললো, তা পছন্দ হবে কেন। যাও মার্থার কাছেই যাও, গিয়ে মার্থার ঠোঁট চোষো গিয়ে, তাতেই পেট ভরবে। আমার কাছে এসে আর পেনপেন কোরো না। ঘুষি মেরে একদম নাকের ডগা গুঁড়ো করে দেবো।

শেষের কথাগুলো শওকতের কানে গেলো না। ততক্ষণ রাস্তায় নেমে গেছে সে। মার্থার কাছেই যাবে সে। হ্যাঁ, মার্থার কাছে।

মার্থা ওকে ঘৃণা করবে। করুক। ওর কাছে মাফ চাইবে সে। বলবে, আমাকে ক্ষমা করে দাও মার্থা। আমি না-বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি। তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। সারাটা জীবন আমি দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নিয়েছি। কোথাও শান্তি পাইনি। আমি তোমার কাছে শুধু একটু শান্তি পেতে গিয়েছিলাম। আর কোনো উদ্দেশ আমার ছিলো না। মার্থা, তুমি কেন আমাকে কাছে টেনে নিলে না মার্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্থা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। ক্রেতাদের সঙ্গে সেই আগের মতো হেসে-হেসে কথা বলছে সে। তেমনি সহজ। স্বাভাবিক।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখলো শওকত। বিকেলে আসতে বলেছিলো সে। এখন রাত। যে-লোকটার আসার কথা ছিলো সে বোধহয় এসে চলে গেছে। ভেতরে যাবে কিনা ভাবলো। ভাবতে গিয়ে কাল রাতের কথা আবার মনে হলো ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের রাক্ষস এসে গ্রাস করতে চাইলো ওকে। পা কাঁপলো। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। বুকটা ধুকধুক করছে।

মার্থা কাউন্টার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। শওকতের মনে হলো এখনি একটা দৌড় দিয়ে পালাতে পারলে বেঁচে যায় সে। কিন্তু, মার্থা সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার, ভেতরে না গিয়ে এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? চলো। মার্থার গলার স্বর আর মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলো শওকত। ভেতরে যেতে যেতে মার্থা আবার বললো, এত দেরি করে এলে কেন, ভদ্রলোক তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন। বসো এখানে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আবার কাউন্টারে চলে গেলো মার্থা।

রাতকানা লোকটা চশমার ফাঁকে বারকয়েক তাকালো ওর দিকে। কেমন যেন একটা সন্দেহের দৃষ্টি। যেন শওকত একটা মস্তবড় অন্যায় করে ফেলেছে। মার্থা ওই রাতকানা লোকটাকে সব কথা বলে দেয়নি তো? নইলে লোকটা গোঁফের নিচে অল্পঅল্প করে হাসছে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কেন ওকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত?

এসো। কতক্ষণ পরে মনে নেই, মার্থা এসে ডাকলো ওকে। ওর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলো শওকত। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, মার্থা আজ সেজেছে। বিয়ের আগে সেই বেকারীতে আসার সময় যেমন সাজতো সে, তেমনি। হঠাৎ যেন বয়সটা অনেক কমে গেছে ওর।

রাস্তায় নেমে কিছুদূর পথ কোনো কথা বললো না মার্থা। ওকে বেশ গম্ভীর মনে হলো। শওকত ভাবলো, আর দেরি না করে এই পথচলার ফাঁকে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে হয়।

মার্থা অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো, তোমার চাকরিটা বোধহয় হবে না।

হবে না? ওর কথাটারই যেন প্রতিধ্বনি করলো শওকত।

মার্থা বললো, হোতো। এখনো হয়। ওর কথায় যদি আমি রাজি হয়ে যাই।

কে জানে হয়তো মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে সব জায়গায় এমনি আদর-সোহাগ পাওয়া যায়। শওকত ভাবলো।

কী কথা? শওকতের দম বন্ধ হয়ে এলো।

মার্থা বললো, থাক, নাইবা শুনলে।

শওকত শুনে ছাড়বে। বললো, বলোই না।

মার্থা বললো, লোকটা আমাকে দিন কয়েকের জন্যে ওর সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে যেতে বলছিলো।

কেন?

মার্থা ম্লান হাসলো। তোমাকে চাকরি দেয়ার জন্যে।

ততক্ষণে একটা সেলুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। শওকত বললো, এখানে কী?

মার্থা ওর মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, মুখের দাড়িগুলো কত লম্বা হয়ে গেছে। একবার আয়নায় গিয়ে দেখো। চলো, শেভ করে নাও।

এখন, এই রাতে?

হ্যাঁ এখন, যাও ঢোকো। মার্থার চোখেমুখে শাসনের ভঙ্গি। ভালোই লাগলো শওকতের, কাল রাতের কথা হয়তো ভুলে গেছে মার্থা। খোদা, ওকে সব ভুলিয়ে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলুনের লোকগুলো টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখছে মার্থাকে। হাতজোড়া কোলে নিয়ে মার্থা এককোণে চুপচাপ বসে। যে-লোকটা ওর মুখে সাবান ঘষছে তার যেন কোনো তাড়া নেই। অফুরন্ত অবসর। অথচ এর আগে যখন সেলুনে দাড়ি কামাতে এসেছে সে, তখন লোকগুলো এত তাড়াহুড়ো করেছে যে, অর্ধেকটা দাড়ি থেকে গেছে মুখে। ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে পাওনা চুকিয়ে দিলো মার্থা . তারপর আবার রাস্তায় নেমে এলো ওরা।

মার্থা বললো, আজ আর বাসায় ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না করতে পারবো না। চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নেবো। মার্থার গলায়, কথায়, অভিব্যক্তিতে সামান্য জড়তা নেই। অথচ কাল রাতে বালিশে মুখ গুঁজে মেয়েটা কেমন ডুকরে কাঁদছিলো। শওকতের মাথায় আবার সবকিছু তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। একটা জট খুলতে গিয়ে সহস্র জটে জড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তার সূতোগুলো।

রেস্টুরেন্টের একটা কোণ বেছে পাখার নিচে গিয়ে বসলো ওরা।

মার্থা শুধালো, কী খাবে বলো।

শওকত শুধালো, তুমি কী খাবে বলো।

মার্থা বললো, আমি শুধু এক কাপ চা খাবো। আমার ক্ষিদে নেই।

বারে আমি একা খাবো।

হ্যাঁ। তুমি খাবে আর আমি বসে-বসে তোমার খাওয়া দেখবো। এতক্ষণে এক টুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেলো ওর মুখে। কী খাবে বলো।

কাবাব-পরটা।

অর্ডার দেয়ার বিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেলো। মার্থা তার কথামতো বসে-বসে ওর খাওয়া দেখলো। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বললো সে। বললো, সকালে অমন মোষের মতো ঘুমুচ্ছিলে কেন? দরজায় কত ধাক্কা দিলাম, জাগলে না। দুপুরে নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নাহ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না আমি। দ্যাখো তো শেভ করে নেয়ায় তোমাকে এখন কত ভালো দেখাচ্ছে। কী রকম ঝিশ্রী আর রোগা রোগা লাগছিলো। বললো, পরটা রেখে দিলে কেন, খেয়ে নাও। আরেকটা কাবাব আনতে বলবো?

কাল রাতের একটু চিহ্নও নেই মার্থার চোখেমুখে। তবু রিকশায় উঠে শওকত ভাবলো মার্থার কাছ থেকে এই ফাঁকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়।

শওকত ডাকলো, মার্থা।

মার্থা বললো, কী।

শওকত ঢোক গিললো। একটা কথা বলবো?

বলো।

তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করেছো তাই না?

কেন। রাগ করবো কেন? মুখ ঘুরিয়ে শওকতের দিকে তাকালো সে। পরক্ষণে যেন রাগ করার কারণটা মনে পড়ে গেলো ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কেমন কালো হয়ে এলো মার্থার।

শওকত লক্ষ্য করলো।

মার্থা বললো, ওহ! বলে চুপ করে রইলো সে।

অন্ধকার গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে রিকশাটা। দুজনে নীরব। কী অসহ্য এই নীরবতা। শওকতের মনে হলো এখনি ভেঙে পড়বে সে। মার্থা ধীরে ধীরে বললো, সত্যি এটা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

শওকত মরিয়া হয়ে বললো, মার্থা, আমাকে মাফ করে দাও তুমি, তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। বিশ্বাস করো।

ওর একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো মার্থা। মৃদু হেসে বললো, পাগল। তুমি একটা আস্ত পাগল। যে-জিনিসটা চাইলেই পেতে, তাকে অমন চোরের মতো পেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাও কেন? জানো, কাল রাতে আমার মনে হয়েছিলো তুমিও আর পাঁচটা লোকের মতো। নিতান্ত সাধারণ। তোমার চোখজোড়া কী বিশ্রী লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো একটা মাতাল। গুণ্ডা। ছোটলোক। সত্যি, তোমার ওপরে হঠাৎ ভীষণ ঘেন্না এসে গিয়েছিলো আমার। আমি সেটা সহ্য করতে পারিনি, তাই কেঁদেছিলাম। ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরলো মার্থা।

শওকত একটা সুবোধ বালকের মতো বললো, আর আমি অমন করবো না মার্থা।

মার্থা হাসলো। পাগল।

রিকশাটা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। পুরো পাড়াটা ঝিমুচ্ছে ঘুমের ঘোরে।

শওকত আস্তে করে ডাকলো, মার্থা।

মার্থা ওর হাতটা কোলের কাছে টেনে এনে বললো, বলো।

শওকত ইতস্তত করলো। এখন একটা চুমো দিই।

না।

কেন?

রিকশাওয়ালাটা কি মানুষ না নাকি? মার্থা ফিসফিস করে বললো, ঘরে গিয়ে দিয়ো। যত ইচ্ছে দিয়ো।

রিকশা থেকে নামলো ওরা।

কুষ্ঠরোগীটা রকের ওপর বসে। আজ ওর প্রতি হঠাৎ বড় মায়া হলো শওকতের। মার্থার দিকে চেয়ে বললো, লোকটাকে একদিন হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়। এখনো ঠিকমতো চিকিৎসে করলে হয়তো ভালো হয়ে যাবে। কী বলো?

কিন্তু মার্থা ওর কথার কোনো জবাবা দিলো না। রিকশার পয়সাটা চুকিয়ে দিয়ে আস্তে করে বললো, এসো।

অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়ে মার্থা আবার বললো, ম্যাচিশটা জ্বালাও তো। তালা খুলি।

পকেট থেকে দিয়াশলাই-এর বাক্সটা বের করে জ্বালালো শওকত। খুট করে একটা শব্দ হলো পেছনে। শওকত ফিরে তাকালো। পেছনে দরজার আড়ালে একটা ছায়া। কাঁচা হলুদের মতো যার গায়ের রঙ। তামাটে যার চোখ। আর গাঢ় বাদামি যার অধর। শওকতের মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো। একটা ভয়ের রাক্ষস এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ওকে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো মার্থা। মিষ্টি গলায় ডাকলো, এসো।

না। এখন না। মার্থা। শওকত ঢোক গিললো। তারপর আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না সে। মার্থা অবাক হয়ে দেখলো অন্ধকার সিঁড়ির মোড়ে হারিয়ে গেলো শওকত।

ভয়ের রাক্ষস তাড়া করছে ওকে।

সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে আড়াল-রাখা একজোড়া উদ্ধত যৌবন, নিচে তার ঘরে নাচের মহড়া দিচ্ছে। এখান থেকে তার ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে শওকত।

মার্থা বললো, দেরি করছো কেন, ওঠো। তাড়াতাড়ি বাড়িটা দেখে আসি গিয়ে। আমাকে আবার দুটোর মধ্যে দোকানে যেতে হবে। এ বেলা ছুটি নিয়েছি। শওকতের শুকনো চুলের দিকে চোখ পড়তে বললো, মাথায় তেল দাও। ভালো করে চুলগুলো আঁচড়ে নাও। এমন ছন্নছাড়ার মতো থাকো!

না। আর এই ছন্নছাড়া জীবন নয়। এবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে চায় শওকত। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছে। জীবনের সহস্র সর্পিল পথের বাঁকে থেমেছে। দেখেছে। ঘুরেছে অনেক। আজ বড় ক্লান্ত সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা অনেক টাকা ভাড়া চাইবে। শওকত ধীরে ধীরে বললো, কমপক্ষে দেড়শ' টাকা।

মার্থা বললো, চলো না, একবার গিয়ে দেখি তো।

গত কয়েকদিন ধরে অনেক বাড়ি দেখেছে ওরা। অনেক অলিগলি ঘুরেছে। বাড়ি পছন্দ হলেও ভাড়ার অঙ্ক শুনে চুপসে গেছে মন।

বাবুবাজারের বাড়িটা পেলে মন্দ হতো না। শওকত চুলে তেল দিতে-দিতে বললো। ভাড়াটাও কম ছিলো।

কিন্তু অত টাকা আগাম দেবে কোত্থেকে? ওর দিকে চিরুনিটা বাড়িয়ে দিলো মার্থা। আমাদের তো আর একগাদা জমা-টাকা নেই। কথাটা বলে ম্লান হাসলো সে। তাছাড়া বাড়ি ভাড়াতে সব টাকা খরচ হয়ে গেলে, খাওয়া-পরা চলবে কেমন করে। পরের কথাটা বলতে গিয়ে থামলো মার্থা। লজ্জায় মুখখানা রাঙা হলো ওর। আস্তে করে বললো, বিয়ের পর সংসারটা তো আর অমন ছোট থাকবে না। বাড়বে। বলে রাঙা মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিল সে।

শওকত মনে-মনে হিসেব করে দেখলো, সত্যিই তো। মাসে দেড়শ' টাকা করে পায় মার্থা। একশ' টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে আর থাকে কত। ভাবতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। ও যদি একটা চাকরি পেতো।

আচ্ছা মার্থা, ও লোকটা তোমাকে কক্সবাজার নিয়ে যেতে চায় কেন?

কোন্ লোকটা।

ওই যে, যাকে আমার চাকরির কথা বলেছিলে।

ও, মার্থা সহসা গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু পরে ম্লান হেসে বললো, কেন নিয়ে যেতে বোঝ না?

ওর চোখের দিকে চোখ পড়তে শওকত আর কোনো কথা বলতে পারলো না। মুখখানা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ওর।

মার্থা সেটা লক্ষ্য করে বললো, অতসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না তো! যা হবার হবে। চলো। চারপাশে সন্তর্পণে তাকিয়ে ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে মুহূর্তে ওকে একটু আদর করে দিয়ে আবার বললো, চলো।

শওকত বললো, যাই বলো বিয়ের পরে কিন্তু এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

মার্থা বললো, ঠিক আছে। আমি তো অমত করিনি। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি যাবো। আপাতত একটা বাড়ি খুঁজে তো বের করি। চলো।

সেলিনার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে এখনো নাচের মহড়া দিচ্ছে সে। কাঁচা হলুদ মাংস বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে ওর। নানা রঙের বুটি-আঁকা অপরিসর কামিজের নিচে যৌবনের ভাজগুলো থরেথরে সাজানো। তাকাবে-না তাকাবে-না করেও একবার তাকাতে হলো। তাড়াতাড়ি চোখজোড়া ফিরিয়ে নিলো সে। না, ওকে আর ভয় করবে না শওকত। মার্থা রয়েছে সঙ্গে। নতুন বাড়িতে গিয়ে মার্থাকে নিয়ে নতুন জীবনের ভিত পাতবে সে। না, আর ভয় করবে না।

ওরা রিকশা নিলো না। হেঁটে চললো।

মার্থা বললো, এই তো অল্প একটু পথ।

শওকত তার কথা শেষ করলো। হেঁটেই যাওয়া যাবে। শওকত জানে, কদিন থেকে বেশ হিসেবি হয়ে উঠেছে মার্থা। আটআনা পয়সা বাঁচতে পারলে মন্দ কী। কাজে আসবে।

এ পথে উদ্দেশ্যবিহীন বহু হেঁটেছে শওকত। মার্থাকে নিয়ে আজকের এই হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই। এই শহরে কত লোক। কত বাড়ি। তারই এককোণে একটা বাসায় খোঁজে বেরিয়েছে ওরা। মার্থা আর শওকত।

শওকত আর মার্থা। একটা পছন্দমতো ঘর। কিছু আশা। কিছু স্বপ্ন। অনেক ভালোবাসা। আর হয়তো অশেষ দৈন্যে-ভরা একটুকরো সংসার। তাই হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লম্বা মিছিল যাচ্ছে। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা। হাতে হাতে অসংখ্য ফ্যস্টুন। প্লাকার্ড। মিছিলটা বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত থামলো না।

মার্থা আস্তে করে শুধালো, কী ভাবছো।

শওকত বললো, কিছু না।

মার্থা বললো, আমি কী ভাবছি বল তো।

শওকত চিন্তা করে নিয়ে বললো, তুমি। তুমি ভাবছো একটা বাড়ির কথা।

না। মোটেই না, মৃদু হেসে মাথা নাড়লো মার্থা। আমি ভাবছি বাড়িটা পেলে কেমন করে সাজাবো তাই।

শওকত তাকিয়ে দেখলো মার্থার চোখে স্বপ্ন। আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগে ওকে।

বাড়ি দেখে দুজনেই পছন্দ হলো। হোক না কবুতরের খোঁপের মত ছোট-ছোট দুটো কামরা। তবু ভাড়া কম। মাসে পঁচাত্তর টাকা।

দু-মাসের আগাম দিতে হবে, দেড়শ'। সে টাকা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা মেরামত আর চুনকাম করে দেবে বাড়িওয়ালা। এঘর ওঘর ঘুরে-ঘুরে দেখলো মার্থা। পেছনে ছোট একটুকরা উঠোন। সরু বারান্দা। রান্নাঘরে এসে ঢুকলো মার্থা। উপরের টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে। ওকে ওদিকে তাকাতে দেখে বাড়িওয়ালা বললো, ওর জন্যে ঘাবড়াবেন না। আগাম পেলে সব মেরামত করে দেবো। আগে যারা ছিলো–এক নম্বরের পাজি লোক, ভাড়ার টাকা নিয়ে খিটিমিটি করতো। তাই আমিও আর মেরামতে হাত দেইনি। আপনাদের জন্যে সব দেবো আমি। একটু অসুবিধেও হতে দেবো না, দেখবেন।

শওকতের দিকে তাকালো মার্থা।

শওকত বললো, ভালোই তো লাগছে।

বাড়িওয়ালা বললো, আপনারা দেখুন। দোকানটা খালি ফেলে এসেছি। চলি। যাবার সময় দেখা করে যাবেন।

শওকত ঘাড় নাড়লো। বাড়িওয়ালা চলে গেলে মার্থা বললো, লোকটা বেশ।

শওকত বললো, হুঁ।

মার্থা বললো, আমাদের আর দেখার কী আছে।

শওকত বললো, চলো।

আগে চোখে পড়েনি। সরু পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলো বাসার সামনে একটা ছোট স্টেশনারি দোকান আছে বাড়িওয়ালার। দোকান ঘরটাও বাড়িরই একটা অংশ। মাঝখানে একটা দরজা আছে ভেতরে যাওয়ার। এখন সেটা বন্ধ। বাড়িওয়ালা বললো, কেমন দেখলেন।

শওকত বললো, ভালো।

মার্থা তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোকানঘরটাকে লক্ষ্য করছিলো। সহসা বললো, এটা আপনার নিজের বুঝি?

বাড়িওয়ালা একগাল হাসলো। হ্যাঁ। তারপর বললো, ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারি না। নানা ঝামেলা। ভালো খদ্দের পেলে ভাবছি বিক্রি করে দেবো।

মার্থা তাকালো শওকতের দিকে।

শওকত বললো, চলো।

বাড়িওয়ালা বললো, তাহলে বাড়ি আপনারা ভাড়া নিচ্ছেন। পাকা কথা, কী বলেন?

মার্থা বললো, দোকানটা সত্যিসত্যি বিক্রি করবেন নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িওয়ালা একটু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললো, হ্যাঁ।

মার্থা বললো, কত দিয়ে বেচবেন?

শওকত ঠিক বুঝতে পারলো না কি চায় মার্থা।

বাড়িওয়ালা বললো, তা, হাজার তিনেক তো বটে।

টাকার অঙ্কটা মনে-মনে একবার উচ্চারণ করলো মার্থা।

ঠোঁট নাড়লো। কোনো শব্দ বেরুলো না।

শওকত বললো, চলি।

মার্থা বললো, কাল আবার আসবো।

বাড়িওয়ালা একগাল হেসে বিদায় দিলো ওদের।

আশ্চর্য! কী লাগামহীন স্বপ্ন দেখতে পারে মানুষ। দু-মাসের আগাম ভাড়া দেড়শ' টাকা হাতে নেই। তিনহাজার টাকা দিয়ে দোকান কেনার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে মার্থা।

শওকত বললো, স্রেফ পাগলামো।

মার্থা বললো, হোক পাগলামো। তবু সুন্দর। একবার চিন্তা করে দ্যাখো না। দোকানটা পেলে আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না আমাদের। আমি কাউন্টারে বসে দোকান চালাবো। তুমি বাইরে থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে দেবে। হিসেবটা দেখবে। কী চমৎকার হবে তাই না?

যতসব বাজে চিন্তা। শওকত বিড়বিড় করলো। কিন্তু মার্থার প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না। নিজের মনকে একটু যাচাই করতে গিয়ে দেখলো, মার্থা মন্দা বলেনি। দোকানটা যদি কিনতে পারে ওরা, তাহলে আর অন্যের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটাতে হবে না ওদের। কিন্তু, একসঙ্গে অতগুলো টাকা।

মার্থা বললো, আহ্, টাকার কথাটা তুলে এ সুন্দর স্বপ্নটাকে মাটি করে দিয়ো নাতো। ধরে নাও, টাকাটা আমরা পেলাম। সে যেখান থেকেই পাই। চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক। সে পরে দেখা যাবে'খন। ধরো না, দোকানটা আমরা কিনেছি। তুমি-আমি পেছনের ঘর দুটোতে থাকি। আর সারারাত বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি, কেমন করে কেমন করে দোকানটা আরো সাজাবো, আরো বড়ো করে তুলবো। ওকে আমাদের কোলের ছেলের মতো, বলতে গিয়ে সহসা হেসে উঠলো মার্থা। হাসির গমকে সমস্ত দেহটা দুলে উঠলো ওর। চোখের কোণে জেগে উঠলো একজোড়া তরল মুক্তো।

শওকত অবাক হয়ে বললো, হঠাৎ কান্না।

মার্থা ওর কথার মাঝখানে বললো, কুটো পড়েছে। তারপর দু-হাতের তালু দিয়ে চোখজোড়া ভীষণভাবে রগড়াতে লাগলো সে। রুমালে ফুঁ দিয়ে দু-চোখে গরম তাপ দিলো।

শওকত বললো, অযথা চোখ দুটো লাল করছো কেন?

মার্থা মৃদু হেসে রুমালটা সরিয়ে নিলো। সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললো, দোকানটা কিন্তু কিনতেই হবে কী বলো?

কেনার মতো টাকা নেই আমাদের। সংক্ষেপে জবাব দিলো শওকত।

মার্থা আগের মতো হেসে বললো, দুনিয়াতে কেউ টাকা নিয়ে জন্মে না।

শওকত প্রতিবাদের স্বরে বললো, জন্মে কী! বড়লোকের ঘরের ছেলেমেয়েরা।

আর যাদের বাপ-মা বড়লোক ছিলো না। তারা? মার্থার দৃষ্টি শওকতের মুখের দিকে।

ওরা নিজেরা খেটে রোজগার করে।

কি দিয়ে?

বিদ্যা বুদ্ধি আর শ্রম দিয়ে।

আমরাও তাই করবো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো মার্থা। ওর চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি। যেন এ-মুহূর্তে তিনহাজার টাকা হাতের মুঠোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে পেয়ে গেছে সে। হাতজোড়া বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। জুতোর গোড়ালি-জোড়া-জোরে জোরে মাটিতে ঠুকলো। কী যেন ভাবলো। তিন হাজার টাকা। মাত্র তিনটে হাজার টাকা রোজগার করতে পারবো না আমরা? ঘুরে দাঁড়িয়ে শওকতের দিকে এগিয়ে এলো মার্থা।

আজ সকালে যারা দেড়শ' টাকার চিন্তা করতে গিয়ে বিব্রতবোধ করছিলো, এখন-তারা তিনহাজার টাকা সমস্যার কথা ভেবে মনে-মনে হয়রান হচ্ছে।

মার্থা পাগল। কিন্তু শওকত নিজেও জানে না, কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে সে নিজেও সেই পাগলামোর জালে জড়িয়ে পড়েছে।

সে ভাবছে বুড়ো আহমদ হোসেনের কথা।

অন্ধকারে যে একটুকরো আলোর ছটা।

কী হবে যদি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় শওকত। জীবনভর তো আর কোনো কাজ করবে না সে। যতদিন তিনহাজার টাকা যোগাড় না হয় ততদিন। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে মার্থাকে নিয়ে সংসার পাতবে সে।

মার্থা তখনো অনর্গল বকে চলেছে। রাতকানা লোকটা সারাদিন খাটিয়ে মারে। তবু তার কতরকম ধমক শুনতে হয়। জাহান্নামে যাক সে। আর ওখানে কাজ করবো না আমি। নিজের দোকান, নিজের সব।

শওকত সহসা বললো, ঘাবড়িয়ো না মার্থা, টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

কেমন করে? আচমকা থমকে দাঁড়ালো মার্থা। চোখজোড়া বড় করে তাকালো ওর দিকে।

শওকত বললো, আমরা দিনরাত খাটবো।

ওর মসৃণ চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে ম্লান হাসলো মার্থা। খেপেছো। একটু আগের মার্থাকে যেন এখন চেনাই যায় না। উতলা মনের নিচে এত গভীর একটা খাদ লুকোনো ছিলো তা কে জানতো। মার্থা ধীরে ধীরে বললো। ওসব পাগলামো থাক। শোনো, অনেক রাত হয়ে গেছে। যাও এবার ঘুমোও গিয়ে।

শওকত অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো মার্থার দিকে। তারপর বললো, কাল থেকে আমি একটা চাকরিতে জয়েন করছি মার্থা।

তাই নাকি? আগে বলোনি তো। মার্থার চোখেমুখে আনন্দের আভা। শওকত সেটা লক্ষ্য করে বললো, বুড়ো আহমদ হোসেন জোগাড় করে দিয়েছে।

কোথায়?

সেটা এখনো জানি না। কাল রাতে জানবো।

সত্যি বলছো। চোখের মণিজোড়া হাসিতে চিকচিক করছে মার্থার।

শওকত ঢোক গিলে বললো, সত্যি।

একটা পুরানো টিনের কৌটো থেকে অতি যত্ন করে রাখা কতকগুলো নোট বের করে আনলো মার্থা। শওকতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, গুণে দ্যাখো তো কত।

শওকত অবাক হয়ে বললো, এগুলো কোথায় পেয়েছো।

কেউ নিশ্চয়ই দান করেনি, মার্থা শান্তগলায় বললো। এতদিন ধরে চাকরি করছি। দু-চারটা টাকা জমাতে পারিনে বুঝি। মার্থার কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর।

নোটগুলো গুণতে গিয়ে শওকত বললো, দেখে তো পুরানো মনে হয় না। মনে হচ্ছে একেবারে কড়কড়ে নতুন।

মার্থা সঙ্গে সঙ্গে বললো, কী যে বলো। দাও, তোমাকে দিয়ে গোনা হবে না। আমি গুনছি। ওর হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নিয়ে গুনলো মার্থা, পঁচিশ টাকা।

আর পঁচিশ টাকা হলে বাড়ি ভাড়ার আগামটা হয়ে যায়। শওকত বললো।

মার্থা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। না না, আগে দোকান, তারপর বাড়ি ভাড়া নেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত কোনো উত্তর দেবার আগেই মার্থা আবার বললো, তিন হাজার টাকার আর কত বাকি থাকে?

শওকত মনে-মনে হিসেব করে বললো, আটাশশ' পঁচাত্তর টাকা। বলে হেসে উঠলো সে।

নোটগুলো আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে মার্থা বললো, বোসো, আমি হাতমুখ ধুয়েনি।

আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখহাত ধুতে গেলো মার্থা। দুহাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো শওকত। রোজ যাবে যাবে করেও আজ পর্যন্ত বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে যাওয়া হয়ে উঠলো না। অথচ মার্থার কাছে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে সে। বলেছে ও চাকরি করছে। কাজ চলছে ওর।

অফিস কোথায় তোমার? মার্থা প্রশ্ন করেছে। শওকত বিব্রতকণ্ঠে বলেছে। এ চাকরিতে কোনো অফিস নেই। রাস্তায় রাস্তায় কাজ।

কাজটা কী? মার্থা শুধিয়েছে আবার।

শওকত বলেছে–কাজটা, মানে ওটা হচ্ছে তোমার, এক জায়গার জিনিসপত্র আরেক জায়গায় আনা-নেয়া করা। মানে ওই-যে কী বলে ফ্লাইং বিজনেস। ও-রকমরই অনেকটা।

ও। মার্থা থামেনি। আরো প্রশ্ন করেছে। বেতন কত দেবে কিছু ঠিক হয়নি?

না। তবে বলেছে দু-চার দিনের মধ্যে জানাবে।

আগাগোড়া সবটাই মিথ্যা। কেন এ মিথ্যের হাতে নিজেকে এভাবে সমর্পণ করলো ভেবে পায় না শওকত। কোনো প্রয়োজন ছিল না। ও চাকরি করছে না, শুনলে নিশ্চয় ওর ওপর রাগ করতো না মার্থা। তবু আসলে বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে যেতে ভয় হয় শওকতের। একটা অজানা ভয়ে শিরদাঁড়া শিরশির করে ওঠে। ওর মনে হয় ওই আলেয়ার জালে নিজেকে একবার জড়ালে জীবনভর হয়তো আর ছাড়া পাবে না।

মার্থা কাল বলেছিলো। ধরো তুমি যা ভাবিছো তারচে' অনেক বেশি টাকা বেতন পেয়ে গেলে তুমি। তখন কী করবে? না, হাসি নয়। ধরোই না ছাই। কী বাধা আছে চিন্তা করতে। ওরাতো এখনো টাকার অঙ্ক বলেনি। ধরো অনেক টাকা বেতন পেলে তুমি। কী করবে তখন।

খুব কম করে খরচ করবো আর বাকিটা জমাবো।

শুনে মার্থার চোখজোড়া ঝলমল করে উঠেছে। জানো, আমিও তাই ভাবছিলাম।

এ কদিন শওকত কম ভাবেনি। নানারকম উদ্ভট চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে। যদি এমন হতো হয়তো কোনো বড়লোক আত্মীয় মারা গেছে। আর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছে তাকে। না। হিসেব করে দেখা গেলো তেমন কোনো আত্মীয়-অস্তিত্ব কল্পনায় ছাড়া বাস্তবে নেই। এমন তো হতে পারতো যে হঠাৎ একটা লটারী জিতে গেছে শওকত। না। সে সম্ভবনাও আপাতত নেই। মাত্র তিন হাজার টাকা। দুনিয়াতে এত টাকা অথচ পাবার কোনো উপায় নেই।

না, কথাটা সত্য নয়। বুড়ো আহমদ বলেছিলো, তোমরা হলে সব এক-একটা উল্লুক। নইলে টাকা রোজগারের জন্যে চিন্তে করতে হয়। টাকা তো সব কাদার নিচে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাদা ঘাঁটো। টাকা পাবে। কাদায়ও হাত দিবে না, টাকাও রোজগার করবে, সে তো চলবে না বাছা।

না, এবার কাদায় নামবে শওকত। প্রয়োজন হলে সবটুকু নর্দমাই হাতড়ে বেড়াবে সে। তিনহাজার টাকা। তারপর।

মার্থা ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে এসে বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। চেহারায় একটু পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে নিয়ে মার্থা বললো, চলো।

চারপাশের দিকে আজকাল আর নজর পড়ে না শওকতের। কেউ জুয়ার 'আড্ডায় বসেছে কি বসেনি, কেউ গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে কি করছে না, সেদিকে তাকায় না শওকত। ওসব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে তার কাছে। হারুনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারার দিন কেমন করে কাটছে। সেই মাতাল কেরানিটা এখনও কি রোজ রাতে তার বউকে মারছে। সে সবের খোঁজ নেয় না সে। যতক্ষণ কিছু ভাবে, ভাবে তিনহাজার টাকার কথা। যতক্ষণ কথা বলে, বলে মার্থার সঙ্গে। পৃথিবী যেন হঠাৎ অনেক ছোট হয়ে গেছে। চিন্তার ধারাগুলো আর বিক্ষিপ্ত নয়, যেন একটা বিন্দুর চারপাশে সারাক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে মরছে। একটা ঘর। একটা দোকান। একটা সংসার। আর তার জন্যে মাত্র তিনহাজার টাকা।

হাতে একটা থলে নিয়ে বেরিয়ে এলো মার্থা।

শওকত বললো, ওটা দিয়ে কি হবে।

মার্থা বললো, কাজ আছে। শোন, আজ রাতে ফিরতে দেরী হবে আমার।

কেন? শওকত অবাক হয়ে তাকালো।

মার্থা ইতস্তত করে বললো, রাতকানা লোকটা বলেছে দোকান বন্ধ হবার পর কিছু হিসেবপত্র করতে হবে। তাই। শওকত চুপ করে রইলো। কিছু বললো না।

মার্থা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হেসে বললো, তুমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসতে চেষ্টা করবো।

শওকত বললো, আমারো অবশ্য আজ একটু রাত হবে। ওরা বলছিলো রাতেও কাজ করতে।

রাতে কেন?

তাহলে বাড়তি কিছু টাকা দেবে। টাকার কথা শুনে মার্থা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। শুধু একবার হাতের থলেটার দিকে তাকালো।

পর পর কয়েকদিন বুড়ো আহমদ হোসেনের আখড়ার কাছে এসে ফিরে গেলো শওকত। সারাপথ মনটাকে ধরে রাখলেও বুড়ো আহমদ হোসেনের নজরের সীমানার আসার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে উঠে ওর।

মার্থা বলে। তোমার কী হয়েছে বলো তো। দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন।

শওকত সংক্ষেপে উত্তর করে। কাজের চাপে।

মার্থা মমতার স্বরে বলে। থাক, ও কাজে দরকার নেই। ওটা ছেড়ে দাও। কাজ করে শেষে মরবে নাকি?

শওকত ম্লান হাসে। মার্থা যদি জানতো!

অথচ মার্থা নিজেও খাটছে দিনরাত। আজকাল বাসায় ফিরতে ওরও অনেক রাত হয়ে যায়। তখন বড় ক্লান্ত দেখায় ওকে।

শওকত প্রশ্ন করে। কী ব্যাপার। তুমিও কি কোনো বাড়তি কাজ নিয়েছো নাকি?

না অমন কিছু নয়। মার্থা মৃদু হেসে বলে। রাতকানা লোকটার হিসেব দেখে দিই। সে জন্যে আলাদা করে মাসে মাসে কিছু টাকা দেবে বলেছে। শোনো, হঠাৎ প্রসঙ্গটা পালটে দেয় মার্থা। এক ভদ্রলোক বলেছিলো, ধারে কিছু টাকা জোগাড় করে দেবে। নেবো?

ভদ্রলোকটি কে?

তুমি চিনবে না। মার্থা হেসে বলেছে। অবশ্য বলছিলো, মাসে মাসে সুদ দিতে হবে।

থাক। সুদে টাকা ধার নেবার দরকার নেই। শওকত বিমর্ষ গলায় বলেছে। শেষে সুদের টাকা জোগাতে গিয়ে মরবে।

ঠিক আছে নেবো না। মার্থা আবার প্রসঙ্গটা পালটে দিয়ে বলেছে। জানো, কাল রাতে দোকানটা আবার গিয়ে দেখে আসছি আমি। বাড়িওয়ালা বলছিলো, ভালো করে চালাতে পারলে মাসে দেড়'শ দু'শ টাকা আসে।

শওকত কোনো উত্তর দেয়নি সে কথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তখন ভাবছিলো অন্য কথা। মাস যখন শেষ হয়ে যাবে আর মার্থা যখন বলবে, কই, কত টাকা পেলে। তখন ওকে কি জবাব দেবে শওকত।

না। আজ বুড়ো আহমদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে তারপর বাড়ি ফিরবে সে।

চটের ঘেরা দেয়া টিনের রেস্তোরাঁটায় ঢোকার মুখে একটা নেড়ি কুত্তা বসে কান চুলকোচ্ছে তার। কয়লার চুলোয় কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বাইরে থেকে বুড়ো আহমদ হোসেনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো শওকত। বুড়ো আসর জমিয়ে বসেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে আর হাসছে সে।

শওকতকে দেখে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। চোখ জোড়া পিটপিট করে তাকালো ওর দিকে। দাড়ির অরণ্যে হাত বুলিয়ে নিয়ে কাউন্টারে দাঁড়ানো ছোকড়াটাকে ডেকে বললো গেলাশটা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে সাহেবকে এক কাপ চা দে। ওর গলার স্বরে বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা।

শওকত যেন হোঁচট খেলো।

বুড়ো বললো, এতদিন পর হঠাৎ কি মনে করে।

শওকত সংক্ষেপে বললো, এমনি। বলে বসলো সে।

বুড়ো তখনো ওর দিকে তাকিয়ে। কিছু বলবে?

হুঁ।

কী।

আমি বিয়ে করছি।

বিয়ে? বুড়ো আহমদ হোসেন প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। ওর হাসির চমকে দোরগোড়ায় বসে থাকা নেড়ি কুত্তাটা ঘেউ ঘেউ করলো। ছোকড়ার হাতের গ্লাস থেকে কিছু চা ঢলকে পড়ে গেলো মাটিতে। বিয়ে করছো কাকে, সে মেয়েটা কে, যার ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিলে? ফোকলা দাঁতের ফাঁকে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিলো সে।

বেয়ারা এসে চায়ের গ্লাসটা সামনে নামিয়ে রাখলো। গ্লাসটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ো বললো, নাও, চা খাও। যাবার সময় অবশ্য পয়সাটা দিয়ে যেও। যাকগে, বিয়ে করছো ভালো কথা কিন্তু সে কথা আমাকে শোনাতে এসেছো কেন?

শওকত বললো, তোমাকে শোনাতে আসিনি। এসেছি এমনি। ঘুরতে ঘুরতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাই বললাম।

না। জমলো না। আসল কথাটা মুখ ফুটে বুড়োকে বলতে পারলো না শওকত। আরো অনেকক্ষণ বসে থেকে আরো আজে বাজে কথা বকে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোতে একটা দু'টো করে বাতি জ্বলে উঠছে। সহসা নিজেকে কেমন যেন হাল্কা বোধ করলো শওকত। ভালোই হলো। বুড়ো আহমদ হোসেনকে কথাটি বললে হয়তো এখনি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হতো। একটা অজানা অচেনা অন্ধকার পথ। যার কিছুই জানে না সে। হয়তো একদিন ধীরে ধীরে সে পথের মোড়ে তিল তিল করে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো শওকত। ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেও পথ খুঁজে পেতো না। গুমরে মরতো। তারচেয়ে এই ভালো হলো।

শওকত ভাবলো একবার বাসায় ফিরে যাবে। কিন্তু মার্থার বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হবে। রাত বারোটার আগে ফিরবে না সে। অত রাত পর্যন্ত কি করে মেয়েটা। বলছিল রাতকানা লোকটার সঙ্গে হিসেবের খাতা নিয়ে বসে। রোজ রোজ কিসের হিসেব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে গিয়ে রাস্তার মোড়ে থমকে দাঁড়ালো শওকত। একটা সন্দেহের রাক্ষস ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে ওকে। না না, মার্থা ও ধরনের মেয়ে নয়। ওকে নিয়ে অকারণে শঙ্কিত হচ্ছে শওকত। মিছেমিছি ওর সম্পর্কে এতসব আজে বাজে চিন্তা করছে সে।

শওকত আবার হাঁটতে শুরু করলো। কতক্ষণ এভাবে পথে পথে ঘুরলো মনে নেই। ইতিউতি অনেক কিছু ভাবলো সে। তারপর যখন পথে পা বাড়ালো তখন রাস্তা-ঘাটগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। গলির লোকজন অন্য দিন এতক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে। কিন্তু আজ সেখানে কিছু প্রাণের সাড়া পেলো শওকত। কুষ্ঠ রোগীটা যেখানে বসে থাকে সে রকের ওপর অনেকগুলো লোকের ভিড়। শওকত অবাক হলো। বাসার সামনে একটা জীপ দাঁড়িয়ে। আশেপাশে কয়েকজন খাকি পোষাক পরা পুলিশের লোক। সবার চোখ বাড়ির ভেতরে। শওকতের পায়ের গতি শ্লথ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে জটলার এক কোণে এসে দাঁড়ালো সে। না। কুষ্ঠ রোগীটার কিছু হয়নি। গলিত মাংসের পিণ্ডটা একপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে আর পিটপিট করে তাকাচ্ছে সবার দিকে।

বাড়ির সামনে। করিডোরে। উঠোনে লোকের ভিড়। ছেলে বুড়ো মেয়ে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সবাই। খলখল করে কথা বলছে। হাসছে দুঃখ করছে। ওদের কথা শুনে শরীরের রক্তটা ধীরে ধীরে হিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো ওর।

শওকত অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো। মার্থা।

উঠোনে অনেকগুলো পরিচিত মুখ সন্দেহকাতর চোখে বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ওর দিকে। শওকতের মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো। মার্থা। একি করলো মার্থা।

রাতকানা লোকটার দোকান থেকে ওষুধ চুরি করে নিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে মার্থা। ওকে থানায় আটকে রেখে বাসা সার্চ করতে এসেছে পুলিশ। ঘরের মধ্যেও অনেকগুলো চোরাই ওষুধ পাওয়া গেছে। চৌকির নিচে একটা বাক্সের মধ্যে লুকোনো ছিলো। আর পাওয়া গেছে একটা টিনের কৌটার মধ্যে রাখা নগদ সাত'শ টাকা। টাকা আর ওষুধ সব সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পুলিশের লোকেরা। উঠোনের মাঝখানে ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে রইলো শওকত। চিন্তার সুতোগুলো যেন একটা একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবতে পারছে না সে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। চারপাশের অনেকগুলো সন্দেহকাতর দৃষ্টি খুঁটে খুঁটে দেখছে ওকে। হাসছে। কথা বলছে। বিদ্রূপের ধ্বনি জন্ম দিচ্ছে। নাচের মেয়ে সেলিনা। সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে চেপে রাখা উদ্ধত যৌবন তার দিকে চেয়ে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। শওকতের মনে হলো ওদের দৃষ্টির নিচে যেন সমস্ত শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে ওর। আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো চিৎকার করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। মার্থা। মার্থা এটা কি করলো।

পরদিন দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার আকাশের দিকে তাকালো শওকত। ওর চোখ সোজা সূর্যের ওপরে গিয়ে পড়লো। সূর্যটি আগুনের মতো জ্বলছে। আর তার লকলকে শিখার উত্তাপে চারপাশের বাড়ির দেয়ালের ইটগুলো গরম হয়ে গেছে। গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছে বাড়ির গিন্নীরা। মেঝেটা পানি দিয়ে বারবার ধুয়ে মুছে নিচ্ছে কিন্তু গুমোট গরমের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে বাতাস নেই।

মাঝে মাঝে হয়তো একটুখানি বইছে। কিন্তু সে হাওয়া গায়ে এসে লাগতে সহসা শিউরে উঠলো শওকত। মনে হলো কে যেন এক কড়াই গরম তেল ঢেলে দিলো ওর দেহের ওপর। রাস্তার পিচগুলো সূর্যের তাপে গলে গলে সরে যাচ্ছে নর্দমার দিকে। মানুষের পা, মোটর গাড়ির চাকা আর গরুর খুরের সঙ্গে উত্তপ্ত আলকাতরাগুলো উঠে গিয়ে সমস্ত রাস্তা জুড়ে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। রাস্তার পাশে বস্তির একদল ছেলে হল্লা করে মার্বেল খেলছে। অর্ধ উলঙ্গ দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে ওদের। দূরে একটা বাড়ির কার্নিশের কোণে বসে একা একটা কাক গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

গাছের ডালপালাগুলো একটুও নড়ছে না।

মানুষ গরু সবাই ছায়া খুঁজছে।

শওকতের মনে হলো পুরো শহরটায় যেন আগুন লেগেছে। দালান-বাড়িঘরগুলো সকলকে আগুনের শিখার নিচে দাউ দাউ করে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে।

কে জানে মার্থা এখন কোথায়। হয়তো হাজতে কিম্বা কোর্টে। ওর জামিন নেওয়ার জন্যে নিশ্চয় কেউ যাবে না। হয়তো মনে মনে শওকতের কথা ভাবছে মার্থা। ভাবছে সে যাবে। না। শওকত কি করবে কিছু ভাবতে পারছে না।

সে শুধু পথ হাঁটছে। উদ্দেশ্যবিহীন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

তারপর ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে গেলো। গাছের পাতাগুলো একটা দুটো করে নড়তে শুরু করলো। আকাশের কোণে কয়েক টুকরো মেঘ উঁকি দিলো।

রাস্তায় মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। বাড়ির আলিসায় ঝোলানো কাপড়গুলো একটু একটু দুলছে। অনেক দূরের আকাশে অনেকগুলো চিল বাতাসে ডানা মেলে একবার উপরে উঠছে আর নিচে নামছে আর মাঝে মাঝে চিঁ চিঁ শব্দে কাকে যেন ডাকছে।

তখনো পথে পথে হাঁটলো শওকত।

রাস্তায় কয়েকটা বাতাসের কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়ে ধুলো উড়লো। শুকনো পাতা ডাল থেকে ঝরে ছুটে গেলো। এ পথের মোড় থেকে অন্য পথের মোড়ে। জানালা-দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আলিসায় ঝোলানো শাড়িটা পতপত করে উড়ছে। প্রচণ্ড বাতাসের দাপটে পুরো শহরটা যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে এখন। রাস্তার লোকজন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে।

প্রথমে বড় বড় ফোঁটা তারপর বেগে নেমে এলো বৃষ্টি। সামনের বড় রাস্তায় পেছনের ছোট গলিতে। বাড়ির ছাদে। কার্নিশে। বৃষ্টি নেমেছে। সারা গায়ে বৃষ্টি মেখে ঘরে এসে ঢুকলো শওকত। সমস্ত বাড়িতে কোন মানুষের সাড়াশব্দ নেই। রাতনামার সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল এঁটে দিয়েছে ওরা। বৃষ্টির ছাট এসে বারান্দায় পানি জমে গেছে। বাড়ির উঠোনের মধ্যে ঢুকে অনন্ত বাতাস অজগরের মতো ফুঁসছে।

ঘরে ঢুকে ভেজা জামাটা খুলতে যাবে এমন সময় শওকত শুনলো মাতাল কেরানির বউটা কাঁদছে। মাতালটা চিৎকার করছে আর মারছে ওকে। বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো একটা। জানালার পাশে সরে এলো শওকত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বন্ধ দরজাটার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণ বিলাপের স্বরে কাঁদছে বউটা। মাতাল কেরানি এখনো মারছে ওকে। বিদ্যুতের চমক এসে শওকতের চোখে লাগলো। সহসা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। দৌড়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড লাথি মারলো ভেজানো দরজাটার ওপর। খিল ভেঙ্গে দরজাটা খুলে গেলো।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। আর সেই বিদ্যুতের আলোয় শওকত দেখলো পাশে টেবিলের ওপরে রাখা একটা দা। আর দেখলো মাতাল কেরানি আর তার বউটা একজোড়া শবের মতো দরজার দিকে তাকিয়ে।

শওকতের মাথায় খুন চেপে গেলো। হঠাৎ দাওটা হাতে তুলে নিয়ে মাতালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে। তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় ওর মাথায় আঘাত করতে লাগলো। এ যেন তার আজীবন সঞ্চয় করা আক্রোশ। যেন সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। ভালো মন্দ পাপ পুণ্য ভুলে গেছে সব। বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকালো। একটা তীব্র আর্তনাদ করে মাতাল স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়লো তার বউ।

মুহূর্তে যেন জ্ঞান ফিরে পেলো শওকত। হাতের দা'টা রক্তে চপচপ করছে। মানুষের মগজ ইস্পাতের গা বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। হাতের দা'টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে ও। রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সরু বারান্দাটা পেরিয়ে নিজের ঘরের সামনে আসতে চমকে উঠলো শওকত।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেলিনা। নাচের মেয়ে সেলিনা। কাঁচা হলুদের মতো যার গায়ের রঙ। তামাটে চোখ। গাঢ় বাদামি অধর। শওকতের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। বাইরে তখনো বাজ পড়ছে। ঝড় হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পানির ছাট এসে ভিজে গেছে বারান্দাটা।

হঠাৎ সেলিনার একখানা হাত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে টানতে টানতে ওকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলো শওকত। সিঁড়ি বেয়ে নিচে করিডোরে। করিডোর পেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে আরেকটা করিডোর। তারপর রাস্তা। মেয়েটা একটুও বাধা দিলো না। একটা প্রশ্ন করলো না কোথায় নিয়ে যাচ্ছো।

রকের ওপরে বসে থাকা কুষ্ঠ রোগীটা বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এক কোণে সরে বসে যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একবার তার দিকে ফিরে তাকালো শওকত। তারপর সেলিনার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে সেই অন্ধকার রাতে, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সামনে ছুটতে লাগলো শওকত। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ইটের টুকরোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে অস্ফুট কাতরোক্তি করে মাটিতে ছিটকে পড়লো সেলিনা। দু'হাতে ওকে আবার তুলে নিলো শওকত। তারপর, এই ঝড়, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার আর এই শহরকে দু'হাতে ঠেলতে ঠেলতে আবার ছুটতে লাগলো ওরা। বৃষ্টির আলিঙ্গনে সারাদেহ ভিজে চুপসে গেছে ওদের। এ বৃষ্টি যেন মার্থার চোখের জল। অন্ধকার হাজতে বসে হয়তো তখন নীরবে কাঁদছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর।

তারপর একটা সুন্দর সকাল।

বুড়ো রাত বিদায় নেবার আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তার শেষ চিহ্নটুকু এখানে সেখানে এখনো ছড়ানো। চিকন ঘাসের ডগায় দু'একটা পানির ফোঁটা সুর্যের সোনালি আভায় চিকচিক করছে।

শওকতের বুকে মুখ রেখে; খড়ের কোলে দেহটা এলিয়ে দিয়ে; সেলিনা ঘুমাচ্ছে। ওর মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ঠোঁটের শেষ সীমানায় শুধু একটুখানি হাসি চিবুকের কাছে এসে হারিয়ে গেছে। ওর হাত শওকতের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখা। দু'জনের ঘুমোচ্ছে ওরা।

শওকতের মুখে দীর্ঘ পথ-চলার ক্লান্তি। মনে হয় অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছিলো ওরা। চুলের প্রান্তে এখনো তার কিছু রেশ জড়ানো রয়েছে। সহসা, গাছের ডালের বুনো পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেলো। মটরশুটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেলো কাছের অরণ্যের দিকে। খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐক্যতান।

আঠারো জোড়া আইনের পা ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে এসে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের। ওরা তখনো ঘুমোচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি মৃত্যু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলিটা অনেক দূর সরল রেখার মতো এসে হঠাৎ যেখানে মোড় নিয়েছে ঠিক সেখানে আহমদ আলী শেখের বসতবাড়ি।

বাড়িটা এককালে কোন এক বিত্তবান হিন্দুর সম্পত্তি ছিলো। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের চব্বিশ পরগণার ভিটেবাড়ি, জমিজমা, পুকুর সব কিছুর বিনিময়ে এ দালানটার মালিকানা পেয়েছেন। মূল্যায়নের দিক থেকে হয়তো এতে তাঁর বেশ কিছু লোকসান হয়েছে, তবু অজানা দেশে এসে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পাওয়া গেলো সে কথা ভেবে আল্লাহর দরগায় হাজার শোকর জানিয়েছেন আহমদ আলী শেখ।

সেটা ছিলো উনিশশো সাতচল্লিশের কথা।

এটা উনিশশো আটষট্টি।

মাঝখানে একুশটা বছর পেরিয়ে গেছে।

সেদিনের প্রৌঢ় আহমদ আলী শেখ এখন বৃদ্ধ। বয়স তাঁর ষাটের কোঠায়।

বড়ছেলে সাঁইত্রিশে পড়লো।

মেজু'র চৌত্রিশ চলছে।

সেজু আটাশ।

ছোট ছেলের বয়স একুশ হলো।

বড় তিন ছেলের ভালো ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছেন তিনি। বউরা সব পরস্পর মিলেমিশে থাকে। একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে না, বিবাদ করে না। তাই দেখে আর অনুভব করে কর্তা-গিন্নীর আনন্দের সীমা থাকে না। মনে মনে তাঁরা আল্লাকে ডাকেন। আর বলেন। তোমার দয়ার শেষ নেই। আহমদ আলী শেখের নাতি নাতনীর সংখ্যাও এখন অনেক। বড়র ঘরে পাঁচজন।

মেজোর দুই ছেলেমেয়ে।

সেজ পরে বিয়ে করলেও তার ঘরে আট মাসের খুকিকে নিয়ে এবার তিনজন হলো।

মাঝে মাঝে ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি নাতনীদের সবাইকে এক ঘরে ডেকে এনে বসান আহমদ আলী শেখ।

তারপর, চেয়ে চেয়ে তাদের দেখেন। একজন চাষী যেমন করে তার ফসলভরা খেতের দিকে চেয়ে থাকে তেমনি সবার দিকে তাকিয়ে দেখেন আহমদ আলী শেখ। আর মনে মনে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। ইয়া আল্লাহ, ওদের তুমি ঈমান আমানের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখো।

এখন রাত।

আহমদ আলী শেখ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রোজকার অভ্যেস মতো খবরের কাগজ পড়েন।

রাজনৈতিক খবরাখবরে তাঁর কোন উৎসাহ নেই। দল গড়ছে। দল ভাঙছে। দফার পর দফা সৃষ্টি করছে। আর বক্তৃতা দিচ্ছে। ভিয়েতনামে ত্রিশ জন মরলো। রোজ মরছে। তবু শেষ হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব খানের ভাষণ। আর কাশ্মির। কাশ্মির। পড়তে পড়তে মুখ ব্যথা করে উঠে।

আহমদ আলী শেখ মামলা মকদ্দমার খবরগুলো খুব মনযোগ দিয়ে পড়েন। আর পড়েন পাটের বাজারে উঠতি পড়তির খবরাখবরগুলো কিংবা নতুন করে কোন দালান, কোঠা, ব্রিজ, কারখানা তৈরির খবর থাকলে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

পড়েন। কারণ, তাঁর বড় ছেলে উকিল।

সে ছেলে পাটের কারবাড়ি।

আর মেজ ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।

আহমদ আলী শেখ খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছেন। অদূরে তাঁর তিন নাতি বসে পরীক্ষার পাঠ মুখস্ত করছে।

তাদের মধ্যে একজনের চোখ ঘুমে ঢুলঢুল। আরেকজন কি যেন লিখছে। অন্যজন চিৎকার করে পড়ছে।

আল্লাহ তায়ালা বাবা আদম ও মা হাওয়াকে তৈরি করিলেন এবং ফেরেস্তাদের ডাকিয়া বলিলেন: হে ফেরেস্তাগণ, তোমরা ইহাকে সেজদা কর। সকল ফেরেস্তা তখন নতজানু হইয়া বাবা আদম ও মা হাওয়াকে সেজদা করিল। করিল না শুধু একজন। তাহার নাম ইবলিশ। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, হে ফেরেস্তা–শ্রেষ্ঠ ইবলিশ। আমি তামাম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ইনসানকে পয়দা করিয়াছি। ইহাদের সেজদা কর। ইবলিশ তবু রাজি হইল না।

বাচ্চাটা চিৎকার করে পরীক্ষার পড়া পড়ছে।

গিন্নী, জোহরা খাতুন জায়নামাজে বসে তছবি গুনছেন।

আহমদ আলী শেখের চোখজোড়া তখনো খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ। এমনি সময় ঘরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

কাগজ থেকে মুখ তুললেন বুড়ো কর্তা। কে?

যে ছেলেটা এতক্ষণ পড়ছিলো, সে পড়া থামিয়ে বাইরের ঘরের দিকে তাকালো।

উঠে এসে বৈঠকখানায় বাতিটা জ্বাললেন আহমদ আলী শেখ। দরোজা খুললেন।

খুলে সামনে যাকে দেখলেন তাকে এ মুহূর্তে এখানে আশা করেন নি তিনি।

একমাত্র মেয়ে আমেনা।

কিরে তুই? কোন খবর নেই, কিছু নেই। হঠাৎ।

আমেনা বাবাকে সালাম করতে করতে বললো, কেন? ও টেলিগ্রাম করেছিলো পাওনি?

কই নাতো? বুড়ো কর্তা অবাক হলেন। জামাই আসেনি?

না।

তুই একা এসেছিস?

না। সঙ্গে মফিজ মামা আর মামীও এসেছেন।

ওঁরা কোথায়? কথাটা বলবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন দু'জন। মফিজ মামা আর তার স্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো কর্তা তাদের দেখে চিৎকার করে উঠলেন, আরে তোমরা। এসো, এসো, ভেতরে এসো। ইয়া আল্লাহ, আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো। আঁ। সেই বারো তেরো বছর পর দেখা হলো, তাই না?

মফিজ মামা হাসলেন। হ্যাঁ বারো তেরো বছর হবে। এই, দেখো না, মানুষ চোখের সামনে না থাকলে মন থেকেও দূর হয়ে যায়। সেই কবে থেকে করাচিতে পড়ে আছি। তোমরা একটু খোঁজ খবরও নাও না।

কথাবলার ফাঁকে তাদেরকে ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন আহমদ আলী শেখ। আবদুল। আবদুল। উল্লুকটা গেলো কোথায়। শোন, আমেনার মালপত্রগুলো সব ভেতরে এনে রাখ। তারপর, তোমার চুলগুলো সব পেকে একেবারে সাদায় হয়ে গেছে দেখছি আ? পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? ভালো, ভালো কইরে, আহসান মকবুল এরা সব গেলো কোথায়। এদিকে আয় তোদের মফিজ মামা এসেছে। একে চিনতে পারছো? এ হচ্ছে মেজ ছেলে। মানে আহসান। ইঞ্জিনিয়ার। আরে? তোকে অসুস্থ শরীরে এখানে আসতে বললো কে? একে তুমি ঠিক চিনতে পারবে না হে। তখন সে একেবারে বাচ্চা ছিলো। সবার ছোট ছেলে শামছু। পেটের অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্যখানা কি করেছে দেখো না। যাও যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে থাকগে। তারপর তোমার খবর টবর কি বলো। উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মফিজ মামা। দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। মনসুর না?

বাড়ির বড় ছেলে মনসুর ওকালতির বইপত্র বগলে বাইরে থেকে ফিরছিলো।

বুড়ো কর্তা একগাল হেসে বললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনসুর। এ এখন শহরের জাঁদরেল উকিল। চিনতে পারছো না? ইনি তোমার মফিজ মামা। সালাম করো, সালাম করো। জানো, ওর এখন ভীষণ নামডাক। মনসুর উকিল বললে সারা শহরের লোকে তাকে চেনে।

সকাল বেলা তো মক্কেলের ভিড়ে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে পড়ে। হঠাৎ কি মনে হতে বুড়ো চিৎকার করে উঠলেন। আবদুল, আবদুল। ডেকে ডেকে উল্লুকটার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না।

আবদুল বাড়ির বয়স্ক চাকর। হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে এলো সে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

জী। বউডার অসুখ।

বউটার অসুখ তো তুই ওখানে বসে বসে করছিস কি। উজবুক কোথাকার। রোজ এক কথা কবার করে বলবো। দেখছিস না সাহেব বাইরে থেকে ফিরেছে। বইপত্রগুলো নিয়ে আলমারিতে রাখ। হাত মুখ ধোয়ার পানি দে। আর হ্যাঁ, তুমি বসো। আমি এই ফাঁকে চট করে নামাজটা সেরেনি।

পাশের ঘরে গিন্নী জোহরা খাতুন তখন মফিজ সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছেলের বউদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

এ হলো বড় বউ। এ মেজো। আর এ হচ্ছে সেজো। ইনি তোমাদের মামী। করাচিতে ছিলেন তাই এতদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামী চিবুক ধরে বউদের আদর করলেন। আপনাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছে বুবু। দেশের সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলোকে বাছাই করে এনে ঘরের বউ বানিয়েছেন।

তিন বউ লজ্জায় রাঙা হলো।

ননদিনী আমেনা সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো।

গর্বিতা শাশুড়ি জোহরা খাতুন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, সব আল্লাহর মেহেরবানী।

হ্যাঁ, তাই। নইলে এমন সুন্দর আর সৎস্বভাবের তিন তিনটি বউ ক'জন শাশুড়ির ভাগ্যে জোটে।

জানো ভাবী, আর পাঁচটা শাশুড়ির মতো আমি বউদের সঙ্গে সারাক্ষণ খিটিমিটি করি না। ওরা যেমন আমাকে মান্যিগণ্যি করে আমিও তেমনি ওদের আদরে সোহাগে রাখি। ওই তো পাশের বাড়ির টোগর মা, কি মাটি দিয়ে আল্লাহ তাকে পয়দা করেছিলো, বুঝলে ভাবী, বাচ্চা বউটাকে দু'বেলা পেট ভরে খেতেও দেয় না। আর সারাদিন যখনই যাও দেখবে বউটাকে চাকরানীর মতো খাটাচ্ছে। ছি ছি ছি এমন স্বভাব যেন আমার শত্রুরও না হয়। তবে হ্যাঁ। বউদের আমি যে একেবারে শাসন করি না, তা নয়। শাসন করি। মেয়েদের জোরে জোরে কথা বলা উনি মোটেই পছন্দ করেন না। উনি বলেন, মেয়েরা এমনভাবে কথা বলবে বাড়িতে কাকপক্ষী আছে কি নাই বোঝা যাবে না। রাস্তার লোকে বাড়ির বউঝিদের গলার আওয়াজ শুনবে কেন? ওরা প্রথম প্রথম অবশ্য সব সময় না মাঝে মধ্যে, একটু হৈ-চৈ করতো। আমি নিষেধ করে দেয়ার পর থেকে কেউ এসে বলুক দেখি আমার কোন বউয়ের গলার আওয়াজ কেমন? তিন বউ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো। জোহরা খাতুন বললেন, একি, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আমেনার ঘরটা ঝেড়ে মুছে ঠিক করে দাও। আমার আলমারিতে ধোয়া চাদর আছে একটা বের করে দিও। আর শোন, মশারীর কি হবে। এক কাজ করো, আমার মশারীটাই না হয় ওকে টাঙ্গিয়ে দাও। আমাকে মশায় খায় না। তিনজন একদিকে চললে কেন। একজন রান্নাঘরে যাও। আবদুলের বউটার অসুখ। কাজকর্ম সব পড়ে আছে। একটু পরে আমার বাচ্চা-কাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়বে। ওদের সময়মত খাইয়ে দিও। এসো ভাবী, তুমি তো আর এ বাড়িতে কোনদিন আসনি, চলো সবার ঘরদোর দেখবে।

একে একে মামীকে সবার ঘরে নিয়ে গেলেন জোহারা খাতুন।

সব ঘর দেখালেন।

আসবাবপত্র।

চেয়ার টেবিল।

বাক্স দেরাজ।

এগুলো সব ছেলেরা নিজেদের রোজগার থেকে কিনেছে। উনি তো বেশ ক'বছর হলো পেনসন নিয়েছেন। তারপর থেকে ঘর সংসারের যাবতীয় খরচ ছেলেরাই চালাচ্ছে। আল্লা ওদের রুজি-রোজগারে আরো বরকত দিক। কথা হলো কি ভাবী, ছেলেপিলেদের বাপ মা এত কষ্ট করে মানুষ করে কেন। বুড়ো বয়সে একটু আরামে থাকবে সে জন্যে তো, আল্লায় দিলে সে আরাম আমরা পেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোহরা খাতুনের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

মেয়ে আমেনাকে কোলের কাছে টেনে এনে বসালেন তিনি। তার গায়ে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে শুধালেন। জামাই কেমন আছে?

ভালো।

তোমাকে একা পাঠালো। সঙ্গে এলো না কেন?

কেমন করে আসবে। ছুটি পেলে তো? বড় সাহেব ছুটি দিতে চায় না। ও না থাকলে অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় কিনা তাই। সেই কবে থেকে আসার জন্যে ছটফট করছি। একা আসবো, সাহস হয় না। শেষে মফিজ মামারা আসছেন শুনে বললাম, আমি ওদের সঙ্গে চলে যাই, তুমি ছুটি পেলে পরে এসো।

জামাই কি বললো?

বলবে আবার কি। চলে আসবো শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেলো। জানো মা, ও না আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও কোথাও থাকতে পারে না। কথাটা বলতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হলো আমেনা। ছি ছি একথা বললো সে। এটা ঠিক হয় নি।

বুড়ো গিন্নী নিজেও মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা বললেন, হ্যাঁরে, তুই কাপড়-চোপড় ছাড়বিনে? যা, হাতমুখ ধুয়ে নে। এতদূর থেকে এসেছিস। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করগে যা। এক গ্লাস দুধ এনে দেবো, খাবি?

না মা। দুধ খেলে আমার এক্ষুণি বমি হয়ে যাবে। মায়ের সামনে থেকে সরে গেলো আমেনা।

ও চলে গেলে মামীর দিকে তাকিয়ে জোহরা খাতুন মৃদু হাসলেন। বললেন: এখনো একেবারে বাচ্চা রয়ে গেছে। কার সামনে যে কি কথা বলতে হয় কিছু জানে না। ওটা ওই ছোটবেলা থেকেই এ রকম। পানের বাটাটা এবার সামনে টেনে নিলেন তিনি। তারপর আবার সংসারের নানা আলাপের মাঝখানে হারিয়ে গেলেন।

আমেনার দিকে চেয়ে চেয়ে তিন বউ মুখ টিপে হাসলো। বড় বউ বললো : কিরে ক'মাস? ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিলো আমেনা। জানি না। তিন বউ ওকে তিন দিক থেকে ছেঁকে ধরলো।

বল না। বল নারে।

ইস্ বিয়ে হতে না হতেই?

আমি কিন্তু ঠিক বলে দিতে পারবো।

কচু। আমেনা মুখ ভেংচালো।

বড় বউ বললো : জামাই তোকে খুব আদর করে তাই না?

মেজ বউ বললো : বিয়ের সময় তো খুব হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছিলি এখন কেমন লাগছে আঁ।

ছোট বউ বললো : এই মিনা শোন। বলে আমেনার মুখটা কাছে টেনে চাপা স্বরে কানে কানে বললো।

শফি ভাই বিয়ে করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবে? আমেনা চমকে উঠলো যেন।

এই তো গত মাসে।

কোথায়?

কোথায় ঠিক জানি না, শুনেছি বাড়ির কাছে, টাঙ্গাইলে। বউটা নাকি ভীষণ সুন্দর দেখতে।

ও। আমেনা কেমন যেন ফেকাসে হয়ে গেলো।

জোহরা খাতুন এসে তিন বউকে ডাক দিলেন। এই তোমরা এসো, বাচ্চাদের খাওয়ার পাট চুকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। তারপর বুড়োরা খাবে। আমেনা ছোট বউকে তার কাছে রেখে দিলো। তোমরা যাও মা, ছোট ভাবী আমার কাছে এখন থাকুক। একটু গল্প করবে।

মা আর দুই বউ চলে যেতে আমেনা বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো।

পুরুষ মানুষগুলো ভীষণ স্বার্থপর তাই না ভাবী?

ছোট বড় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ালো। বললো, বিয়ের পর এই তো সেদিন আমাদের এখানে এসেছিলো শফি ভাই। আমিও ছাড়িনি। বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি!

কি শুনিয়েছো? উঠে আবার বসলো আমেনা। কি শুনিয়েছো, বলো না ভাবী?

বললাম। আপনি একটা এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ। খুবতো লম্বা লম্বা কথা বলতেন, মিনাকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। ওকে ছাড়া আমি এ পৃথিবীতে আর কাউকে চিন্তা করতে পারি না। ওকে না পেলে সারা জীবন আমি আর বিয়ে করবো না। এখন? কি হলো?

শুনে কি বললো? আমেনার গলার স্বরে ঈষৎ উত্তেজনা। ছোট বউ জবাব দিলো। কি আর বলবে। বলার মুখ আছে। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছু বললো না?

না।

আমেনা নীরবে কিছুক্ষণ ছোট বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আসলে আমি একটা বোকা মেয়ে ভাবী। কেমন করে ওর ফাঁদে পা দিয়েছিলাম ভেবে দেখ তো।

সম্পর্কে মামাতো ভাই। তাই বাড়ির মধ্যে আসা যাওয়া আর মেলামেশায় কোন বাধা ছিলো না। তুমি তো সব জানো ভাবী।

প্রথম প্রথম সে কি কথা বলতো?

কেমন করে তাকিয়ে থাকতো।

আর আমি দুর্বল হয়ে গেলাম।

প্রেমে পড়লাম।

তোমার কাছে তো কিছুই লুকোইনি আমি ভাবী। আর হ্যাঁ ভাবী।

চিঠিগুলো কোথায় রেখেছো?

আছে।

কাউকে দেখাওনি তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

আল্লাহর কসম?

আল্লার কসম?

কোথায় রেখেছো নিয়ে এস তো।

না, এখন পারবো না। সেই ট্রাঙ্কের মধ্যে একগাদা কাপড় চোপড়ের নিচে। কাল দুপুরে বের করে দেবো। কিন্তু ওগুলো দিয়ে এখন কি করবি তুই?

পুড়িয়ে ফেলবো। মনে হলো এক্ষুণি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে আমেনা। সত্যি, আমি একটা বোকা মেয়ে ভাবী। বাবা যখন বিয়ে ঠিক করে ফেললো তোমরা তো দেখেছো, কত কেঁদেছিলাম আমি।

তোমরা আমায় বুঝিয়েছিলে। কেঁদে কি হবে। কাঁদিসনে। বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে কথা কি জানো ভাবী, লোকটার চরিত্র বলতে কিছু নেই। একটা আস্ত ছোটলোক। সহসা চুপ করে গেলো আমেনা।

স্বামীর কথা মনে পড়লো।

কেন যেন তাকে এখন আরো বেশি করে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে আমেনার। মনে মনে ভাবলো, খেয়েদেয়ে এসে ওর কাছে একটা চিঠি লিখতে হবে।

নামাজ পড়া শেষ করে বুড়োকর্তা আহমদ আলী শেখ আবার পরিচয় পর্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওকে যখন তুমি দেখেছো তখন সে হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু আমার সেই সেজো ছেলেটাকে বুঝলে মফিজ, বড় ইচ্ছে ছিলো সি, এস, পি বানাবো। উল্লুক কোথাকার, আবার দাঁত বের করে হাসে দেখ না। তিনি এখন ব্যবসা করছেন। পাটের ব্যবসা। অবশ্য ব্যবসায়-রুজি-রোজগার ভালোই হচ্ছে।

সহসা বুড়া কর্তার চোখ পড়লো বাচ্চা ছেলেটার দিকে। ঐ দ্যাখো। লেখাপড়া ফেলে তিনি এদিকে হা করে তাকিয়ে আছেন। কাল না তোর পরীক্ষা। ভালোমত পড়াশোনা করো। পড়ে পড়ে পুরো বইটাকে মুখস্ত করে ফেলো। রেজালটা যদি ভালো হয় তাহলে কালচাঁদ থেকে একসের মিষ্টি কিনে খাওয়াবো তোমায়। পড়ো, পড়ো।

ঠিক এমনি সময় দরজা দিয়ে চোরের মতো ভেতরে এলো দু'টি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলেমেয়ে।

আহমদ আলী শেখ তাদের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। এই যে, কোত্থেকে এলে তোমরা আঁ? কোথায় গিয়েছিলে?

বাইরে।

বইরে। সেতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কোথায়?

ছোট খালার বাসায়।

এতক্ষণ সেখানে কি করছিলে? তোমাদের না সন্ধের পর বাইরে কোথাও থাকতে নিষেধ করেছিলাম। একটু সুযোগ পেলেই দু'জনে ফাঁকি দিয়ে এদিক সেদিক ঘুরঘুর করো। দাঁড়াও এবার তোমাদের দু'জনকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবো আমি। সহসা মফিজ মামার দিকে তাকালেন আহমদ আলী শেখ। মৃদু হেসে বললেন, আমার বড় নাতি। মনসুরের ছেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুল। আর ওর নাম রেখেছি পেঁচি। মেজোর বড় মেয়ে। দু'টিতে বড় ভাব। দাঁড়াও, তোমাদের রোজ রোজ বাইরে যাওয়ার মজা দেখাচ্ছি আমি।

রসুল আর পেঁচি মাথা নত করে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেলো। বাচ্চা ছেলেটা এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে ওদের দেখছিলো। আড়চোখে একবার বুড়ো কর্তাকে দেখে নিয়ে আবার বইয়ের প্রতি মনোযোগ দিলো। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। কিন্তু ইবলিশ তবু রাজি হইলো না। ইবলিশ বললো, হে রব্বুল আলামীন। ইহারা মাটির তৈরি। আর আমাদের আপনি আগুন দ্বারা তৈরি করিয়াছেন। আমরা আগুনে তৈরি হইয়া কেন মাটির ঢেলাকে সেজদা করিবো।

জোহরা খাতুনের গলার স্বরে বুড়ো কর্তার চমক ভাঙ্গলো। কি মেহমানকে নিয়ে সারারাত গল্প করবে নাকি! খাবে না? সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো কর্তা সহসা চিৎকার করে উঠলেন। আবদুল, আবদুল, উল্লুক কোথাকার। বাইরে হাত মুখ ধোয়ার পানি দিয়েছিস? জলদি করে দে। এসো মফিজ, হাতমুখ ধুয়ে নাও।

গিন্নী চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে থামালেন আহমদ আলী শেখ। শোন, মনসুর আহসান ওদের সবাইকে ডাকো। আমেনা কোথায়, না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। ওকে তোলো। আজ আমরা সবাই এক সঙ্গে খাবো। ওঘরে জায়গা না হলে, এক কাজ করো, এখানে ফরাশ বিছিয়ে দিতে বলো।

বড় বউ মেজ বউয়ের কানে কানে প্রশ্ন করলো, মামা মামী কি আজ রাতে এখানে থাকবেন নাকি?

মেঝে বউ বললো, না, আমেনা বলছিলো ওরা রাতের ট্রেনে চাটগাঁ চলে যাবে।

যাক বাবা বাঁচোয়া। বড় বউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, ওদের জায়গা দেবো কোথায়।

ছোট বউ ছুটতে ছুটতে এলো। বড়বু দস্তরখানটা কোথায়, দেখেছো?

কেন?

ওটা পাচ্ছি না। বাইরের ঘরে ফরাশ বিছিয়ে দিতে বললেন মা। সবাই একসঙ্গে ওখানে খাবে। ও, মুখ টিপে হাসলো মেজ বউ। বুড়োর আজ আবার ক্ষেতের ফসল দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

ঘরের মধ্যে বুড়ো কর্তা আহমদ আলী শেখ তাঁর বিছানায় ঘুমোচ্ছেন। মাঝে মাঝে মৃদু নাক ডাকছে তাঁর।

বাচ্চা ছেলেটার চোখেও ঘুম। তবু বসে সে তার পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করছে তখনো।

আল্লাহতায়ালা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। ইবলিশ বলিলো, হে সর্বশক্তিমান, আপনি যে মানুষ পয়দা করিয়াছেন ইহারা সমস্ত দুনিয়াকে জাহান্নামে পরিণত করিবে। ইহারা পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিবে। কলহ করিবে। মারামারি করিবে।

বুড়ো কর্তা তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি।

দেখলেন সর্বাঙ্গ সাদা ধবধবে কাপড়ে ঢাকা চারটে মূর্তি তাঁর ঘরের চারপাশে এসে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে মূর্তিগুলি সামনে এগিয়ে এলো।

মনে হলো কারো উদ্দেশ্যে যেন সেজদা করলো ওরা। তারপর একসঙ্গে অনেকটা একতালে বুড়ো কর্তার বিছানার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। আহমদ আলী শেখ অবাক হয়ে দেখলেন ওদের। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলেন বুড়ো কর্তা। বুকটা দুরুদুরু কাঁপছে। হাত পাগুলো শির শির করছে।

চারটে মূর্তি মুহূর্তে অসংখ্য মূর্তির রূপ নিলো।

বুড়ো কর্তা দেখলেন তার মৃত বাবাকে।

মৃত চাচাকে।

মৃত ভাইকে।

আরো অসংখ্য মৃত আত্মীয় স্বজনকে।

দেখলেন, সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা বলছে।

আহা আমাদের ছেলে এবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

আমাদের কোলের মানিককে এবার আমরা আমাদের কাছে নিয়ে যাবো। যাদু আমার জলদি করে চলে এসো।

খোকন আমার। মানিক আমার জলদি করে চলে এসো। বুড়ো কর্তা শিশু আহমদ আলীকে তার দাদুর কোলে প্রত্যক্ষ করলেন।

বুড়ো তাকে আদর করছে আর বলছে, মানিক আমার। মানিক আমার। যুবক আহমদ আলী শেখকে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো কর্তা। দেখলেন, সেই মেয়েটিকে, যার সঙ্গে একবার বিয়ের কথা হয়েছিলো ওঁর। পরে দেনা পাওনা নিয়ে দাদুর সঙ্গে গোলমাল লেগে যাওয়ায় বিয়েটা ভেঙ্গে যায়।

মেয়েটি হাসলো। আমরা তোমাকে নিতে এসেছি, চলে এসো।

চলে এসো। চলে এসো। অসংখ্য মূর্তি হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাঁকে। বুড়ো কর্তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

চোখ বড় বড় করে চারপাশে তাকালেন আহমদ আলী শেখ। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখলেন ঘরে কেউ নেই। শুধু সেই বাচ্চা ছেলেটা পড়ার টেবিলে বসে ঘুমে ঢুলছে।

সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে বুড়ো কর্তার। সহসা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। হায় হায় একি দেখলাম। একি স্বপ্ন দেখলাম আমি। আল্লারে একি স্বপ্ন দেখলাম। ইয়া খোদা একি স্বপ্ন তুমি দেখালে আমাকে। ও মনসুর। মকবুল। আহসান। হায় হায় একি স্বপ্ন দেখলাম। বুড়ো কর্তার চিৎকারে বাচ্চা ছেলেটা ফিরে তাকালো ওঁর দিকে। বাড়ির অন্য সবাই আলুথালু বেশে ছুটে এলো সেখানে।

কি হয়েছে।

কি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁ কি হলো? চিৎকার করছো কেন? কি হয়েছে?

ওদের সকলকে কাছে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন আহমদ আলী শেখ। কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীর তখনো থরথর করে কাঁপছে।

কাঁপা গলায় বিড়বিড় করে বললেন, হায় হায় একি স্বপ্ন দেখলাম। আল্লায় কি দেখালো আমাকে।

বড় ছেলে বললো, কি হয়েছে আব্বা। কি স্বপ্ন দেখেছেন।

খুব খারাপ স্বপ্ন।

মেঝ ছেলে ইষৎ বিরক্তি প্রকাশ করলো, স্বপ্ন দেখে অত চিৎকারের কি হয়েছে। সেজ ছেলে বললো, স্বপ্ন তো সবাই দেখে।

ছোট ছেলে বললো, আমি অসুস্থ মানুষ। চিৎকার শুনে বুকটা ধড়ফড় করে উঠছে। ভাবলাম কেউ বুঝি মারাই গেলো। উহ্।

মরেনি, মরেনি। মরবে। বুড়ো কর্তা তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মনসুরের মা তোমার মনে আছে আমার আব্বা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই যে চারটে সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্তি এসে খাটের চারপাশে দাঁড়ালো। মনে নেই? সেই স্বপ্ন দেখার পরদিন তো আব্বা আর মেজ ভাই হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। মনে নেই?

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। জোহরা খাতুন শিউরে উঠলেন। ইয়া আল্লাহ, এ স্বপ্ন আপনি কেন দেখালেন।

বুড়ো কর্তা বললেন, বাইশ বছর আগের কথা। মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন। আব্বা স্বপ্ন দেখে বললেন খুব খারাপ স্বপ্ন। নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটবে। দেখো, তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। আল্লার কি মেহেরবানি। কিন্তু আজ হঠাৎ আমি সেই স্বপ্ন আবার দেখলাম কেন? বড় ছেলে সান্ত্বনা দিলো, ও কিছু না আব্বা। আপনি শুয়ে পড়ুন।

না না, তোমরা বুঝতে পারছো না। বুড়ো বললেন, নিশ্চয়ই কোন একটা অঘটন ঘটবে। নইলে এতদিন পরে সে স্বপ্ন আবার দেখলাম কেন আমি। নিশ্চয়ই কেউ মারা যাবে।

খালি মরার কথা আর মরার কথা। ছোট ছেলে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, আমি অসুস্থ মানুষ। আমার সামনে খালি মরার কথা।

সেজ ছেলে বললো, তুই এখানে এসেছিস কেন। গিয়ে ঘুমাগে।

ঘুম আর হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় এত মরার কথা শুনলে কারো ঘুম হয়!

হাতের কাছে রাখা গামছাটা তুলে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছলেন আহমদ আলী শেখ।

ঘরের কোণে রাখা পাখাটা এনে শ্বশুরকে বাতাস করতে লাগলো মেজ বউ।

বুড়ো কর্তা সবার মুখের দিকে একবার করে তাকালেন।

ছেলেদের দেখলেন।

বউদের দেখলেন।

আমেনাকে দেখলেন।

রসুল আর পেঁচিকে দেখলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের গিন্নীর দিকে তাকালেন।

ভরা ফসলের ক্ষেতে পোকা পড়ার পর অসহায় আতঙ্ক নিয়ে একজন চাষী যেমন করে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমন করে।

আশ্চর্য। মানুষ যে চিরকাল বেঁচে থাকে না। একদিন তাকে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয় এতবড় সত্যটাকে আমি কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম।

নিজের বিছানার এককোণে চুপচাপ বসে তাই ভাবছিলেন মনসুর আলী শেখ।

দিনরাত আমি শুধু ওকালতির দলিল দস্তাবেজ আর বইপত্র নিয়ে মশগুল ছিলাম।

কোর্টে গেছি।

কোর্ট থেকে ফিরে এসেছি।

মক্কেলদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মামলার নথিপত্র ঠিক করেছি।

হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তিতর্কের মায়াজাল রচনা করে অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ। সেজন্যে টাকা পয়সা ওরা দিয়েছে আমায়। রোজগার আমি প্রচুর করেছি। কিন্তু সব কিছুই তো ইহকালের জন্যে। পরকালের জন্যে কি করেছি আমি? আজ যদি আমি মারা যাই, হ্যাঁ, আমি জানি সবাই আমার জন্যে কাঁদবে।

তারপর।

তারপর আমাকে কবর দিয়ে আসবে ওরা।

একা।

আমি তখন একা।

সেই অন্ধকার কবরে তখন মনকির নকির দুই ফেরেস্তা আসবে। ওরা আমাকে জাগাবে।

প্রশ্ন করবে।

আমি কে।

আমার পিতার নাম কি।

পরকালের জন্যে কি কি করেছি আমি?

তখন।

তখন কি জবাব দেবো আমি।

আমার চোখের সামনে যখন ওরা আমার জীবনের নেকি বদির খাতাটা খুলে ধরবে আর বলবে, জীবনভর তুমি শুধু মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো।

নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্যে অহরহ মিথ্যে কথা বলেছো। মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

তখন।

তখন কি কৈফিয়ত দেবো আমি ওদের কাছে?

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন মনসুর আলী শেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বউ পানের বাটা সামনে নিয়ে সুপারি কাটছিলো। সহসা প্রশ্ন করলো, আব্বা যে বললেন ঐটা কি সত্যি?

কি? অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর দিকে তাকালো মনসুর আলী।

ওই স্বপ্নের কথা। বড় বউ বললো, মানে ওই স্বপ্ন দেখার পর কি সত্যি সত্যি তোমার দাদা আর চাচা মারা গিয়েছিলো?

হ্যাঁ। নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মনসুর আলী।

সহসা ডাকলো। এই শোন।

কি?

আব্বার জায়নামাজটা কোথায়? নিয়ে এসো তো।

জায়নামাজ দিয়ে কি করবে? বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো বড় বউ।

মনসুর আলী সংক্ষেপে জবাব দিলো, নামাজ পড়বো।

সেকি, আজ হঠাৎ নামাজ পড়তে চাইছো?

না, মানে, কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো মনুসর আলী। তারপর স্ত্রীর উপর রেগে চিৎকার করে উঠলো সে। তোমার ওই মুখে মুখে তর্ক করার অভ্যেসটা এখনো গেলো না। যা বলছি তাই করো। জায়নামাজটা কোথায় আছে খুঁজে নিয়ে এসো।

স্বামীর কাছ থেকে হঠাৎ এ ধরনের ব্যবহার আশা করেনি বড় বউ। সেই দুঃখেই হয়তো মুখ দিয়ে একটা কটূ কথা বেরিয়ে গেলো ওর।

হুঁ, একরাত নামাজ পড়লেই কি আর সারা বছরের পাপ ধুয়ে যাবে?

কি? চমকে ফিরে তাকালো মনসুর আলী।

চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলছে।

হ্যাঁ। পাপ আমি করেছি বইকি। কিন্তু কাদের জন্য করেছি। তোমার জন্যে।

তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে।

তাদের ভবিষ্যতের জন্যে।

যে গয়নাগুলো পরে সবার সামনে সগর্বে ঘুরে বেড়াও সেগুলোর কোত্থেকে এসেছে।

যে ভাত আর মুরগির ঠ্যাং চিবিয়ে খাও সেগুলো কোত্থেকে এসেছে? স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে আর একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সাহস পেলো না বড় বউ। নীরবে জায়নামাজের খোঁজে বেরিয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ ধরে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মেজ ছেলে আহসান। কিন্তু কিছুতেই বইয়ে মন বসছে না তার। অথচ ঘুমও আসছে না। মেজ বউ কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করে বললো। হ্যাঁ, তুমি একটা ইন্সিওরেন্স করেছিলে না?

হ্যাঁ, করেছিলাম তো। কিন্তু কেন বল তো?

না এমনি। হঠাৎ মনে পড়লো তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বইটা বন্ধ করে স্ত্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আহসান। ধীরে ধীরে একটা মৃদু হাসি জেগে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজ বউ অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কি ব্যাপার, অমন করে মুখের দিকে চেয়ে আছো কেন?

তোমাকে দেখছি। আর ভাবছি।

কি ভাবছো।

ভাবছি, আমি মরে গেলে তুমি অনেকগুলো টাকা পাবে। ইন্সিওরেন্সের টাকা।

অকস্মাৎ সারা মুখে যেন কেউ কালি লেপে দিলো তার। বিমর্ষ গলায় মেজ বউ বললো, ছি, আমাকে এত ছোট ভাবলে তুমি। চাই না তোমার টাকা, আমি চাই না। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো। দু'চোখে অশ্রু ঝরলো তার।

মৃদু শব্দে হাসলো আহসান। তোমরা মেয়ে জাতটা বড় অদ্ভুত। মুহূর্তে হাসতে পারো, মুহূর্তে কাঁদতে পারো। কি যে পার আর কি কি যে পারো না ভেবে পাই না।

হয়তো কান্নাটাকে রোধ করার জন্যে কিম্বা স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে ছুটে পাশের বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো মেজ বউ।

শব্দ করে দরজাটাকে বন্ধ করে দিলো।

বাড়ির সেজ ছেলে মকবুল একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টানছে আর হিসেবের খাতা দেখছে। ছোট বউ তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়ালো। মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো। কই উত্তর দিলে না?

কিসের উত্তর।

আমি মারা গেলে তুমি আরেকটা বিয়ে করবে, তাই না?

কি সব বাজে কথা বলছো। মকবুলের কণ্ঠে বিরক্তি।

ছোট বউ–এর গলায় অভিমান। আহা বলো না। বলো না, আমি মরে গেলে আরেকটা বিয়ে করবে কি না?

না, করবো না, সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ইস্ করবো না বললেই হলো। স্বামীর পাশ থেকে বিছানার কাছে সরে গেলো ছোট বউ। নিশ্চয়ই করবে। তোমাকে আমি চিনি না ভেবেছো। আজ আমি মরে যাই, কালকেই আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলবে তুমি।

দেখো। এত ভালো করেই যখন আমাকে চেনো তুমি তখন মিছেমিছি কেন কথা বাড়িয়ে, বারবার আমার হিসেবটা গুলিয়ে দিচ্ছো? রেগে গেলো মকবুল।

ভ্রূজোড়া বাঁকিয়ে ছোট বউ উত্তর দিলো, খাঁটি কথা বললেই পুরুষ মানুষগুলো অমন ক্ষেপে যায়। সহসা একটা বিশ্রী কান্ড ঘটিয়ে বসলো সে। বিছানার চাদরটাকে একটানে গুটিয়ে নিয়ে একপাশে ছুঁড়ে দিলো। বালিশটাকে ফেলে দিলো মেঝের ওপর। দূর। কার জন্যে গোছাবো এসব। আজ চোখ বুজলেই কাল আরেকটাকে এনে এ বিছানায় শোয়াবে। দূর। দূর।

হিসেবের খাতা ছেড়ে উঠে এলো মকবুল। বাহুতে হাত রেখে কাছে টেনে আনলো তাকে। কি করছো। শোনো, এদিকে এসো। তোমার বয়স কত বলোতো?

কেন, বয়স জানতে চাইছো কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন আছে। বলো।

বারে, তুমি জানো না বুঝি।

তবু বলো না। স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলো মকবুল।

মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ছোট বউ আস্তে করে উত্তর দিলো, পঁচিশ বছর।

শোনো, পঁচিশ বছরের মেয়েটি শোনো, অদ্ভুত গলায় কাটা কাটা স্বরে বললো মকবুল। আজ আমি যদি মারা যাই তুমি তোমার বাকি বছরগুলো কি বিয়েসাদি না করে, বিধবার মতো কাটিয়ে দেবে?

দেবো। নিশ্চয়ই দেবো। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলো ছোট বউ। আমাকে কি তোমার মতো হ্যাংলা পেয়েছো যে আরেকটা বিয়ে করবো? তোমার কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে আমার, মকবুল ধীরে ধীরে বললো। কিন্তু বউ শোনো, তুমি পারবে না। এক বছর। দু'বছর, দশ বছর পরে হলেও তুমি আরেকটা বিয়ে করবে। ছোট বউ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো। মকবুল বাধা দিয়ে বললো, শোনো, এতে অন্যায়ের কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। আর আমার কথা জানতে চাও? আমি একটু আগে তোমার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি সেটা সম্পূর্ণ বানানো। মিথ্যা। তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই বলেছি। বলেছি, কারণ সংসারে বেঁচে থাকতে হলে এই ছোটখাট মিথ্যে কথাগুলো বলতে হয়। যাকে বলি সেও জানে ওটা মিথ্যে। তবু মিথ্যে সান্ত্বনা পায়। বুঝলে? স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসলো মকবুল।

অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছোট বউ। এমন নিষ্ঠুর স্বামী কেউ কোনদিন দেখেছে পৃথিবীতে। সে ভাবলো মনে মনে, আর ভাবতে গিয়ে অকারণে ঠোঁটজোড়া বার কয়েক কেঁপে উঠলো তার।

মনসুরের বড় ছেলে রসুল আর মেজোর বড় মেয়ে পেঁচি। খোলা ছাদের এককোণে দু'জনে চুপচাপ বসে। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন লুকিয়ে ছাদে চলে আসে ওরা। বসে বসে গল্প করে।

আজ পেঁচি বললো, আমার ভীষণ ভয় করছে রে।

কেন?

যদি তুই মারা যাস তাহলে?

রসুল শব্দ করে হেসে উঠলো, বললো, দূর। দূর। ওসব স্বপ্নের কোন মানে আছে নাকি? বুড়ো কি দেখতে কি দেখেছে। ওসব স্বপ্নে টপ্নে বিশ্বাস করিসনে রে পেঁচি।

পেঁচি ওর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, কিরে, খুব যে গলা ছেড়ে হাসছিস।

কেন, কি হয়েছে?

কেউ টের পেলে তখন বুঝবি মজা। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো পেঁচি। হঠাৎ কি মনে হতে থেমে গেলো। তারপর মৃদু হেসে বললো, এই, তোর জন্যে আজ একটা জিনিস এনেছি রে।

কি?

বুকের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে এনে পেঁচি জবাব দিলো, সিগারেট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি, দেখিতো। ওর হাত থেকে প্যাকেটটা লুফে নিলো রসুল। কোথায় পেয়েছিস রে?

চারপাশে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে পেঁচি আস্তে করে জবাব দিলো, বাবার পকেট মেরেছি।

বাহ্। তুই আজকাল ভীষণ কাজের মেয়ে হয়ে গেছিসরে পেঁচি। দাঁড়া, একটা এক্ষুণি ধরিয়ে খাই। মরার আগে অন্তত একটা দামী সিগারেট খেয়ে মরি।

সহসা পেঁচি বাচ্চা মেয়ের মতো হাত পা ছুড়তে শুরু করলো। এই ভলো হবে না বলছি।

কেন? কি হয়েছে?

তুই আবার মরার কথা বলছিস কেন আমার ভয় লাগে না বুঝি?

আরে দূর। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়লো রসুল। মরার কথা বললেই কি মানুষ মরে না কিরে। তোকে বললাম না ওসব স্বপ্ন টপ্ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাসনে পেঁচি। সব বাজে, একেবারে ভুয়ো।

ওর কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলো পেঁচি। পরক্ষণে আবার প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায় রে?

যাবে আবার কোথায়। মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পা জোড়া দোলাতে দোলাতে জবাব দিলো রসুল। পেঁচি ওর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, দূর তুই কিচ্ছু জানিস না। মানুষ মরে গেলে হয় বেহেস্তে যায়, নইলে দোজখে যায়।

সিগারেট খেতে খেতে একবার ওর দিকে তাকালো রসুল। কিছু বললো না।

আমেনা তার স্বামীর কাছে চিঠি লিখছিলো তখন। আমি নিরাপদে এসে পৌছেছি। পথে কোন কষ্ট হয়নি। মামা আর মামী আমাকে বাসায় পৌছে দিয়ে রাতের ট্রেনে চাটগাঁয়ে চলে গেছেন। এখানে ভাবীরা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে হাসছিলো। ভীষণ লজ্জা লাগছিলো আমার। জানো, ওরা কেউ ভাবতেই পারে নি।

এখানে এসে চিঠি লেখা বন্ধ করলো আমেনা। কি লিখেছে একবার পড়লো।

না। কিচ্ছু হয়নি। আবার লিখতে হবে।

নতুন কাগজ নিয়ে আবার বসলো আমেনা।

জানো, আজ রাতে আব্বা একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছেন। ওটা নাকি আমার দাদুও দেখেছিলেন। দেখার দু'দিন পরে তিনি আর আমার মেজ চাচা মারা যান।

আব্বা বলছিলেন নিশ্চয়ই এবারও একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানো, আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি কাছে নেই। মুরব্বিরা বলেন, স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত। তাঁদের কোন কথা অমান্য করলে গুনাহ্ হয়।

আজ মনে হচ্ছে ওরা ঠিকই বলেন।

তুমি এখানে আসতে নিষেধ করেছিলে। তোমার বাধা না মেনে আমি চলে এসেছি। দেখতো, এসে কি বিপদের মধ্যে পড়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওগো। তুমি আর দেরি করো না। জলদি করে চলে এসো। যদি ছুটি না পাও তাহলে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করো। আমি আর কোনদিন তোমার কথা অমান্য করবো না।

ওগো। আমার ভীষণ ভয় করছে।

লিখতে গিয়ে আবার থামলো আমেনা।

পুরোটা পড়লো।

তারপর আবার লিখতে শুরু করলো সে।

ছোট ছেলে শামসু বেশ কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছে। পেটের অসুখ। তেমন সাংঘাতিক কিছু না হলেও দিনে দিনে শরীরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ওর। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে দেহটা।

অনেক কসরতের পর সবেমাত্র ঘুম এসেছে তার।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে।

বাবা যে মূর্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলেন তেমনি চারটি মূর্তি।

মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো। আহা, আমাদের ছেলে এবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। খোকন আমাদের।

মানিক আমাদের।

আতঙ্কে সমস্ত দেহ হিম হয়ে গেলো শামসুর।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো। মূর্তিগুলো একটা লম্বা ফিতে দিয়ে ওর দেহের মাপ নিচ্ছে। হ্যাঁ, কবরটা কত বড় হবে দেখে নাও।

দেখো, কবরের মাপ যেন আবার ভুল না হয়।

তীব্র একটা আর্তনাদের সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ওর। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলো শামসু। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো অন্ধকার ঘর খালি। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সে।

ও বাবাগো। আব্বা। আম্মারে। আমি তো মরে গেলাম। আব্বাগো আমি তো মরে গেলাম। ও আব্বা।

চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এলো সে ঘরে।

কি হয়েছে?

কি হলো?

কাঁদছো কেন?

কি হয়েছে আঁ?

বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শামসু জবাব দিলো, আমি মরে যাবো। মরে যাবো। এইমাত্র ওরা এসে আমার কবরের মাপ নিয়ে গেছে। আম্মা, আম্মাগো বলে মাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

মনসুর শুধালো, কারা তোর কবরের মাপ নিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্নার মাঝখানে শামসু বললো, সেই সাদা সাদা মূর্তিগুলো আব্বা যাদের কথা বলছিলো।

ইয়া আল্লা। বুড়ো কর্তা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ধীরে ধীরে ছেলের পাশে বসলেন তিনি। তারপর এক এক করে ছেলেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

মূর্তিগুলো কত লম্বা ছিলো। কোথায় দাঁড়িয়েছিলো। কেমন করে সামনে এলো। কি কথা ওরা বললো।

হ্যাঁ। সব মিলে যাচ্ছে। হুবহু মিলে যাচ্ছে ওর দেখা স্বপ্নের সঙ্গে। শুধু একটা ব্যতিক্রম। এবার কবরের মাপ নিয়ে গেছে ওরা। ইয়া আল্লা। শিশুর মতো অসহায় দৃষ্টিতে অসুস্থ ছেলেটার দিকে তাকালেন তিনি। শামসু তখনো কাঁদছে।

গিন্নী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কাঁদিস না। কাঁদিস না। কেঁদে কি হবে? আল্লা আল্লা কর। আল্লাকে ডাক।

আম্মা। আম্মাগো। বলে কাঁদতে থাকলো শামসু। গিন্নী তাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। আমাকে ডেকে কি হবে, আল্লাকে ডাক।

শামসু এবার শব্দ করে আল্লাকে ডাকতে শুরু করলো।

বুড়ো আহমদ আলী শেখ তখনো কপালে হাত রেখে নীরবে বসে। অঘটন যে একটা ঘটবে এ সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা নেই।

আজ বিশ বছর এ পরিবারে কেউ মরেনি।

মৃত্যুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন আহমদ আলী শেখ।

আজ মৃত্যু এসে তাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে।

মনে মনে আজরাইলের কথা ভাবলেন বুড়ো কর্তা।

পরলোকের কথা ভাবলেন।

হাশরের ময়দানের কথা ভাবলেন।

বেহেস্ত আর দোজখের কথা ভাবলেন।

তারপর পুত্রকন্যা সবার দিকে তাকালেন তিনি।

তোমরা যাও। ঘরে যাও। আল্লা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। ঘরে গিয়ে আল্লা আল্লা করো। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। অনেকদিন হলো তিনি বুড়ো হয়েছেন। কিন্তু বার্ধক্যের অনুষঙ্গগুলো কোনদিন উপলব্ধি করেন নি। আজ মনে পড়েছে। দেহটা ভারভার লাগছে মনে হচ্ছে বুঝি লাঠি ছাড়া তিনি হাঁটতে পারবেন না।

মনসুর আর তার বউ।

দু'জনে বিছানায় শুয়ে, ঘুম আসছে না। খোলা দু'জোড়া চোখ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে।

সহসা নীরবতা ভাঙলো বড় বউ। শামসুটা বোধ হয় মারা যাবে। ক'মাস ধরেই তো অসুখে ভুগছে। হ্যাঁলো, সেবার স্বপ্ন দেখেছিলো তখন দু'জন মারা গিয়েছিলো তাই না?

হ্যাঁ।

এবারো হয়ত দু'জন মারা যাবে। স্বামীর দিকে আড়চোখে একবার তাকালো বড় বউ।

মনসুর কোন উত্তর দিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বউ তার একখানা হাত স্বামীর গায়ের উপরে রাখলো।

কি, ঘুমিয়ে পড়েছো?

না। একটু নড়েচড়ে শুলো মনসুর তারপর আস্তে করে বললো, আব্বার শরীরটাও তো ক'দিন ধরে খুব ভালো যাচ্ছে না।

বুড়ো মানুষ। শরীরেরই বা কি দোষ। স্বামীর দিকে পাশ ফিরলো বড় বউ। হ্যাঁলো, খোদা না করুক, উনি যদি আজ মারা যান তাহলে তোমাদের বিষয় সম্পত্তিগুলোর কি হবে?

কি আর হবে। সব ভাইরা সমান ভাগে পাবে।

এটা কিন্তু অন্যায় কথা। বড় বউ উসখুস করলো। তুমি হলে বাড়ির বড় ছেলে। তোমার ভাগে কিছুটা বেশি হওয়া উচিত। এসব নিয়মকানুন কারা করেছে গো?

যারা করেছে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। মনসুরের কণ্ঠে বিরক্তি।

বড় বউ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। উঁ। বেশি ছিলো না ছাই। নিশ্চয়ই তারাও তাদের বাবার মেজো কিম্বা সেজো ছেলে ছিলো, তাই ও রকম নিয়ম-কানুন করেছে। যাই বলো, আগের দিনের নিয়ম-কানুনগুলো কিন্তু খুব ভালো ছিলো।

কি ছিলো? মনসুর স্ত্রীর দিকে তাকালো।

বড় বউ বললো। ওই যে, আগের দিনে শুনেছি রাজা-বাদশারা মারা গেলে তার বড় ছেলে রাজা হতো?

মনসুর আবার চোখজোড়া কড়িকাঠের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। অনেক দুশ্চিন্তার মাঝেও তার ঠোঁটের কোণে সহসা একটা হাসি জেগে উঠলো।

AMARBOI.COM

মেজ ছেলের ঘর।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বিছানায় শুয়ে। পাশাপাশি।

কারো চেখে ঘুম নেই।

দু'জনেই ঈষৎ উত্তেজিত।

মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে তারা অদূর ভবিষ্যতের নানা সমস্যা নিয়ে কিছুটা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এখনো তার রেশ চলছে। মেজ বউ বললো। বুঝবে। বুঝবে। আজ বুড়ো মরুক কাল বুঝবে। তুমি তো একেবারে খেয়ালি মানুষ। অত বেখেয়ালি হলে কি চলে? বুড়ো মরে গেলে সব ভাই মিলে তোমাকে ঠকাবে। একটা কানাকড়িও দেবে না তখন বুঝবে।

আহসানের চোখেমুখে বিরক্তি। আহা। এখনও তো আব্বা মরেনি। মরার আগেই আমাকে এত উত্তেজিত করছো কেন।

উত্তেজিত করছি কি আর সাধে। ঘরে যে ছেলেপেলেগুলো আছে তাদের কথা আমাকে ভাবতে হবে না? খোদা না করুক, আজ যদি তোমার কিছু একটা হয় তাহলে ওদের নিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায়।

তুমি একটা ইতর। আস্ত ছোটলোক। মুখ দিয়ে গালাগালিটা এসে গিয়েছিলো। অতি কষ্টে সামলে নিলো আহসান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য। আমি মরে গেলে আমার মৃত্যুটা তার কাছে বড় নয়। বড় হলো মারা যাবার পরে তার দিনকাল কেমন করে চলবে সেটা।

কেমন করে সে খাবে। পরবে। বাঁচবে।

বাহরে দুনিয়া। বাহ। মনে মনে ভাবলো আহসান। আমি যখন একেবারে ছোট ছিলাম তখন মা দিনরাত সেবা শুশ্রুষা করে আমাকে মানুষ করেছে। নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছে। আর আমি যখন আরেকটু বড় হলাম তখন আমার বাবা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির রোজগার ব্যয় করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আরও পরে আমি যখন রোজগার করতে শুরু করলাম তখন আমাকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বউ এনেছে।

বউ। পরের মেয়ে।

ধীরে, ধীরে বাবা মা'র চেয়ে পরের মেয়েটা আমার আরো আপনার হয়ে দাঁড়ালো। তার দুঃখে আমি কাঁদি। তার আনন্দে আমি হাসি। আর। সে মেয়েটিই কিনা আজ এত স্বার্থপরের মতো চিন্তা করতে পারলো।

ধুত্তুরী ছাই। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

ঘুমোবার চেষ্টা করলো আহসান। কিন্তু ঘুম এলো না।

একটা সিগারেট শেষ না হতেই আরেকটা সিগারেট ধরালো মকবুল। বাড়ির সেজ ছেলে।

ছোট বউ শুধালো, অত সিগারেট খাচ্ছো কেন?

মকবুলের চোখজোড়া ঈষৎ লাল। সামনে সরে এসে আস্তে করে বললো, শোন, যদি কোন অঘটন ঘটে তাই তোমাকে জানিয়ে রাখছি। তোমার নামে কিছু টাকা আমি আলাদা করে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। কিছু শেয়ারও কেনা আছে। ওই ডয়ারের মধ্যে কাগজ-পত্রগুলো রাখা।

কাউকে কিছু জানিয়ো না কিন্তু আঁ।

ছোট বউ ঘাড় নেড়ে সায় দিলো, জানাবো না। স্বামীর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললো, তোমর কি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি কিছু ঘটবে। তার কণ্ঠস্বরে গভীর উৎকণ্ঠা।

সিগারেটের ধোঁয়াটা গিলে নিয়ে মকবুল জবাব দিলো, হায়াত মউত সব আল্লার হাতে। কিছু বলাতো যায় না, শোন, মঘুকে ভালো মাস্টার রেখে বাড়িতে পড়িয়ো। ও একটা ভালো কোচ পেলে ভবিষ্যতে খুব সাইন করবে।

অদূরে শুয়ে থাকা ছেলের দিকে তাকালো মকবুল। উঠে এসে ওর গায়ে মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে আদর করলো সে।

মনে হলো যেন নিজেকে অনুভব করলো।

আমার সন্তান।

ওর সারা দেহে আমার রক্ত ছড়িয়ে।

ভাবতে গিয়ে অনেকটা হালকা বোধ করলো মকবুল। ছোট বউ এতক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবছিলো। সহসা সে বললো, আমার মনে হয় কি জানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মকবুল চমকে তাকালো স্ত্রীর দিকে। কি?

মনে হয় শামসুটাই মারা যাবে। বলতে গিয়ে একটা ঢোক গিললো ছোট বউ। আর। আর তোমার আব্বা।

ও। স্ত্রীর দিক থেকে চোখজোড়া নামিয়ে আবার ছেলের দিকে তাকালো মকবুল। আরেকটা সিগারেট ধরালো।

বুড়ো কর্তা আহমদ আলী শেখ বিছানায় শুয়ে।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

আবার স্বপ্ন দেখছেন।

ঘরের কোণে অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি নীরবে দাঁড়িয়ে।

স্বপ্নের মধ্যেই বুড়ো কর্তা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। কে? কে ওখানে? ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলো।

কি চাও তুমি, কেন এসেছো এখানে? বুড়ো কর্তা শুধোলেন।

মূর্তি বললো, আপনার দু'টি ছেলের জান কবজ করতে এসেছি আমি। আহমদ আলী শেখ চমকে উঠলেন। ঢোক গিললেন। ধীরে ধীরে শুধোলেন। কোন্ দু'টি ছেলের?

কোন্ দু'টি ছেলের জান নেবো সেটা আপনাকেই ঠিক করে দিতে হবে। আপনিই বেছে দিন। অত্যন্ত পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিলো ছায়ামূর্তি। বুড়ো কর্তা অসহায় শিশুর মতো কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে কোন কথা বরুলো না তাঁর, মনে হলো হাতপাগুলো সব কাঁপছে।

সহসা পাশে তাকিয়ে দেখলেন তার চার ছেলে সার বেঁধে আসামীর মতো মাথা নিচু করে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো কর্তা বড় ছেলের দিকে তাকালেন।

বড় ছেলের মুখ শুকিয়ে গেলো। কাঁপা গলায় অস্পষ্ট স্বরে সে বললো, আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি আব্বা। আমি আপনার বড় ছেলে। আমি মরে গেলে, আব্বা। আব্বা। আমার অনেকগুলো ছেলেপিলে। আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন আব্বা।

বুড়ো কর্তা ধীরে ধীরে বড় ছেলের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে এনে মেজ ছেলের দিকে তাকালেন। মেজ ছেলে ঘামতে শুরু করেছে ততক্ষণে। মুখখানা বিবর্ণ। ফেকাসে।

কাঁদো কাঁদো গলায় মেজ ছেলে বললো, আব্বা, আমি আপনাকে বেশি ভালবাসি আব্বা। আপনার যখন সেবার অসুখ করেছিলো, আমি সারারাত জেগে আপনার সেবা করেছি। আমি মরে গেলে আব্বা। আব্বা।

কর্তা এবার সেজ ছেলের দিকে তাকলেন।

সেজ ছেলে ভয়ে কাঁদছে।

মনে হলো এখনি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যাবে সে। ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কোনমতে বললো, আব্বা, আমি আপনার সবচেয়ে আদরের ছেলে। মনে নেই আব্বা। সেবার, আপনার যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু টাকার দরকার হয়েছিলো তখন কেউ দেয়নি। আমি দিয়েছিলাম। আব্বা, আমি মরে গেলে আমার ছোট বাচ্চাটা, আব্বা।

বুড়ো আহমদ আলী শেখ এবার ছোট ছেলের দিকে তাকালেন। রোগাক্লিষ্ট ছোট ছেলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেললো। আব্বা আমি আপনার ছোট ছেলে। সবার শেষে দুনিয়াতে এসেছি। আমি এখনো বিয়েশাদিও করিনি আব্বা। এখন আমি মরে গেলে আমার কবরে বাতি দেওয়ারও কেউ থাকবে না আব্বা।

বুড়ো আহমদ আলী শেখের দু'চোখে পানি ভরে এলো। আবেগে থরথর করে কাঁপছে তাঁর দেহ। চার ছেলের দিকে আবার ফিরে তাকালেন তিনি। তারপর সহসা সেই ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে মরিয়া হয়ে বললেন, তুমি। তুমি আমার দু'টি ছেলেকে না মেরে তাদের তিন তিনটে বউ আছে আমার ঘরে। তাদের তিনটে বউকে মেরে ফেলো। বউ মারা গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু ছেলে মারা গেলে ওদের তো আমি আর ফিরে পাবো না।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো আহমদ আলী শেখের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ওঠে বসলেন কর্তা। চারপাশে চেয়ে দেখলেন। ঘর শূন্য। শুধু এককোণে গিন্নী জোহরা খাতুন জায়নামাজে বসে মোনাজাত করছেন।

ইয়া আল্লাহ। কাউকে যদি মরতে হয় তাহলে সবার আগে আমাকে মারো, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ, আমি বেঁচে থাকতে আমার কোন ছেলেমেয়ের গায়ে হাত দিয়ো না। আমার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ো না। ইয়া আল্লাহ, আমি যেন তাদের সবার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।

আহমদ আলী শেখ অবাক দৃষ্টি মেলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ ধরে।

সহসা বাড়ির পুরোনো চাকর আবদুলের গলা ফাটানো কান্না আর চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেলেন বুড়ো কর্তা।

আম্মাজান। আম্মাজান গো। মইরা গেছে। মইরা গেছে। হন্তদন্ত হয়ে এ ঘরে এসে ঢুকলো আবদুল। ছুটে গিন্নীর দিকে এগিয়ে গেলো। মইরা গেছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান।

কি হয়েছে। জায়নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জোহরা খাতুন। আবদুল বললো, বউডা কেমন কেমন করতেছে। হাতপা খিঁইচা চিল্লাইতাছে, শরীর ঠাণ্ডা অইয়া গেছে আম্মাজান গো। আম্মাজান জলদি কইরা চলেন। আম্মাজান।

কি হয়েছে। কর্তা অবাক হলেন।

বউডা কেমন কেমন করতাছে। শরীর ঠাণ্ডা অইয়া গেছে আম্মাজান গো।

কি হয়েছে। এবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন আহমদ আলী শেখ।

কি আর হবে। জোহরা খাতুন উত্তর দিলেন। ওর বউয়ের বোধ হয় ডেলিভারি পেইন উঠেছে। ক'দিন ধরে বলছি হাসপাতালে দিয়ে আয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। কথাটা সম্পূর্ণ না করেই পাশের ঘরের দিকে ছুটে চলে গেলেন জোহরা খাতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল তখনো চিৎকার করছে। আম্মাজান গো মইরা যাইবো। মইরা যাইবো আম্মাজান। বউডা আমার মইরা যাইবো। ওর চিৎকার শুনে বাড়ির সবাই এ ঘরে ছুটে এসেছে ততক্ষণে।

চার ছেলে।

তিন বউ।

একমাত্র মেয়ে আমেনা।

কি হয়েছে?

আবদুল চিৎকার করছে কেন?

কিরে কি হয়েছে আবদুল?

চিৎকার করবি, না বলবি কি হয়েছে।

কি আর হবে। বুড়ো কর্তা আহমদ আলী শেখ আবদুলের হয়ে জবাব দিলেন। ওই উল্লুকটার কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি। বউয়ের বাচ্চা হবে, হাত পা খিঁচোচ্ছে তাই দেখে হল্লা শুরু করে দিয়েছে। অপদার্থ কোথাকার।

এমন সময় গিন্নী জোহরা খাতুন আবার এ ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। হায় হায় হায়। মেয়েটা মারা যাবে গো। এই তোরা কেউ এক্ষুণি ছুটে গিয়ে আশেপাশে কোথাও থেকে একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় না। মা তার ছেলেদের সবার মুখের দিকে তাকালেন একবার করে। তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন। জলদি যা—

আবদুল তখনো কাঁদছে। মইরা গেছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান।

চিৎকার করছিস কেন উল্লুক। এখানে চুপচাপ বসে থাক। হঠাৎ রেগে গেলেন বুড়ো কর্তা। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে হয়েছে। এখন এত রাতে কোথা থেকে ডাক্তার ডাকবো শুনি। বড় ছেলে পাশে দাঁড়িয়েছিলো। সে বললো, ডাক্তাররা কি সারারাত জেগে থাকে নাকি।

মেজ ছেলে বললো, হাজার টাকা দিলেও এখন কোন ডাক্তার আসবে না। সবার মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে আবার ফিরে গেলেন গিন্নী জোহরা খাতুন।

আবদুল ততক্ষণে মাটিতে বসে পড়ে কাঁদছে। মইরা গেছে গো আম্মাজান। মইরা গেছে।

আহা, কাঁদিস না, কাঁদিস না। হায়াত মওত সব আল্লার হাতে, আল্লা আল্লা কর। সরে এসে বিছানার ওপর বসলেন আহমদ আলী শেখ। সহসা তিন বউয়ের দিকে চোখ পড়তে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন। তোমরা সব এখানে হা করে দাঁড়িয়ে কেন। গিয়ে একটু দেখো না মেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশুরের ধমক খেয়ে তিন বউ তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লো। আমেনা অনুসরণ করলো তাদের।

চার ভাই পরস্পরের দিকে একবার করে তাকালো।

বুড়ো কর্তা কপালে হাত রেখে বিছানার ওপর চুপচাপ বসে।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না।

সহসা আহমদ আলী শেখ নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন। ইয়া আল্লাহ। ওই দুঃস্বপ্ন কি এমনিতে দেখেছি আমি, তখন বলিনি তোমাদের? তোমরা তো বিশ্বাসই করতে চাইলে না। ছেলেদের সবার মুখের ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে বললেন বুড়ো কর্তা।

আবদুল তখনো কাঁদছে।

বড় ছেলে মনসুর সহানুভূতির স্বরে বললো, কাঁদিস না আবদুল। কেঁদে কি হবে।

সামান্য সান্ত্বনায় আরো ভেঙ্গে পড়লো আবদুল। ভাইসাব গো ভাইসাব। পোলার লাইগা নিজের হাতে ছোট ছোট কাঁথা সিলাই কইরা রাখছিলো গো ভাইসাব।

আবদুল কাঁদছে।

আবার নীরবতা নেমে এলো সারা ঘরে।

চার ভাই আবার পরস্পরের দিকে তাকালো।

তাদের চোখেমুখে আগের সেই উৎকণ্ঠা এখন আর নেই। মনে হলো ঘুম পাচ্ছে তাদের।

সহসা মেজ ছেলে বললো, মানুষের কার যে কখন মউত এসে যায় কেউ বলতে পারে না।

বড় ছেলে বললো, ওর বউটা স্বভাবে চরিত্রে বেশ ভালই ছিলো। সেজ ছেলে তাকে সমর্থন করে বললো, সারাদিন চুপচাপ কার্জ কর্ম করতো।

আবার নীরবতা।

বুড়ো কর্তা মুখ তুলে আবদুলের দিকে তাকালেন। কাঁদিস না। কাঁদিস কেন। এখন আর কেঁদে কি হবে। তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীর সহানুভূতির ছোঁয়া।

সহসা পাশের ঘর থেকে সদ্যজাত শিশুর কান্নার শব্দে চমকে উঠলো সবাই।

পরক্ষণে গিন্নী জোহরা খাতুন ছুটে এলেন এ ঘরে। সঙ্গে তিন বউ আর আমেনা।

ওগো শুনছো। যমজ বাচ্চা হয়েছে গো। যমজ বাচ্চা হয়েছে। ওদের সবার চোখে মুখে হাসির ঝিলিক।

আবেগের সঙ্গে বললো।

আবদুল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো ওদের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁ উল্লুকটার কাণ্ড দেখেছো। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন আহমদ আলী শেখ। একসঙ্গে দু দু'টো ছেলের বাপ হয়ে গেছে হারামজাদা, আবার দাঁত বের করে হাসে দ্যাখো না। আবদুলের দিকে তেড়ে এলেন বুড়ো কর্তা। যেন হাতের কাছে পেলে এক্ষুণি তাকে দুটো চড় মেরে বসবেন, তিনি।

গিন্নী হেসে বললেন, দাঁড়ায়ে রইলে কেন, অজু করে এসো তাড়াতাড়ি আজান দাও।

বুড়ো কর্তা কি বলবেন, কি করবেন ভেবে না পেয়ে বোকার মতো সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন কলতলার দিকে।

বাচ্চা ছেলেটা বিছানায় শুয়ে তখনো ঘুমের ঘোরে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করছে। আর বিড়বিড় করে বলছে, আল্লাহতায়ালা বলিলেন, হে ফেরেস্তা শ্রেষ্ঠ ইবলিশ। আমি তামাম জাহানের শ্রেষ্ঠজীব ইনসানকে পয়দা করিয়াছি। ইহাকে সেজদা কর। ইবলিশ তবু রাজি হইল না। তবু সেজদা করিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির রায়হানের গল্পসমগ্র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিস থেকে বেরুতেই ফুটপাতে দেখা হয়ে গেলো মেয়েটির সাথে। একটুও চমকালো না আলম। যদিও ক্লান্ত চোখ দু'টি ওর বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

আরে আলম না। তুমি এখানে? মেয়েটিও ভুল করেনি, ঠিক চিনতে পেরেছে তাকে। অনেক দিন পরে দেখা হলো, না? আবার বললো মেয়েটি।

হ্যাঁ বছর দুয়েক। সেই–

সেই ভৈরব স্টেশনে দেখা হবার পর এই প্রথম।

হ্যাঁ, এই প্রথম।

এবার ভালো করে ওর দিকে দৃষ্টি মেলে তাকালো আলম। আগের মতো ঠিক তেমনিটিই আছে আরজু। তবুও মনে হোল যেন অনেক বদলে গেছে ও। চোখের কোণে কালি জমেছে। হাসির ঔজ্জ্বল্যে ভাটা পড়েছে এখন।

তারপর, কি করছো আজকাল? আবার প্রশ্ন করলো আরজু।

কি আর করবো– কেরানিগিরি উত্তর দিলো আলম। তুমি কি করছো?

আমি? ম্লান হাসলো আরজু। একটা কিছু করি আর কি।

তারপর– একপ্রস্থ নীরবতা। রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চললো ওরা। ধীর মন্থর পদক্ষেপ। আলম বললো– এসো চা খাওয়া যাক এক কাপ করে। আপত্তি করলো না আরজু। আলমের পিছু পিছু ঢুকলো স্টলে।

অর্ডার পেয়ে টেবিলে চা রেখে গেলো বয়। আর সেই মুহূর্তে একটি দিনের আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো আলমের।

আজকের মতো এমনি মুখোমুখি হয়েই বসেছিলো ওরা। আলম আর আরজু। কলেজের সামনে, কাফে হাউসের নির্জন কোণে। টেবিলে চায়ের পেয়ালা রেখে গেলো বয়, অন্য দিনের মতো। আর আরজুর প্রশান্ত চোখ দুটোতে নেমে এলো তৃপ্তির ঘন ছায়া। মুখোমুখি বসে দু'জনা– অপরিসীম আনন্দঘন মুহূর্ত। কিন্তু– ঠিক যেন একখণ্ড ঝড়ো মেঘের মতই সেখানে এসে দাঁড়ালো মুনির, আরজুর বড় ভাই। রক্তিম চোখ দুটোতে আগুনের ফুলকি ঝরছিলো মুনিরের। প্রেম ফ্রেমে বিশ্বাস করি না আমি। মুনির ধমক দিলো আজুরকে– ওসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দে। চাকরি করে ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে তোকে, তা ভুলে যাসনে। লোকটাকে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর ঠেকতো আলমের। তবুও কেন জানি শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসতো ওর ব্যক্তিত্বের কাছে।

কি চুপ করে রইলে যে। কি ভাবছো? আরজুর সরল কণ্ঠস্বরে অতীতের আলম আবার ফিরে এলো বর্তমানে।

কই না তো। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করলো সে। তারপর বললো হ্যাঁ আরজু, মুনির ভাই কেমন আছেন? কি করছেন তিনি আজকাল?

মুখখানা বড় ফেকাসে হয়ে গেলো আরজুর– মুনির ভায়ের কথা বলছো? জানো না বুঝি? উনি এখন জেলে আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলে? অবাক না হয়ে পারলো না আলম। কেন? কি করেছিলেন তিনি?

আরজু গম্ভীর হোল। তারপর ম্লান হাসলো একটু। জানিনে, ওরাতো কারণ জানায় নি।

নিরাপত্তা বন্দি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কিসের অপরাধে?

জানিনে– চুপ করো। হঠাৎ আলমের হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে থামিয়ে দিলো আরজু। তারপর চাপা গলায় বললো, জানো না? দেয়ালেরও কান আছে।

তারপর আবার চুপচাপ। একটানা নীরবতা। চায়ের বিলটা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। আলম ভাবলো আরজু বিয়ে করেছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করলে হয়। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলো– কিন্তু থাক সে কথা। ও আবার কি মনে করে বসবে কে জানে।

কিছুক্ষণ পরে আরজুই প্রশ্ন করলো তাকে! বিয়ে করেছো?

বিয়ে? না। তুমি?

আমি? তথৈবচ। হাসতে চেষ্টা করলো আরজু। সে হাসি বড় করুণ ঠেকলো আলমের।

কিন্তু দেখ আরজু, তুমি তো প্রায়ই বলতে, বিয়ে করে একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলের মা হয়ে সংসার বাঁধাটাই নারীর ধর্ম। বলতে না তুমি?

ঘাড় বাঁকা করে তাকলো আলম আরজুর দিকে। মুখখানা তখন দেখবার মতো আরজুর। কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলো আরজু।

এই দেখ, রাত যে আটটা বেজে নয়টা হতে চললো। খেয়ালই নেই। চলি এবার। বাসায় ছোট বোনটার অসুখ। ওকে নিয়ে আবার রাত জাগতে হবে।

কার অসুখ বললে? আসকারির? আলমের প্রশ্নে আবার দাঁড়াতে হলো আরজুকে। হ্যাঁ– আসকারির। আরজু বললো।

কি রোগ?

মরণ রোগ! গলার স্বরটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো আরজুর। কিছু টাকা পেলে একটা ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতাম ওর। জানি, ভালো হবার নয় ও রোগ। তবুও মন বোঝে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আরজু। তারপর আবার বললো, জানো আলম, ওর মুখের দিকে তাকালে বড্ড মায়া লাগে। ভীষণ কষ্ট হয়। কেমন করুণ চোখ মেলে ও তাকায় আমাদের দিকে। এ বয়সে কেইবা মরতে চায় বলো। কথা শেষ হতে মাথার কাপড়টা অল্প একটু টেনে দিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে সরু পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো আরজু। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আলম। তারপর ভাবলো। মানুষ কত সহজেই না বদলে যেতে পারে!

কলেজ জীবনে সে দেখেছে আরজুকে। আর সেখানেই তো আরজুর সাথে প্রথম পরিচয় আলমের। গোলগাল মুখের ওপর টিকোল নাক, তারি গোড়ায় ছোট একটা তিল, ভাসা ভাসা দু'টি চোখ, শ্যামলা রং, দোহারা গড়ন। সরু পাড়ের শাড়ির সাথে হাতকাটা ব্লাউজ আর প্লেন বাটা স্যান্ডেল পরে কলেজে আসতো ও। দেখতে বেশ মানাতো ওকে। মুখের কোণে একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা লেগেই থাকতো সব সময়। আর যখন শব্দ করে হাসতো ও তখন আরো সুন্দর, আরো লাবণ্যময়ী মনে হোত ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলঙ্কার পরার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল ওর। সেবার স্কলারশিপের টাকাগুলো হাতে আসতেই আলমকে বললো, চলো সরকারের দোকানে যাবো একটু। পুরোনো চুড়ি আছে দুটো। ভালো লাগে না আর– সেকেলে সেকেলে দেখতে। ওগুলো বিক্রি করে নতুন প্যাটার্নের একজোড়া কিনে আনবো।

ছোট পাথর সেটের একজোড়া বালা। দেখেই পছন্দ করলো আরজু। বললো, কি সুন্দর দেখ! কিনবো এগুলো। কিনে হাতে নিয়ে বললো, দাও, পরিয়ে দাও তুমি আমার হাতে। ওর হাতটাকে মুঠোর ভেতর চেপে ধরে, চুড়িগুলো পরিয়ে দিলো আলম। বাইরে বেরিয়ে এসে বললো আরজু, এগুলো কেন কিনলাম জানো? যদি কোনদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা যদি একটা গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ডুবে যাই আমরা, তখন এ সুন্দর চক্‌চকে পাথরগুলো আলোর সৃষ্টি করে পথ দেখাবে আমাদের। অন্ধকারে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না। আরজুর ভাবালুতায় সেদিন যত অবাক হয়েছিলো আলম, তার চাইতে আরো বেশি অবাক হোল তার বছর তিনেক পরে, ভৈরব স্টেশনে আরজুর সাথে হঠাৎ দেখা হতে। হাত দুটো খালি আরজুর। বালা নেই। সুটকেসে তুলে রেখেছো বুঝি? হাসি টেনে জিজ্ঞেস করলো আলম।

কি বলছো? বোকা বোকা চাহনি আরজুর।

হাত দুটো খালি দেখছি। সন্ন্যাস ব্রত নিলে নাকি? কথাটা এবার ঘুরিয়ে বললেও বুঝলো আরজু! কেমন ফেকাসে হয়ে গেলো ওর মুখখানা। ম্লান হেসে বললো, বিক্রি করে দিয়েছি ওগুলো, উপায় ছিলো না। যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সে– বাবা মারা গেলেন। তাঁর অসংখ্য দেনা। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করতেন তিনি। সে টাকা পরিশোধ করতে হোল। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল মুক্তোর মতো চক্‌চক্ করছিলো আরজুর। আর তারই কথা চিন্তা করতে করতে মেসে যখন ফিরে এলো আলম রাত তখন এগারোটা। সেদিনের রেশ কাটতে না কাটতেই হপ্তা দুয়েক পরে আবার দেখা হয়ে গেলো আরজুর সাথে আলমের। অফিস ফেরত পথে। চোখাচোখি হতে আজ আর হাসলো না আরজু। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ওর দিকে। বোবা চাহনি।

কি ব্যাপার! আসছো কোত্থেকে? আলম প্রশ্ন করলো। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো আরজু, তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বললো। গোরস্থান থেকে।

গোরস্থান?

হ্যাঁ, আসকারি মারা গেছে।

মারা গেছে, কখন? অস্বাভাবিক গলায় বিড়বিড় করে উঠলো আলম।

পরশু সকালে। মৃদু গলায় বললো আরজু। মরবার ঘণ্টা কয়েক আগে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না আসকারির। আমায় মরতে দিসনে আপা! আমার ভীষণ ভয় করে। স্বরে ভাঙ্গন ধরলো আরজুর– ও থামলো।

সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পেলো না আলম। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। কাঁটার মতো আটকে গেল গলার ভেতর।

তুমি অমন কাঁপছ কেন আরজু? শরীর ভালো নেই? এতক্ষণে স্বরটা বেরিয়ে এলো আলমের। মাটির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো আরজু। কি যেন ভাবলো। তারপর এক সময় মুখ তুললো আলমের দিকে, কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, এক মুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই– আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস। নির্জন রাস্তায় ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আরজু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ মুহূর্তে কি করতে পারে আলম? কোম্পানি অফিসের একজন সামান্য কেরানি বই তো আর কিছুই নয়। মাস শেষের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে পকেট তার গড়ের মাঠ। ওকে ভাবনা থেকে রেহাই দিলো আরজু নিজেই। ভেজা কণ্ঠে বললো, জেল থেকে চিঠি পেয়েছি একখানা মুনির ভায়ের। ওঁরও শরীর বিশেষ ভালো নয়। আমাশায় ভুগছেন। তবুও লিখেছেন– চিন্তা করিসনে তোরা, ভালো হয়ে যাবো। তোমাদের কথা মনে পড়লে দুঃখ হয় খুব– বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার নারে? কিন্তু কি করবো বল।.....তারপরেই সেন্সরবোর্ডের কালি লেপা। পড়া যায়নি কিছু। কথা শেষ করলো আরজু।

মেসে ফিরে সে রাত আর ঘুমোতে পারলো না আলম। বার বার উঠাবসা করলো বিছানার উপর। পাশের সিটের রহমান সাহেব বিরক্তি বোধ করলেন বোধ হয়। তাই বললেন, এমন করছেন কেন সাহেব। খাওয়া হয়নি বুঝি আজকে? শুনলাম মেসের ম্যানেজার ডাইট বন্ধ করে দিয়েছে আপনার?

কোন উত্তর দিলো না আলম। এ তো একটা বহু প্রাচীন কথা। কি উত্তর দেবে? উত্তর এলো ওপাশের খলিল সাহেবের কাছ থেকে। আমার ডাইটও বন্ধ করে দিয়েছে সাহেব। কিন্তু উপোস থাকবার হাত থেকে বড় জোর বেঁচে গেছি। ফুফাতো ভাই একটা থাকে শরৎদাস লেনে। ওর কাছে গিয়ে মুখ ফুটে চেয়ে খেয়ে এলাম এক পেট। কি আর করা যায়। মাসের এ শেষ ক'টি দিন বড় একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর এ একঘেয়ে দিন কটিও কেটে গেলো পর পর। নতুন মাস। বকেয়া মাসের পাওনা টাকাগুলো হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো আলম। আজকের মধ্যেই শেষ হবে এগুলো–দেনা পরিশোধ করতে করতে। বাড়িতে মায়ের কাপড় নেই লিখেছে। ওঁর জন্য কাপড় কিনতে হবে একখানা। ছোট ভাইবোনগুলোর জন্য কয়েকটা ফ্রক, প্যান্ট। বার বছরের আফিয়াটার জন্য একটা কাপড় না পাঠালেই নয়। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠলো আলমের। টাকা হাতে নিয়েও বেশ ঘামিয়ে উঠছে সে। অন্ধকার, চারিদিকে যেন অন্ধকার।

হঠাৎ আরজুর কথা মনে পড়ে গেলো তার। যদি পথের ভেতর দেখা হয়ে যায় ওর সাথে। আর ও যদি আজ হাত পেতে বসে আলমের কাছে– তাহলে? চলার গতিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিলো আলম। কিন্তু একটু পরেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে রাস্তার মোড়ে। একটা বিরাট ভিড় জমেছে সেখানে।

দারুণ তেজি মেয়ে, সাহেব। পুলিশ ধরতে এলো তো চট করে গালে ওর চড় বসিয়ে দিলো একটা। এ পাশের ভদ্রলোক ও পাশের ভদ্রলোককে বলছিলেন কথাগুলো। কানে এলো আলমের, তার সাথে একটা ঔৎসুক্যও এসে দানা বাঁধলো মনের ভেতর।

ব্যাপার আবার কি সাহেব। ওরাতো বললো চুরির আসামী, দেখে কিন্তু মনে হলো না। মুখে একটা ভদ্র ভদ্র ছাপ মেয়েটার।

ভদ্র অভদ্র বাছবিচার ছেড়ে দিন সাহেব। সেদিন পুরোনো হয়ে গেছে। এ পাশে ও পাশে জমাট বাঁধা লোকের টুকরো টুকরো কথা। ভিড় ঠেলে আরো একটু এগিয়ে গেলো আলম। আবছা দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। চারপাশে পুলিশের বেষ্টনি। মাটিতে ছড়িয়ে আছে কতগুলো ছাপানে কাগজ।

আপত্তিকর প্রচারপত্র বিলি করছিলো নাকি মেয়েটি। ধরা পড়েছে একটু আগে। পাশের লোকটা ফিসফিসিয়ে বললো, কাকে আরো কি যেন বলছিলো সে। কানে গেলো না আলমের। মাথাটা তখন ভীষণভাবে চক্কর দিয়ে উঠেছে ওর। চোখ দুটো আরজুর শান্ত গম্ভীর মুখের ওপর একান্তভাবে নিবদ্ধ। বৈকালীন সূর্যের রক্তিম আভা তির্যকভাবে গড়িয়ে পড়ছে আরজুর হাতের হাতকড়াটার ওপর আর কেমন চক্‌চক্ করছে ওটা। যেন ওর হারানো বালা দুটো। হঠাৎ মনে পড়লো আলমের। আরজু বলেছিলো– ওর বালা অন্ধকারে পথ দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার।

তাই করেন, হুজুর, তাই করেন। একবাক্যে সায় দিল চাষীরা।

গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবির মনোয়ার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পাগুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু'দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে।

কেউ দিয়েছিল বাগানের শাকসব্জি, কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা।

দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন তিনটে গোরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর। সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী। তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুররা।

কিন্তু পীরকে আনতে হলে টাকার দরকার। পীর সাহেবা কি এমনি আসবেন? তাঁর জন্যে বিশেষ ধরনের পাল্‌কি চাই। আট বাহকের পাল্‌কি। ঘি ছাড়া কোন কিছু মুখেই রোচে না পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার শেষে এক প্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকার।

টাকার চিন্তা করলে তো চলবো না। যেমন কইরা অউক পীর সাহেবের আনতে হইবো। কোমর থিচে বলল জমির ব্যাপারি। পর পর দুইডা বছর ফসল নষ্ট অইয়া গেল, খোদা না করুক, এই বার যদি কিছু অয়, তাইলে যে কোনমতেই জান বাঁচান যাইবো না। শেষের দিকে কান্নায় ভিজে এল জমির ব্যাপারির কণ্ঠস্বর।

পর পর কত বছর বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ওদের! ভরা বর্ষা শুরু হতেই বাঁধটা ভেঙ্গে যায়। আর হড় হড় করে পানি এসে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সমগ্র প্রান্তরটাকে।

কপাল চাপড়িয়ে খোদাকে অনেক ডেকেছে ওরা। অনেক কাকুতি মিনতি ভরা প্রার্থনা জানিয়েছে খোদার দরবারে। কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদা কান দেননি ওদের প্রার্থনায়। নীরব থেকেছেন তিনি। নীরব থাকবো না? খোদা কি আর যার তার ডাকে সাড়া দেয়। গায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করল জমির মুন্সি। খোদার ওলিদের দিয়া ডাকাইলে পর খোদা শুনবো। মন টলবো। তাই কর, পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা।

ঠিক হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবে ওরা। অবশ্য চাঁদা সবাই দেবে। দেবে না কেন? বান ডাকলে তো আর একা রহিম সর্দারের ফসল নষ্ট হবে না, হবে সবার। সবার ঘরেই অভাব অনটন দেখা দেবে। সবাই দুঃখ ভোগ করবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে, যেমন মরেছে গত দু'বছর। কিন্তু মতি মাস্টার যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। চাঁদা চাইতেই রেগে বলল, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির মুন্সি।

তওবা, তওবা, কহেন মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা!

ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়ল জমির ব্যাপারি। পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা।

কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার। কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখা তো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারি। চাঁদা দিলে দিবা, না দিলে নাই, এত বাহাদুরি কথা ক্যান?

কিন্তু বাহাদুরি কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হয় তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল, পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো। এ একটা কতা অইলো? কথা নয় হারামজাদা! জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। আল্লার ওলি, পীর দরবেশ, ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁরা। এই বলে নুহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরি হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতাব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদীজমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছ থেকে কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, এ্যাঁ! খোদার পীরেরে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা। এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানি সুরত দেখে গাঁয়ের ছেলে বুড়োরা অবাক হল। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে। ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই। গরীব মানুষ হুজুর। মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারি। জমির ব্যাপারি বোকা নন। বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে।

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারা রাত চলল তার একটানা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই।

প্রতিবছর এ সময়ে শ্রাবণ মাসের 'ডাত্তর'। কেউ কেউ বলে বুড়ো বুড়ির 'ডাত্তর'। এই ডাত্তরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এ পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায় তাহলে সর্বনাশ। বির্ঘাত বন্যা।

'খোদা, রক্ষা কর। রক্ষা কর খোদা। রহম কর এই অধমগুলোর উপর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন জমির ব্যাপারি। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পীর সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব দুলে দুলে তছবি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাগরেদরা।

মনে আশা জাগে চাষীদের। আনন্দে চকচক করে ওঠে কোটরে ঢোকা চোখগুলো। ভিড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, কই কই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীর নয়! খোদার খাস পীর।

কথাটা মিনু পাটারির কানে যেতে গদগদ হয়ে বলল সে, শুন নাই তোমরা? সেইবার এক বাঁজা মাইয়া পোলারে এক তাবিজে পোয়াতি বানাইয়া দিছিলেন তিনি। শুন নাই?

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আর যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করল কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। ইচ্ছে করলে এই ঝড় বৃষ্টিটাকে এই মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু, থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু, মতি মাস্টার বিশ্বাস করল না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, ঝড় থামাবে ওই বুড়োটি? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?

হ্যাঁ, থামাবে, আলবৎ থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থন করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলারে গা থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই। কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে 'ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বার বার সাবধান করছে। ঢল হইবো, ঢল। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা। রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল!

হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন তিনি, খোদা!

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারি। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়ল ছকু মুন্সির কাঁধের উপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল কে?

ভয় নাই আমি মতি মাস্টার।

ব্যাপার কি? এ রাত্তির বেলা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছকু।

মতি মাস্টার বলল: যাস কনহানে?

যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?

না। স্বল্প থেমে মতি মাস্টার বলল, এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর।

কোদাল দিয়া কি অইবো? রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি।

যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বললো মস্তু শেখ।

এতক্ষণ পুরো দলটার দিকে চোখ পড়লো ছকু মুন্সির। একজন দু'জন নয়, অনেক। অন্তত পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি। মতি মাস্টার এত লোক জোটালো কেমন করে? কাজী বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাস্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?

মতি মাস্টারের কথা শুনে দাঁত-খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি গালাজ করেছিলেন তাকে! সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, এস, মিলাদ পড়তে এস। এস, মঙ্গলের জন্য এস।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালো সে। খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো রশিদ, ছকু।

এই ছকা। ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের, তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা।

ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালো ছকু। খোদা সাবধান করছে তাদের। খবরদার যাইও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইও না মাস্টার। থামো, থামো। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চল সবাই।

ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাস্টার। এখন কথা কবার সময় না। জলদি চল। আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরুদের শব্দ ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরূদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারি, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মতো ঊর্ধ্বে হাত তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, হে রহমানের রহিম! তুমিই সব! তুমি রক্ষা কর আমাদের।

ওদিকে মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাস্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না।

তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙে পড়বে।

হায় খোদা! ঘরের বৌ-ঝিয়ের, করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই তাই তো খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গোরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারি আর ঢুলে ঢুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল!

সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাস্টার। কোদাল চালাও! আরো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে।

এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বললে, আলির নাম নাও ভাইরা, আলির নাম নাও।

আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত।

তারচে একডা গান গাও। গায়ে জোস আইবো।

মন্তু শেখ গান ধরলো।

গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়লো একটা কাছেই কোথায়।

কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাস্টারকে আর তার চৌদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুড়ি মাথায় বিড়বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু, হাত পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাস্টারের গলার শব্দ শোনা গেল, আর ভয় নাই চাঁদ। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে!

এতক্ষণে হাসি ফুটলো সবার মুখে। শান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পূর্ব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালি ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির বেপারি। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি, ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে খেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্য।

ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো, সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙ্গে সাধ্য কি?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল থেকেই মেঘ করছিলো সারা আকাশটা।

দুপুর গড়াতেই বৃষ্টি নামলো জোরে।

বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিলো। আবার কমছিলো রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিলো না। শুধু, দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো। গানের টুকরো টুকরো কলি, অস্পষ্ট তার সুর। তবু বেশ লাগছিলো তাঁর। আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়েছিলেন আনোয়ার সাহেব।

সবেমাত্র ফিরেছেন অফিস থেকে।

একটু পরেই আবার বেরুতে হবে বাইরে। টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা। আজ দেবেন কাল দেবেন করে অনেক ভুগিয়েছেন ভদ্রলোক। এদিকে টাকার ভীষণ দরকার আনোয়ার সাহেবের। পাওনাদাররা তাড়া দিচ্ছে সকাল বিকেল। তার ওপর– হঠাৎ কড়া নড়ে উঠলো জোরে। বাবু চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আধভাঙ্গা চশমাটা ধীরে নাকের ডগায় বসিয়ে দিলেন আনোয়ার সাহেব। হাসিনার চিঠি।

অতি পরিচিত একটা সম্বোধনের পর লিখেছে–

ওগো! এমন করে আর কতদিন দূরে ঠেলে রাখবে আমায়। আজ পুরো একটি বছর হতে চললো প্রায়, বাড়ি আসনি তুমি। একটিবারের জন্যেও তোমায় দেখিনি এ একটি বছর। আগে বছরে কতবার আসতে তুমি, মনে আছে, সেবার খুব ঘন ঘন এসেছিলে। মা বলছিলেন কিরে তমু। এবার খুব তাড়াতাড়ি এলি। অফিস বন্ধ নাকি?

মায়ের প্রশ্নটা মৃদু হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি। রাতের বেলা আমার কানে কানে বলেছিলে, কেন এত ঘন ঘন আসি জানো?

কেন?

তোমায় বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।

হুঁ। মিথ্যে কথা।

কে বললো তোমায় মিথ্যে। বলে আমার চিবুকে আলতো নাড়া দিয়েছিলে তুমি।

কিন্তু, সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছো কেন? একি তোমার অভিমান; না আর কিছু। কিন্তু কেনই বা তুমি অভিমান করবে। আমি তো কোন অন্যায় করেছি বলে মনে হয় না। আর যদি করেই থাকি, তুমি কি ক্ষমা করে দিতে পারো না আমায়। ওগো তোমাকে কেমন করে বোঝাই কত কষ্টে দিন কাটে আমার।

এখানে এসে হঠাৎ থামলেন আনোয়ার সাহেব। যদিও চিঠিটা শেষ হয়নি এখনও। এখনও অনেক অনেক কিছু লেখা আছে তার ভেতর তবু থামলেন তিনি। কেননা ইতিমধ্যেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠছে তাঁর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিটা টেবিলের ওপর বই চাপা দিয়ে রেখে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আনোয়ার সাহেব। কলগোড়ায় গিয়ে চোখেমুখে পানি দিলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে এলেন ঘরে।

কি মনে করে হঠাৎ বাক্স থেকে পুরোনো চিঠিগুলোকে একে একে বের করলেন আনোয়ার সাহেব। গত এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক অনেক লিখেছে।

কিন্তু কেন লিখেছে?

কার কাছে লিখেছে হাসিনা?

আনোয়ার সাহেবের কাছে?

না না, আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার। যদিও সব। তবুও কেউ নন।

হায়রে। হাসিনা যদি জানতো।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে আনোয়ার সাহেবের। চিঠিগুলোকে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ পুরোনো একখানা চিঠির উপর আলতো চোখ বুলোতে থাকেন তিনি। টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টি পাটিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো তা হলে আর বলার কিছুই নেই আমার।

যাক, মানু এখন সব সময় বাবা বাবা বলে ডাকে। যে বাবাকে জন্মের পর থেকে একবারটির জন্যেও দেখেনি। সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে সে। কি আশ্চর্য দেখতো।

পুরোনো চিঠিটাকে খামের ভেতর পুরে রেখে আবার নতুন চিঠিটা হাতে তুলে নেন আনোয়ার সাহেব। মানুর জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা। মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি। কেমন হয়েছে মেয়েটা? সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতই হয়েছে?

মানুর কথা ভাবতে গিয়ে আর একটা মুখের আদল ভেসে উঠলো আনোয়ার সাহেবের চোখের ওপর– সুন্দর গোলগাল একখানা মুখ। প্রশস্ত কপালের ওপর তেলবিহীন উস্কোখুস্কো চুল। মুখভরা খোঁচা দাড়ি; হপ্তায় মাত্র একবার, সেইভ করতো তসলিম।

আনোয়ার সাহেব বকতেন খুব। এ আবার কেমন স্বভাব বলতো। দাড়ি রাখতে হোলে রীতিমত রেখে দাও। আর যদি মুখটাকে ন্যাড়া রাখবারই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে রোজ একবার করে সেইভ করো। এমন মুখভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি– একটা সৌন্দর্যজ্ঞান থাকাও তো দরকার।

বকুনি খেয়ে এরপর কয়দিন ঠিকমতো দাড়ি কামাত তসলিম। চুলে তেলও লাগাতো বেশ পরিপাটি করে।

তারপর আবার সেই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আনোয়ার সাহেব বলতেন আচ্ছা তসলিম। তোমার এ স্বভাবের জন্য বৌয়ের কাছ থেকে বকুনি খাও না তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বকুনি। কথাই বলে না বৌ। বলে মৃদু হাসতো তসলিম। বড় লাজুক মেয়ে কিনা তাই। তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলতো। কবিরা এ রকম একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ই আনোয়ার সাহেব। শুধু আমার বেলা নয়। কবিদের এটা স্বভাব ধর্ম।

তসলিম কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওটাই ছিল ওর একমাত্র নেশা।

আনোয়ার সাহেব ছিলেন ওর কবিতার প্রথম শ্রোতা আর প্রথম সমালোচক। শুনতে না চাইলেও জোর করে শোনাত তসলিম। তবু না শুনলে ক্ষুন্ন হতো সে। মাঝে মাঝে, অভিমানে কথা বলাই বন্ধ করে দিতো সে। মান ভাঙতে আনোয়ার সাহেবের কর্ম সাবাড়। দেখো তসলিম। আমায় শুনিয়ে কি লাভ বলতো। আমি না কবি, না সাহিত্যিক। আমি কি বুঝবো তোমার ও কবিতার। তুমি বলো।

মুখ টিপে হাসতো তসলিম। আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন? একটু চুপ থেকে আবার বলতো সে। পড়বো, শুনবেন?

পড় না, শুনি। বলতেন আনোয়ার সাহেব।

হাত নেড়ে নেড়ে পড়তো তসলিম। পড়তো না ঠিক যেন অভিনয় করতো সে।

পড়া শেষ হলে যদি বলতেন ভালো হয়েছে। তা হলে খুব খুশি হতো তসলিম। আর যদি বলতেন কেমন যেন ভাল লাগলো না আমার। তা হলে মুখ কালো করে বলতো সে, কবিতা বোঝেনই না আপনি।

আনোয়ার সাহেব হাসতেন। কিছু বলতেন না।

কিন্তু আজ দীর্ঘ এক বছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলিমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?

না। আজ বলে নয়। প্রতিদিন, যখনি হাসিনার চিঠি এসেছে তখনই তসলিমকে মন পড়েছে আনোয়ার সাহেবের। বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে যেন। রোগা লিকলিকে ছেলেটার কথা বারবার করে চোখের ওপর ভেসে উঠেছে তাঁর।

বড্ড বেশি কথা বলতে পারতো তসলিম। যতক্ষণ ঘরে থাকতো, ঘরটাকে সরগরম রাখতো সে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে অশান্ত পদক্ষেপে তসলিমকে ঘরময় পায়চারি করতে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন আনোয়ার সাহেব। কি ব্যাপার তসলিম। পাগলের মতো এমন ছুটোছুটি করছো কেন। কি হয়েছে?

কেন। আপনি কিছুই শোনেননি? উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলো তসলিম। ঘাড় নেড়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। কই, না তো। কেন কি হয়েছে? গুলি। গুলি করেছে সাহেব। আর কি হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন।

সে-কি? যেন আকাশ থেকে পড়েছেন আনোয়ার সাহেব।

খুব যে অবাক হচ্ছেন। বানিয়ে বলছি নাকি? গিয়ে একবার দেখে আসুন না। মেডিক্যাল কলেজের সামনে একহাঁটু রক্ত জমেছে। বিবেক বিরুদ্ধ যে কোন কথাকেই বাড়িয়ে বলা তসলিমের স্বভাব ছিলো। কিন্তু তসলিম মিছে কথা বলতো না কোনদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই সব কিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে পারেন নি আনোয়ার সাহেব।

গুলি সত্যিই চলেছিল।

কিন্তু, সে গুলি যে তার পরদিন তসলিমের বুকেও এসে বিঁধবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন আনোয়ার সাহেব?

উঃ। আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলিমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

মাথাটা ভীষণ ধরেছে আনোয়ার সাহেবের। টেবিলের ওপর হাসিনার পুরোনো চিঠিগুলোর দিকে একবার তাকালেন। এ এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক অনেক লিখেছে।

বাড়ি না আসার কি কারণ থাকতে পারে তোমার? আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় আমার ওপর রাগ করেছো তুমি। কিন্তু, তোমার নবজাত শিশু, সেতো কোন অপরাধ করেনি। তাকে দেখবার জন্যেও কি একবার বাড়ি আসতে পারো না তুমি?

মিনুর বিয়ের বয়স হয়েছে। তার বিয়ে শাদির বন্দোবস্ত একটা করতে হবে বইকি। মা তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়ে শাদির বন্দোবস্ত করবে? চিঠিটা মুড়ে আবার খামের ভেতর রেখে দিলেন আনোয়ার সাহেব। দু'হাতের তালুতে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

না না মানু মিনু সবাইকে ভুলে যেতে চান তিনি। ভুলে যেতে চান হাসিনাকে। আম্মাকে। সবাইকে। গোটা পরিবারটাকে। তবু, ভুলতে পারেন কই আনোয়ার সাহেব? যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়ছে ওরা। সারাদিন ওদের কথাই শুধু ভাবেন আনোয়ার সাহেব।

উঃ এ প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি।

স্মৃতিপটে আবার উঁকি মারছে তসলিম। তসলিমের রক্তাক্ত দেহ। কিন্তু, দেহের কথাটা নিছক কল্পনাই করেছেন আনোয়ার সাহেব। গুলিবিদ্ধ তসলিমের রক্তাক্ত দেহটা দেখেননি তিনি। দেখেননি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর। সত্যিই কি মরেছে তসলিম?

একুশের সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। বসে বসে পোস্টার লিখেছে, অসংখ্য পোষ্টার।

পরদিন সকালে যখন বাইরে বেরুচ্ছিলো তখন নিষেধ করেছিলেন আনোয়ার সাহেব। আজ তোমার বাইরে বেরোনো ঠিক হবে না তসলিম। যা মেজাজ তোমার। কি করতে কি করে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে ঘরে বসে বসে ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লিখো। সেটাও একটা কাজ।

সে কথা শুনেও আমল দেয়নি তসলিম। তসলিম বলেছে আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরদিন।

তার পরদিনও না।

থানায় খোঁজ করে দেখেছেন আনোয়ার সাহেব। জেল গেটে খোঁজ করেছেন। খোঁজ করেছেন হাসপাতালে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠেছে আনোয়ার সাহেবের। অশান্ত পদক্ষেপে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শেষে তাঁর এক সহকর্মী বজলু সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন আসল খবরটা। হাইকোর্টের মোড়ে গুলি চলবার সময় তসলিমকে একবার দেখেছিলেন তিনি।

আর দেখেন নি।

আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তসলিমের। তসলিম মারা গেছে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন আনোয়ার সাহেব। এ কি হলো বজলু সাহেব। ওর বৌ পরিবারের কি হবে। ওদের যে কেউ নেই।

কেউ নেই। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন বজলু সাহেব।

না। কেউ নেই। বলেছিলেন আনোয়ার সাহেব। ওর বৌ, মা, বোন ওদের কি হবে বজলু সাহেব?

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

অনেকটা মাতালের মতো টলতে টলতে বাসায় ফিরে এসেছিলেন আনোয়ার সাহেব। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নজরে পড়ছিলো তাঁর ডাক বাক্সে একখানা চিঠি। তসলিমের চিঠি। পরের চিঠি পড়ার অভ্যাস কোনদিনও ছিল না আনোয়ার সাহেবের কিন্তু, সেদিন পড়েছেন।

বহু পরিচিত একটা সম্বোধনের পর, গোট গোট অক্ষরে মেয়েলি লেখা। আজ ক'দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ো। ঘরে চাল, ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা ভাত খাচ্ছি।

চিঠিটা পড়ে মনটা আরো বেশি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আনোয়ার সাহেবের। সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলিমের মৃত্যু খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে? চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদর যে তসলিম মারা গেছে। ওদের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই।

এ আঘাত কি সইতে পারবে ওরা?

মাথার ভেতরটা আবার গরম হয়ে উঠেছে আনোয়ার সাহেবের। সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে হাসিনার চিঠিগুলো। এ ক'বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক অনেক লিখেছে।

সামনে এখনও খোলা আছে ওর শেষ চিঠিখানা।

ওগো, আর কতদিন বাড়ি আসবে না তুমি? তুকি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিন্ত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।

ওগো.....।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ন্যুব্জ দেহ, রুক্ষ চুল, মুখময় বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা।

অনেক আশা ভরসা নিয়েই গিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কিছু টাকা পয়সা সাহায্য পেলে আবার নতুন করে দাঁড় করাবেন স্কুলটাকে। আবার শুরু করবেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ। কত আশা। আশার মুখে ছাই।

কেউ সাহায্য দিলো না স্কুলটার জন্য। না চৌধুরীরা। না সরকার। সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তো রীতিমত ধমকই খেলেন শনু পন্ডিত। শিক্ষা বিভাগের বড় সাহেব শমসের খান বললেন, রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব। অযথা বার বার এসে জ্বালাতন করবেন না আমাদের। পকেটে যদি টাকা না থাকে, স্কুল বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন। এমনভাবে ধমকে উঠেছিলেন তিনি যেন স্কুলের জন্য সাহায্য চাইতে এসে ভারী অন্যায় করে ফেলেছেন শনু পণ্ডিত।

হেঁট মাথায় সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেও; একেবারে আশা হারাননি তিনি। ভেবেছিলেন সরকার সাহায্য দিলে না। চৌধুরী সাহেব নিশ্চয়ই দেবেন। এককালে তো চৌধুরী সাহেবের সহযোগিতা পেয়েই না স্কুলটা দিয়েছিলেন শনু পণ্ডিত।

সে আজ বছর পঁচিশেক আগের কথা–

আশেপাশে দু'চার গাঁয়ে স্কুল বলতে তখন কিছুই ছিলো না।

লেখাপড়া কাকে বলে তা জানতোই না গাঁয়ের লোক।

তখন সবেমাত্র এন্ট্রান্স পাশ করে বেরিয়েছেন শনু পণ্ডিত। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে।

চৌধুরীরও তখন যৌবনকাল। নতুন বিয়ে করা বৌ নিয়ে গাঁয়েই থাকতেন তিনি। গাঁয়ে থেকে জমিদারীর তদারক করতেন। বর্ষার মওসুমে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দক্ষিণের ঝিলে যেতেন বুনো হাঁস আর কালো বক মারতে। অবসর সময় তাস, পাশা আর দাবা খেলতোন বসে বসে। কথায় কথায় গাঁয়ে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছেটা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন শনু পণ্ডিত। জুলু চৌধুরীও বেশ আগ্রহ দেখালেন। বললেন, সেতো বড় ভালো কথা, গাঁয়ের লোকগুলো সব গণ্ডমূর্খ রয়ে যাচ্ছে। একটা স্কুল দিয়ে যদি ওদের লেখাপড়া শেখাতে পারো সেতো বড় ভালো কথা। কাজ শুরু করে দাও। টাকা পয়সা যতদূর পারি সাহায্য করবো।

টাকা পয়সা খুব বেশি কিছু না দিলেও, স্কুলের জন্য একটা অনাবাদী জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন জুলু চৌধুরী। শহর থেকে ছুতোর মিস্ত্রী এনে গুটি কয়েক ছোট ছোট টুল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলও তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র সম্বল দু' টুকরো ধেনো জমি ছিল শনু পণ্ডিতের। সে দুটো বিক্রি করে স্কুলের জন্য টিন, কাঠ আর বেড়া তৈরির বাঁশ কিনেছিলেন তিনি।

ব্যয়ের পরিমাণটা তাঁরই বেশি ছিলো, তবু চৌধুরীর নামেই স্কুলটার নামকরণ করেছিলেন তিনি জুলু চৌধুরীর স্কুল। আটহাত কাঠের মাথায় পেরেক আঁটা চারকোণী ফলকের ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করতো সকাল বিকেল।

আজো করে।

যদিও আকস্মিক ঝড়ে মাটিতে মুখ থুবরে ভেঙ্গে পড়েছে স্কুলটা। আর তার টিনগুলো জং ধরে অকেজো হয়ে গেছে বয়সের বার্দ্ধক্য হেতু।

স্কুলটা ভেঙ্গে পড়েছে। সেটা আবার নতুন করে তুলতে হলে অনেক টাকার দরকার। শনু পণ্ডিত, ভেবেছিলেন, সরকার সাহায্য দিলো না, জুলু চৌধুরী নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু ভুল ভাঙলো। সাহায্যের নামে রীতিমত আঁতকে উঠলেন জুলু চৌধুরী। বললেন, পাগল, টাকা পয়সার কথা মুখেও এনো না কখনো। দেখছো না কত বড় স্টাব্লিশমেন্ট। চালাতে গিয়ে রেগুলার হাঁসফাঁস হয়ে যাচ্ছি। আধলা পয়সা নেই হাতে। এদিক দিয়ে আসছে। ওদিক দিয়ে যাচ্ছে। শনু পণ্ডিত বুঝলেন, গাঁয়ের ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক, তা আর চান না চৌধুরী সাহেব।

কেউই চান না।

না চৌধুরী, না সরকার, কেউ না।

অগত্যা গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ভেঙ্গে পড়া স্কুলটার পাশ দিয়ে আসবার সময় দু'চোখে পানি উপচে পড়ছিলো শনু পণ্ডিতের। লুঙ্গির খুঁটে চোখের পানিটা মুছে নিলেন। গাঁয়ের লোকগুলো উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো তাঁর। ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলো, কি পণ্ডিত, টাকা পয়সা কিছু দিলো চৌধুরী সাহেব।

না, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন শনু পণ্ডিত। চৌধুরীর আশা ছাইড়া দাও মিয়ারা। এক পয়সাও আর পাইবা না তার কাছে থাইকা। সেই আশা ছাইড়া দাও।

পণ্ডিতের কথা শুনে কেমন ম্লান হয়ে গেলো উপস্থিত লোকজন। বুড়ো হাশমত বললো, আমাগো ছেইলা পেইলাগুলো বুঝি মূর্খ থাইকবো। তা, আমার কি কইরবার আছে কও। আমিতো আমার সাধ্যমত করছি। আস্তে আস্তে বললো শনু পণ্ডিত।

বুড়ো হাশমত বললো, তুমি আর কি কইরবা পণ্ডিত। তুতি তো এমনেও বহুত কইরছ। বিয়া কর নাই শাদি কর নাই। সারা জীবনটাই তো কাটাইছ ওই স্কুলের পিছনে। তুমি আর কি কইরবা।

দুপুরের তপ্ত রোদে তখন খাঁ খাঁ করছিলো মাঠ ঘাট, প্রান্তর, দূরে খাসাড়ের মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলো কোন রাখাল ছেলে। বাতাসে বেগ ছিল না। আকাশটা মেঘশূন্য। সবাইকে চুপচাপ দেখে আমিন বেপারি বললো, আর রাইখা দাও লেখাপড়া। আমাগো বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষে কোনদিন লেখাপড়া করে নাই। ক্ষেতের কাজ কইরা খাইছে। আমাগো ছেইলা পেইলারাও তা কইরবো। লেখাপড়ার দরকার নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা-মন্দ কও নাই বেপারি। তাকে সমর্থন জানালো মুন্সি আক্রম হাজী। লেখাপড়ার কোন দরকার নাই। আমাগো বাপ দাদায় লেখাপড়া কারে কয় জাইনতোও না।

বাপ দাদায় জানতোও না দেইখা বুঝি আমাগো ছেইলা পেইলাগুলোও কিছু জাইনবো না। ইতা কিতা কও মিয়া। তকু শেখ রুখে উঠলো ওদের ওপর।

শনু পণ্ডিত বললো, আগের জামানা চইলা গেছে মিয়া। এই জমানা অইছে লেখাপড়ার জমানা। লেখাপড়া না জাইনলে এই জামানায় মানুষের কদর অয় না।

তা তোমরা কি কেবল কথা কইবা না কিছু কইরবা। জোয়ান ছেলে তোরাব আলী অধৈর্য হয়ে পড়লো। বললো, চৌধুরীরা তো কিছু দিবো না তা বুঝাই গেলো। আর গরমেন্টো- গরমেন্টোর কথা রাইখা দাও। গরমেন্টোও মইরা গেছে। এহন কি কইরবা, একডা কিছু কর।

হুঁ। কি কইরবা কর। চিন্তা কর মিয়ারা বিড়বিড় করে বললো শনু পণ্ডিত। বুড়ো হাশমত চুপচাপ কি যেন ভাবছিলো এতক্ষণ। ছেলে দুটো আর বাচ্চা নাতিটাকে অনেক আশা ভরসা নিয়ে স্কুলে দিয়েছিল সে। আশা ছিলো আর কিছু না হোক লেখাপড়া শিখে অন্তত কাচারির পিয়ন হতে পারবে ওরা। গভীরভাবে হয়ত তাদের কথাই ভাবছিলো সে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললো, যতসব ইয়ে আইছে- যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পারোয়া করি না। না গরমেন্টো-ন চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটলো হাশমত।

বুড়ো হাশমতকে কোমরে গামছা আঁটতে দেখে জোয়ান ছেলে তোরাব আলীও লফিয়ে উঠলো। বললো, টিনের ছাদ যদি না দিবার পারি। অন্তত ছনের ছাদতো দিবার পারমু একডা। কি মিয়ারা?

হ-হ ঠিক। ঠিক কথাই কইছ আলির পো। গুঞ্জরণ উঠলো চারদিকে। হাশমত বললো, মোক্ষম প্রস্তাব। ছনের ছাদই দিমু আমরা। ছনের ছাদ দিতে কয় আঁটি ছন লাইগবো? কি পণ্ডিত, চুপ কইরা রইলা ক্যান। কওনা?

কমপক্ষে তিরিশটা লাইগবো। মুখে মুখে হিসেব করে দিলো শনু পণ্ডিত। তকু বললো, ঘাবড়াইবার কি আছে, আমি তিনডা দিমু তোমগোরে। আমি দুইডা দিমু পণ্ডিত। আমরডাও লিস্টি কর। এগিয়ে এসে বললো কদম আলী।

তোরাব বললো, আমার কাছে ছন নাই ছন দিবার পারমু না আমি। আমি বাঁশ দিমু গোটা সাত কুড়ি। বাঁশও তো সাত আট কুড়ির কম লাইগবো না।

হ-হ ঠিক ঠিক। সবাই সায় দিলো ওর কথায়।

দু' দিনের মধ্যে জোগাড়যন্ত্র সব শেষ।

বাঁশ এলো, ছন এলো। তার সাথে বেতও এলো বাঁশ আর ছন বাঁধবার জন্য।

আয়োজন দেখে আনন্দে বুকটা নেচে উঠলো শনু পণ্ডিতের।

এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিলো আমিন বেপারি। সবার যাতে নজরে পড়ে এমন একটা জায়গায় বসে গলা খাঁকরিয়ে বললো সে, জিনিস পত্তরতো জোগাড় করইছ মিয়ারা। কিন্তুক যারা গতর কাইটাবো তাগোরে পয়সা দিবো কে?

হাঁ, তাইতো। কথাটা যেন এক মুহূর্তে নাড়া দিলো সবাইকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন শনু পণ্ডিত। এইডা বুঝি একটা কথা অইলো। নিজের কাম নিজে করমু, পইসা আবার কে দিবো? বলে বাঁশ কেটে চালা বাঁধতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, নাও–নাও মিয়ারা শুরু কর।

হুঁ। শুরু কর মিয়ারা। বললো তকু শেখ।

স্কুলের খুঁটি তৈরির জন্য লম্বা একটা গাছকে খাল পার থেকে টেনে নিয়ে এলো তোরাব। হুঁ, টান মারনা মিয়ারা। টান মার।

হুঁ। মারো জোয়ান হেঁইয়ো–সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। টান মার। টান মার।

আস্তে আস্তে। এত তড়বড় কোরলে অয়। বললো বুলির বাপ।

হুঁ। কামের মানুষ হেঁইয়ো। আপনা কাম, হঁইয়ো। টান টান। মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো। হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো তোরাব আর তকু।

হাসলো সবাই।

খক্‌খক্‌ করে কেশে নিয়ে বুড়ো হাশমত বললো, মরা গরমেন্টো কইলা না মিয়ারা। মরা গরমেন্টো কইলা না?

হুঁ। মরা গরমেন্টো হেঁইয়ো।–গরমেন্টোর লাশ হেঁইয়ো। টান টান। করম মাঝি চুপ করেছিলো এতক্ষণ। বললো, ফুর্তিছে কাম কর মিয়ারা। আমি সিন্নি পাকাইবার বন্দোবস্ত করিগা।

বাহ্‌বা মাঝির পো, বাহ্‌বা। চালাও ফুর্তি। কলকণ্ঠে চিৎকার উঠলো চারদিক থেকে।

পাটারী বাড়ির রোগা লিকলিকে বুড়ো কাদের বক্সটাও এসে জুটেছে সেখানে। তাকে দেখে আমিন বেপারি ভ্রু কোঁচকাল। কি বাক্স আলী। সিন্নির গন্ধে ধাইয়া আইছ বুঝি? কয় দিনের উপাস?

যত দিনের অই : তোমার তাতে কি। বেপারির কথায় ক্ষেপে উঠলো কাদের বক্স। এত দেমাক দেহাও ক্যান মিয়া। উপাস ক্যাডা না থাকে। তুমিও থাক। সক্কলে থাকে।

ঠিক ঠিক। তকু সমর্থন করলো তাকে। চৌধুরীরা ছাড়া আর সক্কলেই এক আধ বেলা উপাস থাকে। এমন কোন বাপের ব্যাটা নাই যে বুক তাবড়াইয়া কইবার পারবো–জীবনে একদিনও উপাস থাকে নাই–হ। তকু আর কাদেরের কথায় চুপসে গেলো আমিন বেপারি।

তোমাব বললো, কি মিয়ারা, কিতা নিয়া তর্ক কর তোমরা। বেড়াটা ধর। টান মার।

হুঁ। মার জোয়ান হেঁইয়ো–চৌধুরীর লাশ হেঁইয়ো–মরা চৌধুরী হেঁইয়ো। আহহারে চৌধুরী রে! খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সবাই এক সাথে।

আক্রম হাজী রুষ্ট হলো ওদের ওপর। এত বাড়াবাড়ি ভালা না মিয়ারা। এত বাড়াবাড়ি ভাল না। এহনও চৌধুরীর জমি চাষ কইরা ভাত খাও। তারে নিয়া এত বাড়াবাড়ি ভালা না।

চাষ করিতো মাগনা চাষ করি নাকি মিয়া। তোরাব রেগে উঠলো ওর কথায়। পাল্লায় মাইপা অর্ধেক ধান দিয়া দিই তারে।

পাক্কা অর্ধেক। বললো কাদের।

সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি হয়ে গেলো স্কুলটা।

শেষ বানটা দিয়ে চালার উপর থেকে নেবে এলেন শনু পণ্ডিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লম্বা স্কুলটার দিকে তাকাতে আনন্দে চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো কর্ম ক্লান্ত চোখগুলো।

সৃষ্টির আনন্দ।

বিড়িতে টান মেরে কদম আলী বললো, গরমেন্টোর আর চৌধুরীরে আইনা একবার দেখাইলে ভালা অইবো পণ্ডিত। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি আমরা।

হ–হ! তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি। ঘাড় বাঁকালো শনু পণ্ডিত। একটু দূরে সরে গিয়ে বটগাছটার নিচে বসতেই কাঠের ফলকটার দিকে চোখ পড়লো তকু শেখের। আট হাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক আঁটা ফলক। তার ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জ্বলজ্বল করে সকাল বিকেল।

ওইটা আর এইহানে ক্যান? বললো তকু শেখ। ওইটারে ফালাইয়া দে। ফালাইয়া দে ওইটা। ভাসাইয়া দে ওইটারে খালের ভিতর। তোরাব আলী বললো, ভাসাইয়া দে খালে; চৌধুরী খালে ভাসুক। হঠাৎ কি মনে করে আবার নিষেধ করলো তোরাব। থাম–থাম ফালাইস না। ইদিকে আন।

কালো চারকোণী ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেললো তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কন্ধে থেকে একটা কাঠ কয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কি যেন লিখলো সে ফলকটার ওপর।

শনু পণ্ডিত জিরোচ্ছিলো বসে বসে। বললো, ওইহানে কি লেইখবার আছে আলীর পো। কিতা লেইখবার আছে ওইহানে?

পইড়য়া দেহ না পণ্ডিত, আহ পড়ইয়া দেহ। আট হাত লম্বা কাঠের ওপর পেরক আঁটা ফলকটাকে যথাস্থানে গেঁড়ে দিলো তোরাব।

অদূরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে মৃদুস্বরে পড়লেন শনু পণ্ডিত। শনু পণ্ডিতের ইসকুল। পড়েই বার্ধক্য জর্জরিত মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো তাঁর। বিড়বিড় করে বললেন, ইতা কিতা কইরছ আলীর পো। ইতা কইরছ?

ঠিক কইরছে। একদম ঠিক। ফোকলা দাঁত বের করে মৃদু হাসলো বুড়ো হাশমত।

লজ্জায় তখন মাথাটা নুয়ে এসেছে শনু পণ্ডিতের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাশটাকে ধরাধরি করে উঠোন থেকে ঘরে নিয়ে এলো ওরা।

তারপর আস্তে শুইয়ে দিলো মেঝের উপর।

বাইরে তখন সন্ধ্যার আস্তরণে কালো রাত নেমে এসেছে ঘন হয়ে। শিয়রে দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে চক্রাকারে বসলো ওরা, লাশটাকে ঘিরে। কারো মুখে কথা নেই, সবাই চুপচাপ। কাঁপা হাতে ওর রক্তভেজা বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে আনলো শমসের আলী, একখানা চিঠি, আর একখানা ফটো।

কার ফটো ওটা? কাঁধের উপর দিয়ে মুখ গলিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো রহমান, কার ফটো?

ওর ভাবী বধূর, আস্তে করে বললো শমসের আলী, এ মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল ওর, আসছে বৈশাখে–।

ওটা রেখে দাও, বুক পকেটেই রেখে দাও ওটা। কে যেন বললো আশ্চর্য মৃদু গলায়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা পাড়ায়। আর দল বেঁধে ওকে দেখতে আসছিলো সবাই। দোরগোড়ায় জুতোগুলো নিঃশব্দে খুলে রেখে ভেতরে ঢুকছিলো ওরা, যেন দেব দর্শনে এসেছে। দুটো মেয়ে এসে নীরবে বসলো ওর পায়ের কাছে।

আর একজন বসলো শিয়রের পাশে।

বুড়ো সুরেন উকিলের ছোট মেয়েটা হঠাৎ তার কানে আঙুলটা কেটে রক্ত তিলক বসিয়ে দিলো ওপর পাণ্ডুর কপালে।

বাকি দু'জন পরম স্নেহভরে চুলের প্রান্তভাগ দিয়ে মুছে দিলো ওর পায়ের ধুলোগুলো। আর সবাই নির্বাক নিস্পন্দন।

ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে মৃদু। ক্ষয়ে আসা মোমবাতি দুটোর জায়গায় আরো দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিলো শমসের আলী।

বুড়ো সগির মিয়া ঈশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল রহমানকে।

কবর দেবার কোন বন্দোবস্ত কিছু হয়েছে?

হচ্ছে।

গোরস্তানে কখন নিয়ে যাবে ওকে?

ভোরে।

কাপড় চোপড় কেনা হয়েছে?

না।

তবে, এই নাও, টাকা নাও, কাপড় কেনার জন্য পকেট থেকে পাঁচটে টাকা বের করে দিলো সগির মিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরেন উকিল দিলো আরও পাঁচটে টাকা।

ঝগড়াটে পল্টুর মা, হাড়কেপ্পন বলে যার পাড়াময় খ্যাতি, সেও দুটো টাকা গুঁজে দিলো রহমানের হাতে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ফজল শেখ উজার করে দিলো ওর সারা দিনের পুরো রোজগারটা।

রহমান বললো, এত টাকা দিয়ে কি হবে?

ফজল শেখ বললো, ওর জন্য ভালো দেখে একটা কাপড় কিনো। দেখো, মিহি হয় যেন, বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।

আর দেখো, আতর আর কর্পূর একটু বেশি পরিমাণে কেনা হয় যেন। চোখ দুটো পানিতে ছলছল করে উঠলো সগির মিয়ার।

কিইবা সামর্থ্য আছে আমাদের। আমরা কিইবা করতে পারি ওর জন্য। ঘর আর বাহির।

বাহির আর ঘর।

সারা রাত এক লহমার জন্যও ঘুমালো না ওরা।

ঘুম এলো না ওদের, রাত জেগে বসে বসে হয়ত গত বিকেলটার কথাই ভাবছিলো ওরা।

অস্তগামী সূর্যের তির্যক আভায় আকাশের সাদা টুকরো টুকরো মেঘগুলো রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলো তখন। কাঠের লম্বা বারান্দাটার এপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বুড়ি দাদী তার বার বছরের নাতনীকে সে মেঘগুলো দেখাচ্ছিল আর বলছিলো, ও মেঘগুলো লাল কেন জান? ও- মা জান না বুঝি? তা জানবে কেন। আজকালকার মেয়ে কিনা; ধর্মকথাতো পড়ওনি; শোনও না। হোসেন কে চেন? হজরত আলীর ছেলে হোসেন। এজিদ তাঁকে অন্যায়ভাবে খুন করেছিলো কারবালায়, বড় কষ্ট দিয়ে খুন করেছিলো তাঁকে। সেই হোসেনের পাক রক্ত, রোজ বিকেলে জমাট বেঁধে দেখা দেয় পশ্চিমাকাশে বুঝলে?

নিচে, কলতলায় তখন পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলো গুটি আটেক মেয়েমানুষ। পল্টুর মা তার মোটাসোটা দেহটা দেখিয়ে বারবার শাসাচ্ছিলো বাকি সবাইকে। আর আপন মনে বকবক করছিলো একটানা।

দোতলার কোণের ঘরে অফিস ফেরত বাবুরা তাস নিয়ে বসেছিলো সবে। পাশের ঘরে টেকো মাথা রহমানটা রোগা লিকলিকে বৌটাকে মারছিলো তখন। রোজ যেমনটি মারে।

সামনের বাড়ির বুড়ো উকিলের তন্বী মেয়েটা সেতারে ইমন কল্যাণের সুর ছড়াচ্ছিলো মৃদু।

বেশ কাটছিলো বিকেলটা।

রোজ যেমনটি কাটে।

ছেদ পড়লো অকস্মাৎ।

পশ্চিমমুখো লম্বা দোতালা বাড়ির বাসিন্দাদের চমকে দিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো একটা লোক। পেছনে আরো তিনজন। কাকে যেন ধরাধরি করে এনে নিঃশব্দে উঠোনে নামিয়ে রাখলো ওরা।

পাংশু মুখ; বাকহীন।

কলগোড়ায় যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাই আর্তনাদ করে উঠলো সবার আগে। আ-হা-হা কার ছেলেগো! কার ছেলে এমন করে খুন হলো! আ-হা-হা কার ছেলেগো!

কোন মায়ের বুক খালি হলো গো। কার ছেলে খুন হলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝগড়াটে পল্টুর মা এক পা দু পা করে এগিয়ে এলো সামনে।

কেমন করে মরলো গো ছেলেটা; আঁ? কেমন করে মরলো?

লোকগুলো তখনো চুপচাপ।

দোতলায় যারা ছিলো তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে নিচে।

মৃত লোকটাকে ঘিরে তখন একটা ছোটখাট জটলা বেঁধে গেছে উঠোনে। রক্তাক্ত মৃতদেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে উঠলো এল, ডি, ক্লার্ক শমসের আলী। হায় খোদা, একি করলে, এ যে আমাদের নূরুর ছেলে শহীদ।– কেমন করে মরলো?

কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলো না লোকগুলো।

টিকো মাথা রহমান বললো, আরে– তাইতো এ যে দেখছি শহীদ, আপনার রুমেইতো থাকতো ও শমসের সাহেব। তাই না?

হাঁ, ও আমার রুমেই থাকতো। আস্তে বললো শমসের আলী। তার আবার ওকে বয়ে নিয়ে আসা লোকগুলোর দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। এ যে রক্তে চপচপ করছে। কেমন করে মরলো?

চারজন লোকের একজন গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো আস্তে। ফিরে এসে চাপা গলায় ফিসফিস করে কি যেন বললো সে সবাইকে।

সে কি? চাপা আর্তনাদ কান্নার মত শোনা গেলো। একসাথে আঁতকে উঠলো দোতলা বাড়ির বাসিন্দারা। সে কি?

ট্যাক্সি ড্রাইভার ফজল শেখ বললো সে কি, কে গুলি করতে গেল ওকে। কেন গুলি করলো?

আবার এজিদ নাজেল হলো নাতো দুনিয়ার ওপর? বুড়ি দাদী বিড়বিড় করে উঠলো।

তারপর এক সীমাহীন নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সবাই। ফেকাশে বিবর্ণ চোখগুলো তুলে পরস্পরের মুখ চাওয়া–চাওয়ি করলো ওরা। তারপর আবার তাকালো মাটিতে। শোয়ান রক্তলাল মৃতদেহটার দিকে।

কালো, মুখচোরা ছেলেটা বছর খানেকের উপর থেকেই ছিলো এ বাড়িতে। থাকতো। খেতো। কলেজে যেতো।

কই, কোনদিনও তো চোখে পড়েনি কারো।

পড়বেই বা কেমন করে। বাহাত্তর গেরস্তের বাড়িতে কত লোক আসে, কত লোক যায়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সব সময়। কিন্তু, অকস্মাৎ আজ সবাই এক অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করলো ওই ছেলেটার সাথে। বেদনার্ত চোখ তুলে সবাই তাকালো ওর দিকে।

সারারাত তাকালো ওরা।

ভোরে গরম পানিতে ওর লাশটাকে ধুইয়ে যখন খাটের ওপর শোয়ান হলো, তখন সারা উঠোনটা গিজগিজ করছে লোকে।

পাড়ার ছেলেরা একটা লম্বা বাঁশের ডগায় পতাকার মতো ঝুলিয়ে নিয়েছে ওর রক্তে ভেজা জামাটা। ওটা ওরা বয়ে নেবে শবযাত্রার পুরোভাগে। বুড়ো সগির মিয়া বলছিলো, ওকে আমরা গোরস্তান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। বড় রাস্তায় ট্রাকভর্তি মিলিটারি আর পুলিশ দেখে এলাম। মাঝ পথে হয়তো ছিনিয়ে নেবে ওরা।

আমরা দেবো কেন? দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো ছেলেরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন কেউ এখানে নেই ওর।

মা বাবা হয়ত ভাবছেন ছেলে তাদের নিরাপদেই পড়ালেখা করছে এখন। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ি আসবে। কোলের মানিক ফিরে আসবে কোলে। শেষ দর্শনের জন্য মুখের বাঁধনটা খুলে দেয়া হলো ওর।

পল্টুর মা, ঝুঁকে পড়ে চুমো খেলো ওর কপালে। তারপর চোখে আঁচল চেপে সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

বুড়ি বিড়বিড় করে বললো। হায় খোদা, এজিদের গোষ্ঠি বুঝি এখনও দুনিয়ার ওপর রেখে দিয়েছ তুমি। হায় খোদা!

আহা মা যখন মউতের কথা শুনবে– তখন কি অবস্থা হবে মা'র। বললো আর একজন।

মৃতের খাটটা কাঁধে তোলা নিয়ে কাড়াকাড়ি হলো কিছুক্ষণ।

ছেলেরা বললো, আমরা নেবো।

বুড়োরা বললো, আমরা।

শেষে রফা হলো। ঠিক হলো মিনিট দশেকের বেশি কেউ রাখতে পারবে না। শ'খানেক লোক পাড়ার। সবাইকে সুযোগ দিতে হবে তো!

খাটে শোয়ান শহীদকে নিয়ে যখন রাস্তায় নামলো ওরা। সূর্য তখন বেশ খানিকটা উঠে গেছে উপরে।

সবার সামনে বাঁশের ডগায় ঝোলান রক্তাক্ত জামা হাতে সুরেন উকিলের ছোট মেয়ে শিবানী। তার দু'পাশে হোসেন ডাক্তারের দুই নাতনী। রানু আর সুফিয়া। ওদের যেতে নিষেধ করছিলো অনেকেই। তবু জিদ ধরেছে ওরা– ওরা যাবেই।

যাক। যেতে চাইছে যখন যাক না, কি আছে। বলেছিলেন বুড়ো সগির মিয়া।

মিছিলটা তখন ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল সরু গলি বেয়ে।

আর গলির দু' পাশের জানালা, ছাদ আর বারান্দা থেকে মেয়েরা–মায়েরা দু'হাতে কোঁচড় ভরা ফুল ছুঁড়ে মারছিলো ওর খাটিয়া লক্ষ্য করে। চামেলি। গোলাপ। রজনীগন্ধা।

ফুল আর গোলাপজল।

গোলাপজল আর ফুল।

ফুলে ফুলে আগাগোড়া ঢেকে গেলো শহীদ। ফুলের নিচে ডুবে গেলো ওর লাশটা। দোতলা বাড়ির সংকীর্ণ বারান্দা থেকে ফুল ছুঁড়ে মারতে মারতে আশ্চর্য মৃদু গলায় কে যেন বললো, আমাদের ভাষাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিয়েছে ও।

আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে। বললো আর একজন।

কথাটা কানে আসতেই বোধ হয়; অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো এল, ডি, ক্লার্ক শমসের আলী। দু'চোখে অশ্রুর বান ডাকলো ওর।

ছি, শমসের ভাই কাঁদছো কেন। এ সময় কাঁদতে নেই। মৃদু তিরস্কার করলো ওকে ফজল শেখ।

ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে শমসের আলী বললো, বড় হিংসে হচ্ছে– বড় হিংসে হচ্ছে, ফজলুরে আমি কেন ওর মত মরতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুনুর স্বামীকে' দেখে এমনভাবে চমকাতে হবে তা কে জানতো।

তবু চমকেছিলাম, ভীষণভাবেই চমকে উঠেছিলাম হয়তো।

কাল রাতে যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন বাইরে শীত পড়ছিলো ভীষণ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসের বরফ ঝরছিল যেন। কোটের কলারটা তুলে দিয়েও কানটা ঢাকা যাচ্ছিলো না। উদলা হাত জোড়া জমে আসতে চাইছিলো শীতের প্রকোপে। স্টেশনে লোকজনের বিশেষ ভিড় ছিলো না। মাঝে মাঝে দু' একজন চা ভেণ্ডারের চিৎকার ছাড়া সাড়াশব্দও তেমন ছিলো না বললেই চলে। ব্যস্তভাবে হয়ত একটা কুলির জন্যই তাকাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক, ঘন কুয়াশা ভেদ করে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। পরনে একটা খাটো করে পরা লুঙ্গি। মাথা আর কান ঢেকে গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ান। পায়ে একজোড়া মোটর টায়ারের স্যান্ডাল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুটকেসটা হাতে আর হোল্ডারটা বগলে তুলে নিল ও। উঃ কি ভীষণ কুয়াশা পড়েছে। আসুন সাহেব; দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন। আরো মাল আছে নাকি? না, চলো। লোকটার আগাগোড়া আর এক পলক তাকিয়ে নিয়ে পিছু পিছু এগুতে লাগলাম ওর।

গেটের কাছাকাছি এসে লোকটা ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন সাহেব?

আপাতত ডাকবাংলোয়। --এই শোন- রিক্সা টিক্সা পাওয়া যাবেতো এখন?

হ্যাঁ, আমার নিজেরই রিক্সা আছে। ও বললো। আর বলতে গিয়ে বারকয়েক কাশলো ও।

মফস্বল শহর।

স্টেশনের সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলে বিজলী বাতির আর কোন বন্দোবস্ত নেই। সামনের ছোট্ট কেরোসিন বাতিটার উপর নির্ভর করেই চলে রিক্সা। দোকানপাটগুলো খোলা থাকলে তবু কিছু আলো আসে রাস্তায়। কিন্তু এ পৌণে বারোটায় দোকানপাট বন্ধ করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার মালিকরা। লোকজন কারো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দু' একটা হ্যাংলা কুকুর মাঝে মাঝে চিৎকার করছে এখানে ওখানে। রাস্তাগুলো সব গর্তে ভরা। প্রতি গজ অন্তর একটা করে খাদ। এসব রাস্তায় রিক্সা চালাতে শুধু রিক্সা চালকেরই কষ্ট হয় না। আরোহীরও গা-হাত পা ব্যথা করে উঠে। বিরক্তি লাগে।

ইস রাস্তাগুলোর এই দুরবস্থা কেন? কেন যেন হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠেছিলাম।

লোকটা একবার পেছনে তাকিয়ে নিয়ে বললো। বন্যায় সব ডুবে গিয়েছিল কিনা, তাই খাদ পড়ে গেছে।

তা- বন্যাতো কবে নেমে গেছে, এখন মেরামত করে নিলেই পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে করবে মেরামত–। হঠাৎ যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল লোকটা। রিক্সা থামিয়ে নিভে যাওয়া বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে আবার চড়লো রিক্সায়।

ডাকবাংলোটা স্টেশন থেকে বেশি দূর নয়।

পৌঁছতে মিনিট বিশেক সময় নিয়েছিল মাত্র।

লোকটা নিজ হাতেই সুটকেস আর হোল্ডারটা তুলে রাখলো বারান্দায়।

তারপর বললো, আপনি দাঁড়ান। দারোয়ান বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডেকে আনি।

শীতের রাতে একবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়লে সহজে উঠতে চায় না কেউ, তুলতে বেশ সময় নিয়েছিলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছিলো এমন আয়েশের ঘুমটা ভেঙ্গে যাওয়ায় মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সে। তবু সে ভাবটা গোপন রেখে লম্বা একটা সালাম জানিয়ে মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে গেলো দারোয়ান।

রিক্সাওয়ালাটা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

কত দিতে হবে তোমায়? পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে যাই তার দিকে।

ও বললো, আপনার সাথে আর কি দরাদরি করবো। আপনার যা খুশি তাই দিন।

সে কি হয়। কত রেট তা না জানালে আন্দাজে কি দেবো আমি। আপনার যা খুশি তাই দিন। আগের কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলো সে। ব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে হাতে তুলে দিলাম তার। এই নাও। হলতো?

জ্বী হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে সায় দিলো সে কথার। তারপর সালাম জানিয়ে গুটিগুটি পায়ে রিক্সাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো ধীরে।

অদূরে দাঁড়ান দারোয়ানটা এতক্ষণ দেখছিলো সব। ও চলে যেতে এগিয়ে এসে বললো, এ–বাবু। ইস্টেশনছে এঁহা চার আনা লেতা। আওর আপ একঠু আঠান্নি দে দিয়া উসোকো। এ–হে বহুত জাস্তি দে দিয়া আপ। বহুত জাস্তি। চার– চার আনা পয়সা। আপন মনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চার আনা পয়সার জন্য আপসোস করছিলো সে। ওর কথায় কান না দিয়ে, যেখানে শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেখানে এসে ঢুকলাম। পথেই জংশনে খেয়ে এসেছিলাম। তাই রাতে আর খাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলো না। শোবার আগে আগামী দিনের করণীয় বিষয়গুলো ঠিক করে নিয়েছিলাম মনে মনে। ভোরে উঠেই হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করে সরাসরি কাজগুলো সেরে নিতে হবে। এস, ডি–ওর সাথে দেখা করতে হবে। সার্কেল অফিসারের সাথে আলোচনা করতে হবে টাকা–পয়সার ব্যাপার নিয়ে। তারপর দুপুরে টুনুর বাসায়।

দীর্ঘ আট বছর পর কাল হঠাৎ দেখতে পেয়ে হয়ত প্রথমে চিনতেই পারবে না টুনু। অবাক হয়ে মুখের পানে তাকিয়ে বলবে, কাকে চান? পরে চিনতে পেরে হয়ত আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলবে। উঃ এতদিনে বুঝি টুনুর কথা মনে পড়ল তোমার। এই দীর্ঘ আট বছর পরে?

দীর্ঘ আট বছর।

জীবনের মানচিত্রে আটটি বছর নেহায়েৎ কম নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও ভাবতে গেলে মনে হয় এই সেদিনের কথা।

কোলকাতায় একই পাড়াতে থাকতাম। পাশাপাশি বাসা।

টুনু তখন শাখাওয়াতে পড়তো ক্লাস সিক্সে কি সেভেনে।

আমি পড়তাম মিত্রয়। ওই একই ক্লাসে।

স্কুল ছুটির পর বিকেলে প্রায় ওদের বাসায় যেতাম।

ওরাও আসতো মাঝে মাঝে।

আনাগোনা মিলমিশ আর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিলো উভয় পরিবারের মধ্যে। আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখলেই বুড়ি দাদী ফোড়ন কাটতো।

কি গো, কি কথা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। পিরীত টিরিত নয়তো। তাইলে বলো। এখন থেকেই ওকালতি শুরু করে দিই।

তারপর ক্লাস এইটের বছর সে পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় উঠে গেলো টুনুরা। আর তার মাস আটেক পরেই তো শোনা গেলো; একটা ননম্যাট্রিক ছেলের সাথে কোথায় পালিয়ে গেছে টুনু। পালিয়ে গেছে– খবরটা প্রথমে মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে অবশ্য বিশ্বাস না করে পারিনি। এরপর মাঝখানে দু'টি বছর।

দু'বছর পর হঠাৎ টুনুর সাথে দেখা ট্রেনে। দেশ বিভাগের পর কোলকাতা থেকে ঢাকা আসবার পথে।

দেখা হতে মৃদু হাসলো টুনু। বললো। কেমন আছ ভালতো?

ভালো। তুমি কেমন?

আমি বে–শ ভালো। ঠোঁট টিপে হেসেছিল টুনু। আরো অনেক কথার পর হাতে একটা ঠিকানা গুঁজে দিয়ে বলেছিলো, মফস্বল শহরেই আছি। সময় পেলে একবার এসো। কেমন?

সময়ও হয়নি, আসতেও পারিনি কোনদিন।

এবার হঠাৎ সরকারী কাজে এখানে আসতে হওয়ায়; আসবার পথেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম টুনুর সাথে একবার দেখা করবো। কে জানে এ ক'বছরে কত পরিবর্তন এসেছে ওর দেহে–মনে চেহারায়।

পরদিন খুব ভোরে ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করলাম।

সরকারী কাজগুলো সেরে নিলাম একে একে।

তারপর ঠিকানাটা পকেটে গুঁজে টুনুর খোঁজে।

সার্কেল অফিসের পিওনটাকে বলতে ও বললো, পাড়াটা আমি চিনি। চলুন না স্যার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কতদূর হবে পাড়াটা?

বেশি দূর নয় স্যার। আসুন না আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

বেশি দূর নয় বললেও বেশি দূরই মনে হলো। ঠিকানাটা মিলিয়ে বাসার সামনে পৌঁছে দিয়ে পিয়নটা চলে গেলো। বলে গেলো। এইতো এই বাসা স্যার। আমি এখন যাই তাহলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও। ওকে যেতে বলে সামনে এগিয়ে গেলাম।

বাঁশে ঘেরা দেয়া মাঝারি গোছের একটা ঘর। ওপরে টিনের চালা। সামনে স্বল্প পরিসর। দু'তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাটি নিয়ে খেলা করছে সেখানে। আমায় দেখে, মুখে আঙ্গুল পুরে হা করে আমার দিকে তাকালো ওরা। বয়সে যে সবার চাইতে বড় সে এগিয়ে এসে বললো, কাকে চাই? মুখের আদলটা তার টুনুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বললাম, এটা কি তোমাদের বাসা খোকা?

হ্যাঁ।

তোমার মা বাসায় আছেন?

হ্যাঁ আছেন। কেন কি চাই আপনার? অনেকটা মাতব্বরি চালেই জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা। মৃদু হেসে বললাম, দরকার আছে, তুমি যাওতো খোকা ভেতরে গিয়ে তোমার মাকে বলো তোমার সালাম মামা এসেছে।

এ কথায় একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো ছেলেটা। তারপর বললো। আচ্ছা আপনি দাঁড়ান। আমি খবর দিচ্ছি মাকে। বলে ভেতরে চলে গেলো সে।

একটু পরেই চট ঝোলান দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি মারলো টুনুর মুখ।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

তারপর খলখলিয়ে উঠলো টুনু। আরে সালাম তুমি, কি ভাগ্যি আমার। এসো এসো, ভেতরে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে এসো। অনেকটা হাত বাড়িয়ে ভেতরে এগিয়ে নিলো টুনু। কইরে বিনু। মামা এসেছে তোর, একটা মোড়া এনে বসতে দে। কইরে বিনু শুনছিস। মেয়েটা গেলো কই? মেয়ের কোন সন্ধান না পেয়ে নিজ হাতেই পাশের ঘর থেকে একটা মোড়া এনে আমায় বসতে দিলো টুনু। চোখ বুলিয়ে প্রথমে ঘরটাকেই দেখলাম। তারপর খুঁটে খুঁটে দেখলাম টুনুকে।

সত্যি, এ ক'বছরে অনেক বদলে গেছে টুনু। সেদিনের সেই তন্বী মেয়েটি আর নেই। ফর্সা রংটা তামাটে হয়ে গেছে। গোলগাল চেহারাটা গেছে ভেঙ্গে। কানের কাছের দু'একটা চুলে পাকও ধরেছে টুনুর।

তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ টুনু বললো, কি দেখছো অমন করে?

তোমায় দেখছি টুনু। পরক্ষণেই জবাব দিলাম। সত্যিই তুমি অনেক বদলে গেছো।

তাই নাকি? টুনু মুখ টিপে হাসলো। তা বদলাবো না তো কি সারা জনম এক রকম থাকবো নাকি। বয়স হচ্ছে না? স্বল্পকাল থেমে আবার বললো, ভাগনে ভাগনীও তোমার কম হয়নি। মোট চারজন।

কই ওরা কোথায়, ওদের কাউকে তো দেখছি না।

ওরা কি আর এক মিনিটের জন্য ঘরে থাকে। সারাটা দিন পঁই পঁই করে ঘুরে বেড়ায় পাড়ার বখাটে ছেলেগুলোর সাথে। বলে ছেলেমেয়েদের খোঁজেই হয়তো বাইরে বেরিয়ে গেলো টুনু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে বসে অতীতের কথাই ভাবছিলাম।

টুনু ফিরে এলো একটু পরে। সাথে একটা সাত আট বছরের ময়লা ফ্রক পরা মেয়ে আর দুটো ছেলে। মেয়েটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে টুনু হেসে বললো, এই দেখো এটা হচ্ছে এক নম্বর। ডাক নাম বিনু। আসল নাম রেখেছি মনোয়ারা আর এটা হচ্ছে মেজ ছেলে। এটা সেজ। বড়টা কোথায় গেছে। দাঁড়াও না আসুক ফিরে। পিঠের চামড়া তুলে ফেলবো আজ। বোঝা গেল টুনু রেগেছে। আগে রাগলে খুব সুন্দর দেখাতো ওকে। আজ কিন্তু তেমন কিছু মনে হলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কর্তা কোথায়?

কর্তা। তার কথা বল কেন ভাই, লোকটার কি শান্তি আছে। এইতো সেই সকালে বেরিয়ে গেছে কাজে। পোস্টাফিসে পিয়নের কাজ। জানতো ও কাজে কত খাটুনি। দুপুরে একবার শুধু আসে খেতে। তারপর খেয়েদেয়ে আবার বেরুবে। ফিরতে ফিরতে সেই রাত নিশুতি। টুনু থামলো। কিছুক্ষণ বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো চুপচাপ। তারপর আবার বললো, কি ব্যাপার, তুমি এক কাপড়ে এসেছো, নাকি, মালপত্র সাথে কিছু নেই?

এর উত্তর দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে হলো বই-কি। মাটিতে চোখ নামিয়ে সত্য কথাটাই শেষে বললাম।

আর তা শুনে বড় অবাক হলো টুনু। সে কি। আমি থাকতে এখানে, তুমি উঠেছো ডাকবাংলায়। সে কি।

লজ্জায় লাল হয়ে এলাম। কিছু বললাম না।

টুনুও যেন এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইল না। স্বল্পকাল নীরব থেকে বললো। যে ক'দিন আছো, খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু এখানেই করো। বলে উঠে দাঁড়াল টুনু। মোড়টা নিয়ে পাকঘরে এসো, চুলোর উপর ভাত চড়িয়ে এসেছি। এসো, ওখানে বসে গল্প করা যাবে তোমার সাথে।

পাক ঘরে এসে রাজধানীর কথা জিজ্ঞেস করলো টুনু। কে কোথায় আছে। কেমন আছে। এমনি আরও অনেক কথা।

তারপর পাড়লো নিজের কথা। শরীরটা দেখছো না কেমন দিন দিন ভেঙ্গে যাচ্ছে। রোগে ধরেছে আজ তিন বছর। এখানে ভালো ডাক্তার নেই। একবার ভাবছিলাম তোমার ওখানে গিয়ে চিকিৎসা করাবো। কিন্তু, যাবার কি কোন জো আছে। তিন চারটে ছেলে-মেয়ে ঘরে। ওদের কার কাছে রেখে যাই। ওর অবস্থাতো আরো খারাপ। লোকটা বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবে না, সারাদিন যা খাটে, বেতনতো পায় মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ওতে কিইবা হয় বলতে বলতে কেমন ম্লান হয়ে এলো টুনুর মুখখানা। আর কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে। মেজ ছেলেটা কোত্থেকে ছুটে এসে বললো মা, মেস থেকে ওরা লোক পাঠিয়েছে। বলছে আজ নাকি তরকারিতে তুমি বড্ড বেশি লবণ দিয়ে দিয়েছ। আর ওরা তোমায় রাখবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের এ আকস্মিক কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলো টুনু। চোখাচোখি হতে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো ওর মুখখানা। মাটিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি লাভ বলো। বোঝতো, একমাত্র ওর আয়ে কিইবা হয়। পাশে পি, ডিব্লউ, ডির মেস আছে। সকাল বিকেল ওদের ভাতটা পাক করে দিই। বলতে গিয়ে লজ্জায় মুখখানা আরো নুয়ে এলো টুনুর। আরো বেশি অপ্রস্তুত হলো। সে আর সে ভাবটা কাটিয়ে উঠবার জন্যই হয়ত বললো, রান্না বান্নাই তো আমাদের কাজ। ঘরে যেমন রাঁধি। তেমনি ওদেরও রেঁধেদি। মাস মাস কুড়িটা টাকা। কমতো নয়। চুলোর উপর থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো টুনু। কাপড়ের আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো। উনি বোধ হয় এলেন। দেখি, বলে পাকঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। একটু পরেই শোবার ঘর থেকে তার গলার আওয়াজ শোনা গেলো উনি এসেছেন সালাম। এসো, দেখা করে যাও। টুনুর স্বামীকে দেখে এমনভাবে চমকাতে হবে তা কে জানতো।

তবু চমকালাম, ভীষণভাবেই চমকে উঠলাম হয়তো। পরনে একটা খাটো করে পরা লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো। পায়ে একজোড়া মোটর টায়ারের স্যান্ডেল। লোকটাকে চিনতে একটুও ভুল হলো না। সেও চিনলো আমায়। আর, চিনলো বলেই তো মুখখানা কেমন ফেকাশে হয়ে গেলো তার। হাত মুখ ধুবার অছিলায় ছুটে কলতলায় চলে গেলো সে।

ও চলে গেলে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় টুনু বললো, পিয়নের কাজ করলে কি হবে। লোকটার প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে। খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই; ঘুণাক্ষরেও একথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুরোধের সুর। তুমি বসো। উনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন। তারপর গল্প করবে। চুলোটা খালি যাচ্ছে। আমি তরকারিটা তুলে দিয়ে আসি।

হাত মুখ ধুয়ে টুনুর স্বামীও ততক্ষণে ফিরে এসেছে আবার। লজ্জা আর সঙ্কোচের ভাবটা তখনো কাটেনি। একখানা ছেঁড়া গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ সে বললো, মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাতো বোঝেনই। অফিস ছুটির পর অগত্যা তাই রাতে রিক্সা চালাই। বলতে বলতে হঠাৎ আমার হাতজোড়া আপন মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো ও, তারপর চারদিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বললো, দোহাই আপনার সালাম সাহেব। ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর। জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে। দোহাই আপনার–।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আর সইতে পারে না সালেহা। জীবনটা একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে তার কাছে। বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর। চারটে বছর মানুষের জীবনে নেহায়েৎ কম নয়। এ চারটে বছর কেমন করে তাকে কাটাতে হয়েছে তা সেই একমাত্র জানে। দু'বেলা চারটে ভাত খেতে পারলেই যদি মানুষ সুখী হতো, তাহলে সালেহার অসুখী হবার কোন কারণই ছিল না। মানুষের জীবনে অনেক আমোদ-আহলাদ থাকে, কিন্তু তার কোনটাই ভোগ করতে পারেনি সালেহা। কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভিতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।

পীর সাহেবের বাড়ির কঠোর শাসন। ঘরের ঝি-বৌদের বাইরের লোক যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে জানালায় মোটা পর্দা টাঙ্গানো। তা একটু ফাঁক করে বাইরে এক পলক তাকাতে যাবে তাও স্বামীর নিষেধ। শোবার ঘরের ছোট্ট কামরাটা আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ভরা পরিসরটার ভেতরে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে প্রাণ জুড়ানো ছোঁয়া সে আজ চারটে বছর ধরে পায়নি। অসহ্য! একেবারে অসহ্য বোধ হচ্ছে সালেহার। এ চারটে বছর একটু প্রাণ খুলে শ্বাসও নিতে পারেনি সে। গলা ছেড়ে একটা কথা বলতে কিংবা হাসতেও সাহস পায়নি। পীর সাহেবের কঠোর আপত্তি এতে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই। শব্দ করে হাসতে নেই। পদে পদে বাধা। পেট ভরে চারটে ভাত খাবে, তারও জো নেই। মেপে মেপে ভাত ওঠে সবার পাতে। পীর সাহেব বলেন, অতিরিক্ত খেলে কেয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।

অনেক সয়েছে সালেহা। অনেক! কিন্তু তার প্রতিদানে কি পেয়েছে সে? দু'টি চোখ পানিতে ভিজে ওঠে সালেহার। ভাল করেই সে জানে যা সে চায় তা তার আশি বছরের স্বামীর কাছ থেকে কোনদিনও পেতে পারে না। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অশান্ত বুকটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে।

আঠারো বছরের তরুণী সে। বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে। বাবার এ কীর্তির কথা মনে পড়তে আরো জোরে কান্না আসে-বাবা! তার বাবা কি করে এ দোজখখানায় তাকে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে।

সমস্ত কাহিনীটা ভাবতেও তার আজ মন কেমন করে। ঝিমঝিম করে মাথার ভেতরটা। মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলো এইমাত্র। কিন্তু দুঃস্বপ্ন কি মানুষের জাগরণে এমনি বার বার করে ফিরে আসে। হয়ত আসে, নইলে বিগত এই ক'টি বছরের ভেতর কেন সে ভুলতে পারলো না সেই বছরটিকে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বছর বর্ষা এসেছিল বড় অসময়ে। ভীষণভাবে। পথঘাট ডুবে গিয়েছিল সব। দিগন্ত ছোঁয়া অথৈ পানিতে টলমল করছিল চারদিক। শোনা গেল পলাশপুরের পীর সাহেব এ পথে আসবেন। জাঁদরেল পীর। পূর্ব পুরুষ থেকে বর্তমান পুরুষের নাম পর্যন্ত নানাবিধ অলৌকিক কীর্তিতে জড়ানো। দাদা আর বাবা এর ভয়ানক ভক্ত শিষ্য। খবরটা এ তল্লাটে শোনা যেতেই বাবা সাদর আহ্বান জানালেন, গোলামি-ঘরে হুজুরকে মেহেরবানী করতে। হুজুর মেহেরবানী করলেন। একা নয়। একপাল সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে করে।

বৈঠকখানায় ধবধবে বিছানা পেতে তাদের থাকবার আস্তানা করা হলো। বারবাড়ির প্রাঙ্গণে খোঁড়া হলো ইয়া বড় বড় দু'টি চারমুখো উনুন।

পীর সাহেবের লম্বা দাড়ি আর নুরানী চেহারার সুখ্যাতি শুনে পাড়ার কৌতূহলী মেয়েদের জোড়া জোড়া চোখের মেলা বসেছিলো ওদের বাংলা ঘরের বেড়া ঘিরে। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সালেহাও একবার চুপি চুপি গিয়েছিল। কিন্তু লম্বা দাড়ি বা নুরানী চেহারার বিশেষত্ব বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়েই সরে এসেছিল মিনিট দুই পরে।

রাত্রে দাদা তাকে ডেকে বললেন, যা নাতনী ভাল দেইখা একখানা শাড়ি পইরা আয়।

অবাক হয়ে সালেহা দাদার মুখের দিকে হা করে তাকিয়েছিল, শাড়ি ক্যান পরমু দাদা?

হুজুরের হাত পাওগুলো একটু টাইনা টুইনা দিয়া আয় সালু, বহুত দোয়া করবো।

চৌদ্দ বছর বয়স তখন সালেহার। ছোট্ট একটা ঘোমটা দিয়ে বাবার সাথে পীর সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ালো সে।

বাবা বললেন, আমার লেড়কি, হুজুর।

হাত বাড়িয়ে পীর সাহেবকে ছালাম করলো সালেহা। হাত তুলে দোয়া করলেন পীর সাহেব। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার লেড়কি নাকি? বহুত আচ্ছা লেড়কি আছে।

হুজুরের হাত পাগুলো টিইপা দেওত- মা-বাবা ঈশারা করলেন সালেহাকে। ভীষণ লজ্জা করছিল সালেহার।

তোমহার নাম কি আছে? পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন মিষ্টিই না লেগেছিল কথা ক'টি সেদিন।

কিন্তু সালেহা কি তখন জানতো যে সে বুড়োটা একটা পুরোপুরি জন্তু, পাক্কা একটা খুনী?

চারটে বছর। চারটে বছর, নয়তো ঠিক চারটে যুগ যেন। সালেহাই জানে এ ক'টা বছর কেমন করে সে জ্বলে পুড়ে মরছে। প্রথম থেকেই জানতো সে এ বুড়োর সাথে বিয়ে তার মৃত্যুরই সামিল। কিন্তু, জেনেও কি সে প্রতিবাদ করতে পেরেছিল? সে কি মুখ ফুটে বলতে পেরেছিল তোমরা কেন এ বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছ আমায়? আমার দেহমনের স্বাভাবিক স্বপ্ন কি পূরণ করতে পারবে এ বুড়ো? কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি সালেহা। বলবার সাহসের অভাব ছিল তার ভেতর। বললেও হয়ত কেউ আমল দিত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের বাড়ির মেয়েদের কাছেই প্রথমে সে কথাটা শুনেছিলো কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। আশি বছরের এক বুড়োর সাথে তার বিয়ে এ-ও কি সম্ভব। কিন্তু দিন দুয়েকের ভেতর সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। দাদা মাকে ডেকে বললেন, আমাগো সালেহারে পীর সাইবের ভা-রী পছন্দ অইছে।

মা কোন উত্তর দেয়নি। সালেহা ভাল করেই জানে এ বিয়েতে মায়ের মত ছিল না। প্রতিবাদও তিনি করেছিলেন কিন্তু ফল হয়নি। বাবা বলেছিল মাইয়া লোকে ভালো মন্দের কি বোঝে? তাদের জিজ্ঞাইবার বা কোন দরকারডা। আরে পীর জামাই কি সক্কল মাইয়ার ভাইগ্যে জোটে? মাইয়ার কপাল ভালা কইতে অইবে।

কপাল! এ ক'বছর হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে সালেহা তার কপালকে। পাঁচ সতীনের ঘর। পাঁচ সতীন নয়তো ঠিক পাঁচ পাঁচটা দজ্জাল বাঘ যেন। ওরা সালেহার আগে এসেছে, তাই ওদের দাবিও তার আগে। উঠতে বসতে তাদের তীব্র কটাক্ষ সালেহার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া বুঝি আরম্ভ হয়ে গেছে তার ভেতর। আর বাঁচবে না সালেহা; আর কিছুদিন এখানে থাকলে সে নিশ্চয়ই মরে যাবে।

বাইরের ঘরে লোক আসে, তাদের চোখে না দেখলেও গলার স্বরে আন্দাজ করতে পারে সে। এক এক সময় মনে হয় ছুটে গিয়ে তাদের কাছে দাঁড়ায় সালেহা। সব কিছু জানিয়ে দেয় ওদের। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়োর ভীষ্ম মুখোশ খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে এখানে কেন ওরা আসে? কেন ওরা একটা খুনীর পায়ে এত শ্রদ্ধা নিবেদন করে? খুনী ! খুনী! বুড়োটা একটা খুনী ছাড়া আর কিছু নয়। সালেহাকে সে খুন করেছে।

একটা পূর্ণযৌবনা তরুণীর আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা কোমল হৃদয়কে ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে। ওই বুড়োটা। সে সব বলে দেবে। সব কিছু। কিন্তু বড় দুর্বল সে, তাই কিছু বলা হয় না।

সালেহা বুঝতে পারে, দুর্বলতাই এতদূর নিয়ে এসেছে তাকে। নইলে প্রথমেই সে প্রতিবাদ করতে পারতো। স্পষ্ট মনে আছে- তাদের গ্রামের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে হাসিনার কথা, বাবার পছন্দ করা জায়গায় বিয়ে করতে স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল সে।

শেষে একগুঁয়ে মেয়েটি বাবার মুখে ছাই দিয়ে এক রাতে পালিয়ে গেলো, কলেজ পাশ করা এক ছেলের সাথে। সালেহার স্পষ্ট মনে আছে, গ্রামের ছেলে বুড়োরা কেমন ছি ছি করছিলো। পুকুর ঘাটে, ঘরের দাওয়ায়, ঢেঁকির চারপাশে জটলা পাকিয়ে গ্রামের মেয়েরা কেমন হাসাহাসি করতো চৌধুরী বাড়ির কলঙ্কের বিষয় আলোচনা করে। সালেহাও যোগ দিত তাদের সাথে।

কিন্তু আজ সে বুঝতে পেরেছে। হাসিনা ঠিকই করেছিলো। হাসিনার মতো সালেহাও যদি পালিয়ে যেতে পারতো তাহলে জীবনটা দুঃখের হতো না।

বিয়ের রাতে পাড়াপড়শীরা যখন মুখের কোণে হাসি টেনে সালেহাকে সাজাতে এলো, মা তখন বার বার আঁচলে চোখ মুছছিলো। আজও সে সব কথা সালেহা ভুলে যায়নি। মামারা অনেক সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তুই কান্দছ ক্যান সালুর মা। মাইয়ার তর বরাত ভালো, বেহেস্তের হুর অইয়া থাকবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাণ দিয়া পীর সাহেবের খেদমত করিছ সালু, আখেরাতে বেহেস্ত পাইবি। পালকিতে চড়িয়ে দিয়ে নানা নানী তার কানে কানে সিসফিসিয়ে বলে দিয়েছিল বিদায় দেবার সময়।

হ্যাঁ। এ ক'বছরে বেহেস্তের আস্বাদ ভাল করেই পেয়েছে সালেহা। বেহেস্তের অমন যৌবন হুরত্ব লাভের আশায় আজ তার বয়সের বসন্ত সম্ভারে অসময়ে উল্‌টো হাওয়া বইছে। অকাল বার্ধক্য আজ ইশারা দিয়ে যেন তাকে ডাকছে। অসহায় আর্তনাদে পাশবালিশটাকে বুকে চেপে ধরে সালেহা। কিন্তু প্রাণহীন এ তাকীয়াটাকে বুকে জড়িয়ে আর কতদিন সে একটা মানব শিশুর উপস্থিতিকে ভুলে থাকবে? কতদিন রিক্ত বুকের হাহাকার নিয়ে লোক সমাজে অভিনয় করবে সব পাওয়ার পরিতৃপ্তির? বার কয়েক এপাশ-ওপাশ করে অসহ্য উত্তেজনায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সালেহা। আজ মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার পালা তার। জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় সালেহা। আর কাউকে ভয় করবার প্রয়োজন নেই। হাত বাড়িয়ে পর্দাটা ফাঁক করে সে। ফিনফিনে বাতাসের সাথে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়ে ওর মুখের উপর! পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। সেদিকে একবার মুখ তুলে চেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে সে। ওহ্ খোদা, প্রকৃতির কত মুক্ত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত সে। রাত্রি বেড়ে চলে। জানালার পাশে দোলান চাঁদটা একটু এলিয়ে গেছে পশ্চিমে। আর তার তেরছা আলোয় দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ একটি তরুণীয় ছায়া জানালার পাশ থেকে দরজার দিকে এগোচ্ছে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে কম্পিত পা দু'খানা- পাশের কামরা থেকে বড় বিবির নাক ডাকার শব্দ আসছে। কোণের ঘরের জানালার ফাঁক গলিয়ে মিটমিটে আলো আসছে বাইরের দিকে, পীর সাহেব আজ ঝি-বৌ-এর কাছে আছে।

সেদিকে একবার ফিরে ছায়া আবার সরতে শুরু করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে। পূর্ব পুরুষদের কবরখানার কাছে এসে আর একবার সে থমকে দাঁড়ায়। সম্মুখে উন্মুক্ত আকাশের নিচে পায়ে চলা অপরিসর গ্রাম্য পথ। খানিক বাদে পদধ্বনি বেজে ওঠে সে পথের ধূলিকায়। তারপর-সালেহার হুঁশ নাই। হুঁশ হলো চুলের মুঠিতে টান পেয়ে। এ্যাঁ সে পালিয়েছে। স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি। এই দীর্ঘ ক'ক্রোশ পথ সে হেঁটে এসেছে। একে কি পালানো বলে? এই কি পালানোর সংজ্ঞা ; তা না হ'লে চুলের মুঠি ধরা রুদ্র মূর্তি বাবার গলায় ও আওয়াজ কিসের- হারামজাদী আমার মুখে চুন কালি লাগাইলি তুই। মানসম্মান ভেস্তে দিলি আমার। আত্মসম্মান জ্ঞানী সমাজী জীব বাবা। কলঙ্কিনী মেয়েকে মারবার অধিকার তার আছে। তাই খোদাই হাতপা দুটো সমান ভাবে মেয়ের উপর চালাতে থাকে।

না, এবারে সে প্রতিবাদ করবে। নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু ভাষা কোথায়? একি সে কাঁপছে? বাবার পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলছে, আর মাইরো না বাপজান, তোমার পায়ে পড়ি আর মাইরো না। ক্লান্ত পিতা ক্ষান্ত হয় এবারে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাদী কাঁদছিলেন। মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই তিনি ধরে ফেললেন। দাদীকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে সালেহা। বুকটা জ্বলছে, না ব্যথা করছে ঠিক বুঝতে পারে না সে। শুধু মনে হচ্ছে হাঁটুর উপর ওঠা কাপড়টাকে নামিয়ে নেবার ক্ষমতা বুঝি তার লোপ পেয়েছে।

আজ মা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে বাবা তাকে এরকমভাবে মারতে পারতেন না। তার বিয়ের পরেই মারা গেছে। মায়ের কথা মনে পড়তে দ্বিগুণ হয়ে এলো কান্নার বেগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাষাণ বাবা। মাকেও এরকমভাবে মারতো। মার খেয়ে মায়ের হাড়গুলো সব জখম হয়ে গিয়েছিল। মা কাঁদতো না, কোঁকাতো। আর সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতো।

উঃ হাত দুটো আর পিঠটা কি রকম ফুলে যাচ্ছে সালেহার। মায়েরও মাঝে মাঝে এ রকম হতো। কেরোসিন তেল গরম করে মা মালিশ লাগাতো। বাবা না জানলেও জানে বাবার মার খেয়েই মা মারা গেছে। ডাকু! এরা সবাই ডাকু! খুনী! উঃ আর কিছু ভাবতে পারছে না সালেহা। অসাড় হয়ে আসছে তার সমস্ত শরীর।

বিকেলে লোক এলো পীর সাহেবের বাসা থেকে। দাদা হাতজোড় করে বললেন– অবুঝ মাইয়া, একটা খারাপ কাম কইরা ফেলছে, পীর সাইবেরে বইলা দিয়েন মাফ কইরা দিতে।

মাফ! মাফ করবেন পীর সাহেব একজন দুশ্চরিত্রা মেয়েকে?

খবর শুনে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে পীর সাহেবের। বারান্দায় কতক্ষণ দ্রুত পদচারণা করলেন তিনি, পীর বংশের কলঙ্ক। তিনি সইবেন কি করে?

দুশ্চরিত্রা মেয়ের শাস্তি–এক–শ–এক কোড়া, এক–শ–এক। গর্জে উঠলেন পীর সাহেব, চমকে উঠে বাবা। সকালে রাগের উপর মা মরা মেয়েকে তিনি যথেষ্ট মার মেরেছেন। তার ওপর এক–শ–এক কোড়া বেত্রাঘাত! সে কি সালেহার কোমল দেহে সইবে?

অথচ পীর সাহেবের আদেশ।

আমার পিঠের উপর একশ এক কোড়া মারেন হুজুর। ওই মাইয়াটারে মাফ কইরা দেন। বাবা পীর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

পীর সাহেবকে কোন উত্তর দিতে হলো না এর। উত্তর নিয়ে এলো সামছুল। সালেহার ছোট ভাই।

সকাল থেকে রক্ত বমি করতে করতে ঘণ্টাখানেক হয় সালেহা মারা গেছে।

সপাং করে কে যেন একটা চাবুকের ঘা মারলো উপস্থিত জনতার পিঠের উপর।

অস্পষ্ট গুঞ্জরণ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে– মাগীটা মরবে না? পীর সাইবের মুখে ছাই মারি যাবে কোথায়? পীর সাহেবের বদ্‌দোয়া লেগেছে।

সায় দিয়ে পীর সাহেবও মাথা নাড়লেন– গুনাহগারোকো, আল্লাহ্ তায়ালানে কভি মাফ নাহি করতা হ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃতি

জীবনকে অস্বীকার করিস না মনো! অস্বীকার করিসনে তোর আপন সত্তাকে, অনেক কিছু তোর করবার আছে এ জীবনে।

অনেক চেষ্টা করেছে মনোয়ারা, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারেনি জামানের এ কথা কয়টি। সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বার বার মনে পড়ে যায়। আর ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে পড়ে সে।

সেদিনের সেই ফ্রক পড়া ছোট মেয়েটি শাড়ির পোঁচ লাগতে না লাগতেই যে কখন যৌবনের রোজ-নামচায় নাম লিখিয়ে ফেললো তা নিজেও ভাবতে পারে না মনোয়ারা। বুড়ি দাদীর চোখেই প্রথম ধরা পড়ছিল সে। পান খাওয়া লাল দাঁতগুলোকে ফাঁক করে ভর্ৎসনার সুরে ছেলেকে বলেছিলেন তিনি, আমি মরে গেলে তোদের যে কি হবে তাই ভাবছি।

সদ্য অফিস ফেরত ছেলে অবাক হয়েছিল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে- কেন, কি হয়েছে মা? মেয়েটার যে বিয়ে দেবার বয়স হয়ে গেছে তার কি কোন খোঁজ রেখেছিস? রাখবিই বা কেন, তুই কি কোন দিন সংসারের কথা ভেবেছিস, না ভাবিস? যাই বল বাবা, মেয়ের জন্য এবার একটা ভাল দেখে জামাই দেখ।

জামানতো ওকে প্রথমে দেখে চিনতেই পারলো না, চিনবেই বা কি করে? চার বছর পর সে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে; এ চার বছরের ভেতর অনেক পরিবর্তন এসে গেছে মনোয়ারার শরীরে, চেহারায়।

অবাক হচ্ছো যে, চিনতে পারছো না? আমাদের মনো, মনোয়ারা গো। মা ওর সংশয় দূর করলেন।

ও! ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে, নিজ অজ্ঞতাকে ঢাকতে চাইলো জামান।

ক্লাশ সেভেনে পড়ে। গত বছর বৃত্তি পেয়েছিল। মায়ের কথায় আবার মুখ তুলে মনোয়ারার দিকে তাকাল জামান। সে ততক্ষণে সরে গেছে পর্দার আড়ালে। তার এই আড়ালের ঘটনাকে আর একদিন জামান বলেছিলো, পর্দাই তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে মনো। এ রহস্যঘেরা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছে। জামানের কথায় অবাক হয়েছিলো মনোয়ারা, কিন্তু কোন উত্তর দেয়নি। শুধু চেয়েছিলো ওর দিকে, কাজল কালো চোখ দুটো মেলে।

জানো ও খুব ভালো রান্না করতে জানে। মা বললেন।

হুঁ। মৃদু হাসলো জামান।

ওই যে টেবিল ক্লথটা দেখছ না। ওটা মনোয়ারা সেলাই করেছে। বেশ সুন্দর হাতের কাজও জানে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারে না মনোয়ারা। বরং পর্দার এ পাশ থেকে রেগেছে মনে মনে– মা যেন কেমন! মনোয়ারা জানে জামানের কাছে এ সবের কোন মূল্য নেই। মনোয়ারার আন্দাজ অহেতুক নয়। কেননা, একটু পরে চায়ের পেয়ালাটা যখন সে জামানের দিকে এগিয়ে দিল তখন চায়ে একটা চুমুক দিয়েই জামান হেসে উঠলো– চা তো তৈরি করেছিস খাসা করে। লেখাপড়ায়ও নাকি বৃত্তি পেয়েছিস। হাতের কাজেও বেশ ভালো। কোন পলিটিক্যাল ফাংসনে টাংসনে যাস?

ফিক করে হেসে উঠে একটু দূরে সরে দাঁড়াল মনোয়ারা।

পটেন কাল ফা–সা–নটা কি বাবা, তাতো বুঝলাম না। মায়ের অজ্ঞতা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল মনোয়ারার কাছে। তাই সে সরে যেতে চেয়েছিল।

যাচ্ছিস কোথায়? বস, তোর সাথে কথা আছে। আদেশের সুরে বললো জামান।

আঁচলটা গুটিয়ে নিয়ে মনোয়ারা বসলো। সামনের একখানা চেয়ারে উপর।

পলিটিক্যাল ফাংসনটা বুঝলে না মামী, ওটা হচ্ছে রাজনীতি করা। মানে সভাসমিতি করা, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া–।

অ–বক্তিতা দেওয়া? ওতো ব্যাটা ছেলেরা করে। মা অবাক হন।

না, মেয়েরাও করে। মায়ের অজ্ঞতা দূর করতে চেষ্টা করে জামান। এতক্ষণ চুপটি করে মনোয়ারা চেয়েছিল জামানের মুখের দিকে। এবার দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের; জামান আর মনোয়ারার। মনোয়ারা চোখ সরিয়ে নিল কিন্তু জামান পারলো না, চোখ দুটো ওর মুখের উপর রেখেই বললো– বেশ সুন্দর হয়েছিল তো দেখতে। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো মনোয়ারার মুখখানা।

অথচ এই সেদিনের কথা। যখন ওরা ছোট ছিল, একসাথে হুড়ো–হুড়ি আর খেলাধূলা করতো, ওরা ঘর বাঁধতো, বর বধূ সাজাতো। কই সেদিন তো মনোয়ারা রাঙা হয়ে উঠেনি। অদ্ভুত মানুষের জীবন।

হ্যাঁ, অদ্ভুতই তো নইলে ভাবতেও তো পারছে না মনোয়ারা, কেমন করে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলো? কেমন করে যে কৈশোর আর যৌবন ছাড়িয়ে প্রবেশ করলো প্রৌঢ়ত্বের কোঠায়। বিছানার চাদরটা গুটিয়ে ফেললো। ময়লা হয়ে গেছে ভীষণ। না কাঁচলে আর নয়। আবুলকে পাঠিয়ে দোকান থেকে সাবান আনিয়ে নিতে হবে একটা। কিন্তু– কি যেন ভাবছিল সে একটু আগে।

ও–হ্যাঁ, তার ছোটবেলাকার কথা, আর জামানের কথা– এরপর আরও দু' একটা দিন গেছে অসহ্য পরিবেশের ভেতর দিয়ে। তারপর তৃতীয় দিনে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দু'জনাই।

চল সিনেমায় যাবো? জামান বললো, সাথে কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবি না, শুধু তুই একা?

মা যেতে দিলে তো।

কেন যেতে দেবে না? মাকে শুনিয়ে শুনিয়েই জোর গলায় বললো জামান, চোরের সাথে যাচ্ছিস তো না, আমার সাথে যাচ্ছিস, নে–কাপড় পরে নে, সময় হয়ে এলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধা দেবার কোন পথ রাখেনি জামান, মা এসে শুধু বোরখাটা এগিয়ে দিলেন–নে, সময় হয়ে এলো।

রিক্সা আনতে গিয়েছিল জামান, ফিরে এসে মনোয়ারার হাতে বোরখা দেখে অবাক হলো– ওটা আবার কেন?

মা বলেছেন। মুখ নিচু করে উত্তর দিল মনোয়ারা।

ওর হাত থেকে বোরখাটা টেনে নিয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, এক হাতে ওর একখানা হাত ধরে, হেঁচকা টান দিল জামান।

চল—

রিক্সায় চড়তে এসে অবাক হলো মনোয়ারা– রিক্সার পর্দা লাগানো হয়নি যে?

প্রয়োজন নেই বলে। নিস্পৃহের মতো উত্তর দিল জামান।

বাবা আর চাচা জানতে পারলে কিন্তু ভীষণ গাল দেবেন। মনোয়ারার কণ্ঠে ভয়ের আভাস।

বিরক্তি বোধ করে জামান। নে নে, উঠবি তো ওঠ। বাবা বকবে, চাচা বকবে, কিন্তু কেন বকবে বলতো? তোদের কি বাইরে বেরুতে নেই নাকি?

আর কথা কাটাকাটি করেনি মনোয়ারা। আসলে কোন কথাই যেন সে অবিশ্বাস করতে পারেনি যুক্তিহীন বলে। চুপটি করে রিক্সায় এসে বসেছে, রিক্সা ছেড়ে দিয়েছে।

জামান নামলো প্রথমে– নেমে আয়! দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে মনোয়ারাকে ইশারা করলো জামান।

ভীষণ ভয় পেয়েছিল মনোয়ারা। অজানা অচেনা এ কোন জায়গায় জামান তাকে নিয়ে এলো, পরক্ষণে যার সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হলো তাকে দেখে আরো ঘাবড়ে গেল সে। আধ পাকা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তীক্ষ্ণ চোখ, উন্নত নাসিকা গৌরবর্ণ দেহ এক বলিষ্ঠ পুরুষ। এর কথাই কি তুমি বলেছিল জামান? উঃ কি কর্কশ গলা। মনোয়ারা আর একবার ফিরে তাকালো ভদ্রলোকের দিকে।

হ্যাঁ, এর কথাই বলেছিলাম।

নামকি তোমার! আবার সে কর্কশ গলায় প্রশ্ন। নামটা বলবার সঙ্কোচও কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না মনোয়ারা, জামানই ওর হয়ে বললে– নাম মনোয়ারা।

কিন্তু ও এতো লজ্জা করছে কেন? ওকে বুঝিয়ে দাও, যে পথে এসেছে, সে পথে লজ্জা সঙ্কোচ সব কিছু ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচিয়ে চলতে হবে ওকে।

যে পথে এসেছে? কোন পথ? রীতিমত ঘেমে উঠলো মনোয়ারা। লোকটা কি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর বুকের দিকে। না–না, ঠিক বুকের দিকে নয়, গলার সাথে ঝুলানো নেকলেসটার দিকে।

অলঙ্কার পরাটাকে তুমি খুব পছন্দ কর বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ এ প্রশ্নের হেতু? মাথাটা যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে মনোয়ারার। কিন্তু ও অলঙ্কারের ইতিহাসটা যদি তুমি জানতে তাহলে নিশ্চয়ই, ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। না ইতিহাস জানবার কোন দরকার নেই ওর। জামানের প্রতি ভীষণ রাগ হয় মনোয়ারার। ভদ্রলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ততক্ষণে বলে চলেছেন– প্রাচীনকালে, প্রাচীনকালে কেন? মধ্যযুগেও পুরুষেরা নারীর উপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালাতো। যখন তখন যথেচ্ছাভাবে তাদের মারপিট করতো। শুধু তাই নয়। কোমরে, গলায়, হাত পায়ে শিকল বেঁধে ঘরের ভেতর ফেলে রাখতো ওদের। পাছে ওরা পালিয়ে যায়। নারী সে ট্র্যাডিশন ক্ষুণ্ন করলো না। আজও তাই তারা হাতে, পায়ে, গলায় শেকল– অবশ্য আগে লোহার ছিল, এখন সোনার পরে গর্ব অনুভব করে। সেদিনই ঘরে ফিরে মনোয়ারা তার সমস্ত অলঙ্কার আলমারীতে তুলে রেখে দিয়েছে। আর পরেনি।

মা আর দাদী অবাক হলেন।

কিরে? এত কান্নাকাটি করে বাপের কাছ থেকে ওগুলো আদায় করে নিলি কি আলমারীতে তুলে রাখার জন্য?

সেদিন কোন উত্তর দেয়নি মনোয়ারা। উত্তর আর কবে, কখন, কোন কথারই বা দিয়েছে সে? অফিস থেকে ফেরার পর স্বামী যখন আবোল তাবোল আরম্ভ করে, তখন কি মনোয়ারা ইচ্ছা করলে তার উত্তর দিতে পারে না? কিন্তু কৈ, দেয়নি তো কোনদিন? স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলতে পারে না। লোকটা কেমন ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন। সারাদিন হিসাবের খাতায় সারি সারি অঙ্ক কষলে কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে?

ওই যা, চাদরটা এবার কি করে কাঁচবে মনোয়ারা? পানিটা যে চলে গেলো, তিনটার আগে কি আর আসবে?

আকাশে তখন বিবর্ণ মেঘের ছুটোছুটি। এলোমেলো হাওয়ায় চুলের গোছা বার বার কপালে লেপ্টে আসছে সাবানের পানিতে।

আবার আনমনা হয়ে পড়ে মনোয়ারা।

মাঝে কিছুদিনের জন্য জামান কোথায় চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে মনোয়ারাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে দিল। তাকে কি করতে হবে। মাথা নাড়লো মনোয়ারা, না সে পারবে না। রাগে ফেটে পড়লো জামান– এটা পারবিনে, ওটা পারবিনে, পারবি কি বলতো?

রান্না করতে। আঁচলের আড়ালে মুখ টিপে হেসেছিলো মনোয়ারা।

হ্যাঁ, ওটা ছাড়া আর পারবিই বা কি? কিন্তু এমন একদিন আসবে সেদিন আমাদের বলার আগেই নারী এগিয়ে আসবে পাশে। রাগের মাত্রা বাড়লো বই কমলো না জামানের, পাকঘরের ভেতরেই তো তোরা তোদের বন্দি করে রেখেছিস। আচ্ছা বলতো মনো, এই সারাটা দিন পাকঘরের ভেতর রান্না করতে তোদের একটুও বিরক্তি আসে না নাকি?

দূর ছাই চুলোর উপরে তেলটা কখন থেকে ফুটছে তো ফুটছেই। বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মনোয়ারা। কি দরকার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটাঘাঁটি করে, জীবনটা তো তার রান্না করেই গেলো। তবুও কি সে খাইয়ে কোনদিন সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? তেল হয়েছে তো মসলা হয়নি। মসলা হয়েছে তো নুন বেশি পড়ে গেছে। নিত্য নতুন অভিযোগ।

হ্যাঁ, নতুন নতুন জিনিস পাক করতে আমাদের খুব ভাল লাগে। জামানকে রাগাবার জন্যই কথাটা বলেছিল মনোয়ারা।

দম বন্ধ করে ফুলতে লাগলো জামান। তারপর এক সময় চিৎকার করে বেরিয়ে গেলো– বছরে বছরে ছেলের মা হতেই আসলে তোদের ভালো লাগে।

বাংলার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায় কিইবা বলেছিস জামান। একটা কেন? এইতো সে বছর দুটোই হয়ে বসলো তার। এ নিয়ে সবাই কত হাসাহাসি করলো। হাসুক ওরা। কি আছে তাতে মনোয়ারার? খোদা যদি দেয়, মনোয়ারা কি করতে পারে তাতে? হ্যাঁ, খোদা কম দেয়নি তাকে এই ক'টি বছরে; মোট ছ'টি দিয়েছে। সন্তান বেড়েছে, কিন্তু আয় বাড়েনি। যে একশ' পঁচিশ সেই একশ' পঁচিশই রয়ে গেছে। মনোয়ারা যদি চাকরি করতে পারতো তাহলে হয়তো সংসারটা কিছু স্বচ্ছল হয়ে আসতো। কিন্তু, ঘর সামলাবে, না বাইরে চাকরি করতে যাবে মনোয়ারা? কোনটা করবে?

জামান বলেছিল কি একটা দেশের কথা, সেখানে নাকি ছেলে-মেয়েদের কিন্ডারগার্টেন না কিসে রাখা হয়। আর মা-বোন বেরিয়ে যায় কাজে। সে রকম হলে মন্দ হতো না হয়ত।

আবার ভাবনার অতলে ডুবে পড়লো মনোয়ারা।

সেই যে সকালে বেরিয়ে গেলো লোকটা, রাত দশটার আগে ফিরলো না। দোরগোড়ায় মনোয়ারার সাথে একেবারে মুখোমুখি।

রাগ পড়লো তো? মুচকি হাসলো মনোয়ারা।

ফজলামো করিসনে, বুঝলি? হাতের বান্ডিলটা টেবিলের উপর রাখলো জামান?

ওগুলো আবার কি? বান্ডিলটা হাতে নিয়ে- কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললো মনোয়ারা, অনেকগুলো ফটো, দেশে-বিদেশের মেয়েদের।

ওগুলো তোর জন্য এনেছি, দেখ-একবার দু'টো চোখ দিয়ে ভাল করে দেখ। মনোয়ারা ঘাড়ের উপর একখানা হাত রেখে, ওর দৃষ্টিকে ফটোগুলোর উপর আরো নত করে বলেছিলো জামান- তোদের মতো ওদেরও ঘর সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে; কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞানে ওরা কত উন্নত একবার দেখে নে।

সত্যি অবাক হয়েছিল মনোয়ারা। শুধু অবাক নয়। প্রেরণা এসেছিল ওর অবচেতন মনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওদের মতো হবার জন্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই কি আর এ দেশে সব কিছু করা যায়? মাথার ওপর বাপ-মা রয়েছে, আর রয়েছে সমাজ।

তরকারিটা নামিয়ে নিয়ে, ডালের কড়াইটা তুলে দিল মনোয়ারা। না, একটু ভাল করে ভাবতে পারবে তারও উপায় নেই। জামানেরও বা চলে যাওয়া ছাড়া আর কি উপায় ছিল?

ওতো কম করেনি মনোয়ারার জন্য। ওরই উৎসাহে মনোয়ারা লিখতে আরম্ভ করেছিলো- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। প্রথম প্রথম লেখায় একটু জড়তা ছিল বইকি। তাও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল সে জামানের প্রচেষ্টায়। উঃ! সেদিনটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না মনোয়ারা। তার প্রথম লেখা, প্রথম গল্প যেদিন ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। চারদিক থেকে প্রশংসা পত্র এলো, চমৎকার গল্প। বলিষ্ঠ লেখনী। উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

জামান বললো- দেখ, তোর ভেতর এমন একটা প্রতিভা ঘুমিয়ে আছে, তা কি তুই জানতি? আসলে, সব কিছুর মূলে ওই চেষ্টা থাকা চাই, সাধনা করতে হয়, তাহলেই প্রতিভা বিকাশ পায়, বুঝলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু, বুঝেও কি করতে পারলো মনোয়ারা? আর লিখতে পারেনি সে, লিখতে পারবেও না। প্লট আসে, ভালো ভালো প্লট, কিন্তু– মা, ভাত দেবে না? স্কুলের যে সময় হয়ে এলো।

শুধু খাই, খাই খাই।

নে, খা। ভাতের গামলাটা ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছলো মনোয়ারা। ভোর না হতেই স্কুলের–অফিসের তাগিদ। দু'হাতে কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না সে। হাঁফিয়ে উঠে, মাথা ঘুরায়; শরীরে ক্লান্তি নেমে আসে। তবুও রেহাই নেই, নিস্তার নেই, করতেই হবে।

দেখো জামান, তুমি আমার ভাগনে, অতি আপনার জন, তোমাকে আর কি বলবো, অবুঝ নও তুমি।

সেদিন মামার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো জামান। তারপর বলেছিলো– কেন কি ব্যাপার মামা?

মানে, লোকে কি সব আজেবাজে কথা বলাবলি করছে।

আজেবাজে কথা!

হ্যাঁ, বোঝত, ঘরে বয়স্কা মেয়ে থাকলে, অনেকেই অনেক কথা বলে, তাই বলছিলাম– কথাটা আর শেষ করেননি তিনি। হয়তো শেষ কথাটা উচ্চারণ করতে ভদ্রতায় বাঁধছিলো তার। কিন্তু মনোয়ারার দাদী ওসব ভদ্রতার ধার ধারেন না। তাই সহজ এবং সরল ভাষায় তিনি বলেছিলেন– ন্যাকামো! আরে জামান বুঝতে তো পাচ্ছ সবই।

এবার সব সত্যিই বুঝলো জামান। ছোট্ট চামড়ার সুটকেসটাকে হাতে নিয়ে নির্বিকারভাবে বেরিয়ে গেলো সে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, সে বৃষ্টির ভেতর ভিজেই চলে গেলো। কেউ বাধা দিলো না, এমন কি মনোয়ারাও না। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল সে। চোখের পলকগুলো কি ভিজে উঠছিল মনোয়ারা? নইলে আঠা আঠা লাগছিলো কেন চোখের চারপাশটা।

তারপর– একটা বছর না ঘুরতেই বিয়ে। নূতনজীবন। নূতন করে ঘর বাঁধবার দিন। স্বামীর বলিষ্ঠ দেহের সবল পেশীর ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলার পালা। তারপর এক ঝড়ো রাতে আকস্মিক ভাবেই খবরটা শুনলো মনোয়ারা– জামানকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। আর কিছুদিন পরেই শুনলো ওকে আন্দামান না কোথায় চালান দেওয়া হয়েছে। খবরটা শুনে খুবই দুঃখ হয়েছিল তার কিন্তু ভাববার অবসর পায়নি সে। কারণ আবুল তখন সাত মাসের। তাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে।

কিন্তু আজকাল প্রায়ই ভাবনায় পড়ে মানোয়ারা। সেই যে লোকটাকে নিয়ে গেলো ওরা। আজও সে ফিরে আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরেও না। তবে কি ওকে ওরা মেরে–

মা, মাগো, দেখো না আবুল ভাই ওরা বিকেলে আরমানিটোলা মিটিং–এ যাচ্ছে, আমায় নেবে না বলছে। মা আমি যাবো–। মেয়ে সেলিনা এসে গলা জড়িয়ে ধরেছে তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধিঙ্গী মেয়ে, আজ বিয়ে দিলে কাল ছেলের মা হবে, পুরুষদের মিটিং–এ রূপ দেখাতে যাবেন উনি। মেয়ের মুখের উপর খুন্তি নাড়ে মনোয়ারা।

কেন, মেয়েদের বুঝি সভা–সমিতিতে যেতে নেই? আমি যাবো। সেলিনা গোঁ ধরে।

অবাক মনোয়ারা। বড্ড বেশি অবাক। জামানের কথা, ঠিক জামানের কথাটাই ধ্বনিত হয়েছে সেলিনার কণ্ঠে। কিন্তু কোত্থেকে এসব শিখছে ও। কেমন একটা অজানা আক্রোশে সারা শরীর ফুলতে থাকে মনোয়ারার। দু'হাতে মেয়ের দু'কাধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আজকাল দজ্জাল মেয়েদের সঙ্গে মেশা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পটাপট থাপ্পড় পড়ে মেয়েটার গালে।

কিন্তু আবার অবাক হতে হয় মনোয়ারাকে। সেলিনা সরে দাঁড়ায় না এক পাও। বোবা চোখে সে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে– কি এমন অন্যায় দাবি তার বুঝতে পারে না। মনোয়ারার উদ্যত হাত মাঝপথেই থেমে যায়। সেলিনার আয়ত পানিভরা চোখে ঝড়ো মেঘের বিপ্লবী প্রতিজ্ঞার ছায়া কি ঘন হয়ে উঠছে না।

না, না, একি করছে সে। কেন, কেন, কি অধিকার তার রয়েছে এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করার? দূরে বহু দূরে, কোনও নির্জন দ্বীপের নিরালা তটে যেন একটা স্বপ্নমাখা আবছা শৃঙ্খলিত মূর্তি তার চোখে ভেসে উঠে!

না, না, সে স্বীকার করবে একে– এই পরিবর্তনকে, এই বিপ্লবী ঝড়ো হাওয়াকে। ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। দেহটা থেকে থেকে দমকে দমকে কাঁপতে থাকে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি পরিচিতি

অসংখ্য বই পুস্তকে সাজানো ট্রলির বাবার লাইব্রেরি। দেখে অবাক হল আসলাম। সত্যি, বাসায় এতবড় একখানা লাইব্রেরি আছে, ট্রলি তো এ কথা ভুলেও কোনদিন বলেনি তাকে।

একটু হাসলেন ট্রলির বাবা। বলেন, দৈনিক কমপক্ষে ঘণ্টা আটেক এখানেই কাটে আমার। রীতিমত একটা নেশা হয়ে গেছে। কেবল পড়া পড়া আর পড়া। জীবনটা বই পড়ে পড়ে কাটালাম।

লিনেনের শার্ট আর ট্রপিকেলের প্যান্ট পরা সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক যুগল ভ্রূ-জোড়ার নিচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। কপালে বার্ধক্যের জ্যামিতিক রেখা। কেন জানি প্রথম সাক্ষাতেই ভদ্রলোকের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেলো আসলামের। মেহগিনি কাঠের রঙিন সেল্‌ফ থেকে মরক্কো লেদারে বাঁধাই মাসিক 'মাহে নও'য়ের বাৎসরিক সংকলনখানা নামিয়ে নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে ভদ্রলোক আবার বলেন, কিন্তু, একটা কথা কি জানো আসলাম এদেশে শিক্ষার কোন কদর নেই।

শিক্ষা আছে যে তার কদর থাকবে? বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওপাশ থেকে উত্তর করলো ট্রলি।

ট্রলির সাথে আসলামের পরিচয় আজকের নয়। বছরখানেক আগের। ভার্সিটির লনে, প্রথম পরিচয় মুহূর্তে কোন এক মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে ট্রলি বলেছিলো, আমি তার ভাগনী।

মন্ত্রীর ভাগনী? মানে আপনার মামা মিনিস্টার? প্রথমটায় অল্প একটু অবাক হয়েছিলো বইকি আসলাম।

সরু ঠোঁটের ওপর লিপিস্টিকের ডগাটা নিখুঁতভাবে বুলিয়ে নিয়ে ট্রলি বলেছিলো, জ্বী হ্যাঁ। আমার এক মামা মিনিস্টার। আর, এক মামা এ্যামবাসেডার।

মামা যার মিনিস্টার, দুনিয়া তার তামার মতো উজ্জ্বল বলে জানতো আসলাম। তাই বলেছিলো, আপনার বাবাও কি তাহলে-।

না না, ওসব মন্ত্রীগিরির মধ্যে বাবা নেই। তিনি আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করেন। ট্রলি বলেছিলো।

বাবা ব্যবসা করেন। মামা মিনিস্টার। সত্যি কেন যেন সেদিন বড্ড ভালো লেগেছিলো ট্রলিকে। ফিনফিনে বাতাসের ভেতর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ট্রলির বাবা বললেন, জানো আসলাম, এই যে গাড়ী বাড়ি আর ধন-দৌলত দেখছো, এ সব কিছু স্রেফ ব্রেইন দিয়ে আয় করা।

ভাষাটা দ্রষ্টব্য না হলেও ঠিক বোঝা গেলো না। কপালে বিস্ময়ের ঢেউ তুলে আসলাম তাকালো ট্রলি আর তার বাবার দিকে।

মুখ টিপে হাসলো ট্রলি।

হাসলেন ট্রলিরা বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনটা ছিলো রোববার। আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে বসে কি একটা মার্কিনী পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলো ট্রলি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কৈফিয়তের সুরে প্রশ্ন করলো, এতদিন আসনি যে?

আসবো কেমন করে বলো। তোমার মামা যে ঘর থেকেই বেরুতে দিলেন না এ কয়দিন।

তার মানে?

মানে একশ' চুয়াল্লিশ আর কারফিউ।

ও: ভ্রূ-জোড়া নেচে উঠলো ট্রলির।

হঠাৎ বলে উঠলো আসলাম, আচ্ছা ট্রলি, তুমিই বলো। এতগুলো নিরীহ ছেলেকে গুলি করে মারা কি উচিত হয়েছে?

হুঁ, কি বললে? বই থেকে মুখ তুললো ট্রলি।

ওই গুলি ছোড়ার কথা বলছিলাম। তুমি কি কোন খোঁজ রাখ না ট্রলি?

রাখি। মাথা দুলিয়ে বললো ট্রলি, যদি বলি গুলি ছোড়াটা ন্যায়-সঙ্গত হয়েছে তাহলে?

হ্যাঁ তাহলে? দোরগোড়া থেকে গম্ভীর গলায় বললেন ট্রলিরা বাবা। আসলে কি জানো আসলাম। এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামী ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরি ভাষার জন্য এতমাতামাতি কেন? কথা তখনও শেষ হয়নি ট্রলির বাবার। ইসলামী দেশে ইসলামী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। টেবিলে একটা প্রচণ্ড ঘুষি পড়লো তার। দেখ আসলাম, আমি যা কিছু বলি থরো স্টাডি করেই বলি। আমি বলছি তোমায়। অনেক স্টাডি করে আমি দেখেছি।

বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। একেবারে নাথিং। নট এ সিংগল ফাদিং। বাবার সাথে তাল মিলিয়ে বললো ট্রলি।

প্রতিবাদে কি বলতে যাচ্ছিলো আসলাম। থামিয়ে দিল সে, হয়েছে থাক। তোমার মাথায় শয়তান বাসা করেছে। ওগুলো তাড়াতে হবে। ওঠো, উপরে চলো।

টেনে তাকে উপরে নিয়ে এলো ট্রলি। বসো। জোর করে চেপে বসিয়ে দিল চেয়ারের উপর। তারপর বৈদ্যুতিক পাখাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো সে। মাথার এলোমেলো চুলের ভেতর পরম আদরে ওর নরম আঙুলগুলোকে বুলিয়ে দিয়ে ট্রলি বললো, তুমি এরকমটি হবে তা কোনদিনও ভাবতে পারিনি আসলাম। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো করুণ হাসি ট্রলির।

ট্রলির বাবার পুরোনো চাকরের সাথে আলাপ হলো বৈঠকখানায়। বুড়োকে দেখে যেন জর্জ বার্নাড শ'র কথা মনে পড়ে গেলো আসলামের। সুদূর বিলেতের মৃত বার্নাড শ'র সাথে অদূর রমনার এই বুড়ো ভৃত্যের আকৃতিক সামঞ্জস্য সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

কৌতূহল বশেই হয়ত জিজ্ঞেস করে আসলাম, কতদিন আছ এখানে?

তা সাহেব অনেক দিন। বুড়ো হেসে বললো, সেই যুদ্ধের আমল থেকে।

বল কিহে। সেতো বছর দশেকেরও বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ সাহেব। বছর দশেকের মতই প্রায়। বুড়ো বললো, তখন কিন্তু এদের অবস্থা অতো ভালো ছিল না। কলকাতায় সার্কুলার রোডের উপর রেশনের দোকান ছিল একটা। গলাটাকে একটু খাক্‌ড়ে নিল বুড়ো। এখন যা কিছু দেখছেন– এসব তো পাকিস্তান হবার পরেই–। কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। ভেতর থেকে ট্রলির ডাক পড়তেই ভেতরে চলে গেলো।

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, ভার্সিটির লনে আবার দেখা হল ট্রলির সাথে।

কেমন আছ ট্রলি? জিজ্ঞেস করলো আসলাম।

এই এক রকম। ট্রলি বললো, আগামী মাসে বিলেত যাচ্ছি।

কেন, হঠাৎ?

ট্রলি বললো, তুমিতো জান, মেজ আপা ওখানেই আছেন। তাঁর বাসায় কিছুদিন বেড়াবো। তারপর সেখান থেকে যাবো কালিফোর্নিয়াতে বড় আপার কাছে।

ফিরছো কখন?

বলতে পারছি না ঠিক। টানা চোখের ভ্রূ-জোড়া নেচে উঠলো ট্রলির। বললো, বড় আপা গিয়ে আর ফেরেননি। ওখানেই বাসা বাড়ি করে রয়ে গেছেন। মেজ আপার অবস্থাও প্রায় সে রকম হতে চলেছে। আমারও হয়তো

কথাটা শেষ করলো না ট্রলি। কেন যেন হঠাৎ থেমে গেলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, সময় করে একবার বাসায় এসো তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে।

আরেক দিন কি একটা কাজে রাস্তায় বেরিয়েছিল আসলাম। পেছন থেকে ট্রলির কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়ালো। কেডিলাকের হুইল ধরে বসে আছে ট্রলি। কাছে আসতেই বললো, খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছো।

কোন খবর? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সে।

কেন, আজকের কাগজ পড়নি? ট্রলি অবাক হলো।

না, এখনও পড়িনি।

পড়নি? তাহলে মোটরে উঠ। একটু অবাক করিয়ে দিই তোমায়। জোরে হেসে উঠলো ট্রলি।

বাসার সামনে অসংখ্য মোটরের সার দেখে সত্যি অবাক হল আসলাম। বললো কি ব্যাপার ট্রলি?

বুঝতে পারছো না কিছু? ট্রলির চোখে রহস্যঘন হাসি। ট্রলি হেসে বললো, বাবা শিগ্রী সেন্টালের এডুকেশন বিভাগের বড় কর্তা হয়ে যাচ্ছেন, বুঝলে?

ও, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই, ট্রলি বললো। তোমাদের পছন্দ হবে তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই হবে। তাঁর মত একজন ইন্টালেকচুয়াল লোক–

কথাটা কেন যেন গলায় আটকে গেলো। ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি তুলে ট্রলি বললো, একটা দরখাস্ত লিখে রেখোতো আসলাম। বাবার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারীর দরকার হতে পারে। আমি তোমায় রিকমেন্ড করে দিয়ে যাব। বুঝলে?

মোটর থেকে নামতেই ট্রলির বাবাকে দেখা গেল। বন্ধু–বান্ধব নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তিনি। তাই হয়ত আসলামের উপস্থিতি তাঁর চশমায় ঘেরা চোখে ধরা পড়লো না সহজে।

ট্রলি বললো, লাইব্রেরিতে গিয়ে বস তুমি। আমি একটা কাজ সেরে আসি। কেমন? বলে উপরে চলে গেলো সে।

সেল্‌ফ থেকে একটা বই নামিয়ে পড়তে বসলো আসলাম। রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ।

কে আসলাম? ট্রলির বাবার চমকে ওঠা কণ্ঠস্বরে বই থেকে মুখ তুলে তাকালো সে।

কখন এলে তুমি? উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন ট্রলির বাবা।

এইতো মিনিট পনেরো আগে। ধরা গলায় উত্তর দিল আসলাম।

কি পড়ছো ওটা? আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর বইটার উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, ও গীটাঞ্জলী? এ নাইস, নাইস বুক। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেশের ভাবী শিক্ষাকর্তা, ট্রলির বাবা। বললেন, গীটাঞ্জলী, ওঃ! চমৎকার বই! মিলটনের একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালবৈশাখী দূরন্ত ঝড়ে নড়বড়ে চালাঘরটা ধসে পড়লো মাটিতে। বিন্তি জানতো না সে খবর।

মিয়া বাড়িতে ধান ভানতে গিয়েছিল সে। ফিরে আসতেই রাস্তায় মনার মা বললো, তখনই কইছিলাম বৌ ঘরডারে একটু মেরামত কর। তা তো কইরলা না এহন–

এহন কি অইছে বুয়া? শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বিন্তি। মনার মা বললো, কি আর অইবো বাপু। ঘরডা পইড়া গেছে তুফানে।

পইড়া গেছে? ইয়া আল্লা! হাত পাগুলো সব ভেঙ্গে এলো বিন্তির। করুণ কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো সে। তিনডা কাচ্চাবাচ্চা নিয়া কোনহানে যামু আমি। কেমন কইরা ঠিক করমু ওই ঘর। আল্লারে–আল্লাহ।

বিন্তির কান্নাটা বুকে বড় বিঁধলো মনার মার। কি আর কইরবা বৌ। খোদার কাছ থাইকা দুঃখই আনছো; দুঃখই টানতে অইব জীবনভর। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। সোয়ামীটাও অকালে মারা যাওনে, আহ; তোমার এত দুর্দশা।

তার কথা আর কও ক্যান বুয়া। হে যেইদিন মরছে হেইদিন থাইকাই তো ভাঙছে এ পোড়া কপাল। কথা শেষে কান্নার বেগটা আরো একটু বাড়লো বিন্তির। আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মনার মা। কথায় কয়, সোয়ামী নাই যার দুনিয়াই আন্দার তার।

স্বামী অবশ্য এককালে ছিল বিন্তির। হাসিখুশি ভরা মানুষ। শক্ত–সামর্থ্য দেহ। বিন্তিকে কতই না ভালবাসতো সে। হাটে গেলে রোজ ঠোঙ্গায় করে চার পয়সার বাতাসা কিংবা দু'পয়সার ডালমুট নিয়ে আসতো বিন্তির জন্য। আদর করে হাতের মুঠোয় পুরে দিয়ে কানে কানে বলতো, সোনাদানা কিছু নাই, আর কি দিমু তোরে। আল্লা মিয়ায় গরিব কইরা বানাইয়াছে মোরে। তারপর– একদিন অকস্মাৎ জ্বরে পড়লো সে। টিপরা রাজার দেশে পাহাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়েছিল শীতের মৌসুমে। ফিরে যখন এলো তখন ম্যালেরিয়ায় হাড্ডিসার হয়ে গেছে আবুল। দেখে প্রথমে আঁতকে উঠেছিল বিন্তি। ইয়া আল্লা, এই কাল ব্যামোয় কেমন কইরা ধরলো তোমারে। কেমন কইরা এই অবস্থা অইলো তোমার।

কথা কইও না বৌ। কথা কইবার পারি না। জলদি গায়ে কাঁথা চাপা দে। জ্বরে তখন ঠকঠক করে কাঁপছিলো আবুল। চাটাইয়ের উপর শুইয়ে দিয়ে, গায়ে ওর কাঁথা চাপা দিল বিন্তি।

বিপদ আসেতো সব দিক দিয়েই আসে।

মিয়াবাড়িতে তখন ধান ভানার কাজ করতো বিন্তি। তিন মণ ওজনের ঢেঁকি; ঘন্টাখানেক ভানতেই পায়ে ব্যথা করে ওঠে। শরীর অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হতেই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল আর পায়ে ভীষণ আঘাত পেলো বিন্তি। হাটুর নিচটা অসম্ভব রকম ফুলে গেলো দেখতে না দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো সাতটি দিন আতুরের মতো ঘরে বসে ছিল সে। আবুলের তখন শেষ অবস্থা। তো জ্বরের ঘোরে যা তা বকতে শুরু করেছে সে। এক ফোঁটা পথ্য কি ঔষুধ কিছুই ছিল না ঘরে। আবুল মারা গেল ওর মৃত্যুতে উঠানে গড়াগড়ি দিয়ে অসম্ভব কেঁদেছিল বিন্তি। পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদেছিল সে।

পাড়াপড়শীরা সান্ত্বনা দিয়েছিলো। কাইন্দা কি অইবে আবুর বৌ। কাঁদলে কি আর আবুরে ফিরা পাইবি?

এত কান্দিস না বৌ। কান্দলে পর খোদা রাগ করবে। বিন্তির দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছিলেন বুড়ো কাশেস মোল্লা। খোদার মাল খোদা নিয়া গেছে। তাতে কাইন্দবার কি আছে। কাইন্দা কি লাভ? হের থাইকা সোয়ামীডার যাতে পরকালে সদগতি অয় তার চেষ্টা কর। দুই চারডা মোল্লা ডাইকা খতম পড়া। কিছু দান খয়রাত কর।

দান খয়রাত করতে অবশ্য কার্পণ্য করেনি বিন্তি। ইহকালের মাটিতে শুধু মাত্র দু-পয়সার কুইনাইনের অভাবে স্বামীকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলেও স্বামীর পরকালীন সুখ অভাবে শান্তির জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করেছে সে। সে সব দীর্ঘ পাঁচ বছর আগের কথা।

মাটিতে থুবড়ে পড়া কুঁড়েটার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের ঘটনাগুলোই চোখের উপর বুলিয়ে নিচ্ছিল বিন্তি।

মনার মা বললো, ভাবনা চিন্তা কইরা আর কি কইরবা বৌ। ঘরটা কেমনে মেরামত কইরবা এহন সেই চেষ্টা কর। কাচ্চাবাচ্চাগুলোরে নিয়াতো আর উঠানে রাইত কাটান যাইবো না।

মনার মার কথায় ওর দিকে মুখ তুলে তাকালো বিন্তি।

না–না, আইজ রাইতের লাইগা চিন্তা নাই। আইজ রাইতটা না অয় আমার ঘরেই কাটাইলা। সহানুভূতির সাথে বললো মনার মা।

বাড়ির মুরুব্বি মনু পাটারী বললো, দুঃখ করিস না বিন্তি। খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে। জানেন উপর দিয়া আইছিলো, মালের উপর দিয়া গেছে। কিছু দান খয়রাত কর তুই, দুই চাইরডা মোল্লা ডাইকা খতম পড়া।

হ-হ- তা–তো কইরবই। খোদার কামে গাফেলতি করন ঠিক না। মনুকে সমর্থন জানালো মনার মা।

সে রাতটা, মনার মার ছোট্ট কুঁড়েতেই ছেলেপিলে নিয়ে কাটালো বিন্তি।

পরদিন ভোর সকালে বড় মিয়ার দোরগোড়ায় ধরনা দিল সে।

বড় মিয়া পাকা পরহেজগার লোক। দু' দু'বার হজ্জ করে এসেছেন তিনি। বিন্তির দুঃখের কথা শুনে বললেন, আবু বড় ভালা মানুষ আছলো বিন্তি। তুই তার বৌ। তোরে সাহায্য করমু না কারে করমু। বিন্তির হাতের বালা জোড়া, লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে, তাকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিলেন বড় মিয়া। সময় মতো টাহাগুলো ফেরত দিয়া তোর জিনিস তুই নিয়া যাইস। কেমন?

মহাজনী কারবার করেন বড় মিয়া। তবে, সুদ খান না। সুদের নাম কেউ নিলে, গালে চাটি মেরে সাতবার তওবা পড়ান তাকে। লোকে অলঙ্কারপত্র বন্ধক রাখে। বড় মিয়া দু'চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তাদের। তবে, শর্ত আছে একটা। মাস তিনেকের মধ্যে টাকা শোধ না দিতে পারলে, অলঙ্কারগুলো বড় মিয়ার হয়ে যায়। মালিকের তাতে কোন অধিকার থাকে না। আর তাই বড় মিয়ার লোহার সিন্দুক দিন দিন ভর্তি হয়ে আসে।

বালা বন্ধক রেখে আনা টাকা দিয়ে ভাঙ্গা ঘর মেরামত করলো বিন্তি। পুরোনো খুঁটি, পুরোনো খড় আর পুরোনো বেড়াগুলোকেই জোড়াতালি দিয়ে নতুন করে দাঁড় করালো কোন রকমে।

ঘরটা মেরামত করতে করতে সঈদ কামলা বললো, আরো কিছু টাহা খরচ কইরলে ভালা অইতো আবুর বৌ। এই জোড়াতালি দেয়া ঘর তুফান আইলেই তো আবার পইড়া যাইবো।

কি করমু চাচা। অসহায় ব্যাকুলতায় হু হু করে কেঁদে উঠলো বিন্তি। খোদা, খোদাই ভরসা আমার।

তাতো ঠিকই কইছ বৌ। খোদাইতো সব। খোদায় ইচ্ছা কইরলে সুখ দিবার পারে মানুষেরে, ইচ্ছা কইরলে দুখ। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সঈদ কামলা।

মনার মা বললো, আহা– কথায় কয় মাটি দিয়া বানাইছ খোদা, মাটির নিচে নিবা। বেহেস্তে কি দোজখ তুমি; তোমার ইচ্ছা মতো দিবা।

করিম মোল্লা বোধ হয় বিকেলে হাট করতেই বেরিয়েছিলেন।

বিন্তির নতুন ঘরটার দিকে চোখ পড়তে, দরদ ভেজা কণ্ঠে বিন্তিকে ডেকে বললেন, আবুর বৌ, খোদারে ফাঁকি দিও না। দু'চার জন মোল্লা ডাইকা নতুন ঘরে মিলাদ পড়াও। নইলে ঘরের ভিটা পাকা অইবো না।

মিলাদ পড়ানোর কথাটা বিন্তিও ভাবছিলো মনে মনে।

নতুন ঘর উঠালে মিলাদ পড়ানো রেওয়াজ। মিলাদ না পড়ালে ঘরে ফেরেস্তা আসে না আর যে ঘরে ফেরেস্তা আসে না সে ঘরের উন্নতি নেই; স্থায়িত্ব নেই– তা ভালো করেই জানে বিন্তি। তাই, আবার বড় মিয়ার দোরগোড়ায় হাজির হলো সে।

মিয়া গিন্নি ছমিরন বিবি তখন উঠানে ধান শুকাচ্ছিলেন বসে বসে। আর বার বার তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে। বৈশাখের আকাশ এই রোদে ভরা, আর এই মেঘে ঢাকা। কোথায় থেকে হঠাৎ এত মেঘ এসে হাজির হয় তা ভাবতে অবাক লাগে ছমিরন বিবির। তাই, একসাথে ধান আর আকাশ দুটোকেই পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি বসে বসে। মেঘ দেখলেই ধানগুলো ঝটপট ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন এই ইচ্ছে তাঁর।

বিন্তির দুঃখের কথা শুনে বড় আফসোস করলেন ছমিরন বিবি। আহা তোর কপালডা তুই খাইবার আছস বিন্তি। কইলাম, ছেইলা মাইয়াগুলোরে কারো হাওলা কইরা দিয়া কারো সঙ্গে 'সাঙ্গা' বইয়া যা তুই। যৌবন এহনো ঢলঢল কইরবার আছে তোর গায়ে। সাঙ্গা বইতি চাইলে তুই হাজার জনে এহন সাঙ্গা করতে চাইবো তোরে। ক্যান বেহুদা নিজেরে শুকাইয়া মইরবার আছস তুই।

ছমিরন বিবির কথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো বিন্তি। তারপর বললো। না আম্মাজান মইরা গেলেও সাঙ্গা বইমু না কারো কাছে। তাইলে ছেইলা মাইয়াগুলা আমার উপাস মরবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ছমিরন বিবি। হঠাৎ চোখ পড়লো তাঁর আকাশের দিকে। দক্ষিণ থেকে একটা বিরাটকায় কালে মেঘ উঠে আসছে আকাশে। ওরে ও বিত্তি। আমার ধানগুলোরে একটু ঘরে তুইলা দে। জলদি কর জলদি কর বৃষ্টি যে আইয়া পড়লো।

মিয়া গিন্নির ধানগুলো ঘরে তুলে দিয়ে– কাপড়ের আঁচলে ঘাম মুছে নিয়ে সসঙ্কোচে বড় মিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিত্তি। কয়ডা টাহা ধার দেন হুজুর।

ধার দিতে আমার কোন আপত্তি আছেরে আবুর বৌ। আমার কি কোন আপত্তি আছে। সাদা দাড়িগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন বড় মিয়া। কিন্তুক, কিছু একডা তো বন্ধক রাইখতে অইবো তোরে। এমনে কেমন কইরা টাহা দেই।

আমার কাছে একডা তামার বাটিও নাই হুজুর। জোড়হাতে অনুনয় করলো বিত্তি। কয়ডা টাহা দেন।

কইলাম তো কিছু বন্ধক না রাইখলে টাহা দিবার পারমু না।

তাইলে আমার কি অইবো হুজুর। আমার কি অবস্থা অইবো। বিত্তি কেঁদে উঠলো এবার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলেন বড় মিয়া। তারপর বললেন। তোর ঘর ভিটিটাই না অয় বন্দক রাখ না আমার কাছে।

তা কেমন কইরা অয় হুজুর। বড় মিয়ার আকস্মিক প্রস্তাবে রীতিমত ঘাবড়ে গেলো বিত্তি। ভিটেবাড়ি বন্ধক রাখবে এ কেমনতর কথা? বিত্তিকে এ নিয়ে চিন্তা করতে দেখে অভিমানহত হলেন বড় মিয়া।

এতে এত চিন্তা কইরবার কি আছে বিত্তি। আমি কি কোনদিন তোগো কোন খারাবি করছি। না করবার চাই?

না-না, তা ক্যান কইরবেন হুজুর। তা ক্যান কইরবেন। বাধা দিয়ে বললো বিত্তি। আপনে আমাগো মা–বাপ।

বিত্তির কথায়, দরদ যেন উছলে বড় মিয়ার কণ্ঠে। তোরে বিনা বন্ধকেই কিছু টাকা ধার দিবার ইচ্ছা আছিল বিত্তি। কিন্তু হায়াত মউততো কায়েম না হাওলাত বরাত রাইখা মইরা গেলে কেয়ামতের দিন দায় দিবার লাগবো তাই কইবার আছিলাম– বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বড় মিয়া। আল্লার কুদরতের শান কে বুঝবার পারে। তোর মতো গরিব দুঃখীদের বাঁচাইবার লাইগাইতো আল্লায় আমাগো মতো দুই চাইরজন বড় মানুষের পাঠাইছে দুনিয়ার পরে। কথা শেষে তছবি পড়ায় মন দিলেন বড় মিয়া।

দ্বিমত করিছ না বিত্তি রাজি অইয়া যা। বড় মিয়ার হয়ে ওকালতি করলেন সুলতান মৌলভী। আল্লার ওলি মানুষ একডা কথা কইছে কথাডা ফালাইস না, বদদোয়া লাগবো।

বদদোয়াকে ভীষণ ভয় করে বিত্তি। খোদাভক্ত, পরহেজগার মানুষের বদদোয়া বড় সাংঘাতিক জিনিস। বিত্তির মনে আছে– এ গাঁয়ের কেতু শেখকে একবার বদদোয়া দিয়েছিলেন এক পীর সাহেব। সেই বদদোয়াতেই তো গোষ্ঠী শুদ্ধ লোপ পেলো কেতুর। এক এক করে সবাই মরলো। এখন একেবারে ফাঁকা বাড়ি খাঁ খাঁ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদদোয়ার ভয়ে অগত্যা রাজি হয়ে গেলো বিন্তি। একটা সাদা কাগজে কি সব লিখে, তার ওপর বিন্তির টিপসই নিলেন বড় মিয়া। তারপর, এক টাকার বারটা ময়লা নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে।

মোল্লা খাওয়ানোর সময়, মুরগির হাড্ডি চিবোতে চিবোতে বিন্তির রান্নার অজস্র প্রশংসা করলেন কাশেম মোল্লা। বললেন, আহা বড় স্বাদের রাঁধা আবুর বৌ। বড় স্বাদের রাঁধা রাঁধছ।

সুলতান মৌলভী বললেন, আরো দু'এক টুকরো গোস্ত দাও না আবুর বৌ। কেপ্পনি কর ক্যান। খোদার কামে কেপ্পনি ভালা না। ঠিক-ঠিক। কাসেম মোল্লা সমর্থন জানালেন তাকে। খোদার কামে কেপ্পনি ভালা না বৌ। আমারে আর চাইডা ভাত আর একটুহানি সুরুয়া দাও।

খাওয়া শেষে মিলাদ পড়লেন সবাই। বিন্তির জন্যে দোয়া করলেন অকৃপণ কণ্ঠে। তারপর, নতুন ঘরের চার কোণে চারটে তাবিজ পুতে ঘরময় পড়ানো পানি ছিটোলেন কাসেম মোল্লা। ঘাবড়াইস না বিন্তি। খোদার উপরে আস্থা রাহিস। খয়রাতি পয়সাগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন সুলতান মৌলভী।

আকাশ বেয়ে তখন অসংখ্য মেঘ অস্বাভাবিক গতিতে ছুটে চলেছে দূর দিগন্তের দিকে। বৈশাখ এখনও শেষ হয়নি।

ঝাঁপিটা লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো বিন্তি। কাল বৈশাখীকে আর কোন ভয় নেই তার। ভয় নেই কোন দূরন্ত ঝড়ের কঠোর ভ্রূকুটিকে। ঘরে ফেরেস্তা এনেছে সে। খোদার ফেরেস্তা। যে খোদা এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছে। যার ইঙ্গিতে চলছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।

প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠলো বিন্তির মুখখানা।

মাঝরাতে হঠাৎ কিসের প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ওর। প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। কাসেম মোল্লার তাবিজ; সুলতান মৌলভীর পড়ানো পানি; খোদার ফেরেস্তা। সব কিছুর প্রতি এমন চরম উপেক্ষা; এ কোন শক্তি। ভাঙ্গা হাতের কব্জিটাকে চেপে ধরে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশের দিকে তাকালো বিন্তি।

সকাল বেলা বড় মিয়ার মেজ ছেলেকে উর্দু পড়াতে যাচ্ছিলেন কাসেম মোল্লা। বিন্তির ভাঙ্গা কুঁড়েটার দিকে চোখ পড়তে অনেক আফসোস করলেন তিনি। খোদা তোরে পরীক্ষা কইরতাছে বিন্তি। আহা- খোদার কুদরতের শান কে বইলবার পারে।

ছাগলে দাড়িগুলোর ভেতর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন তিনি, হয়ত কোন বড় মুছিবত আছিলো তোর উপর। খোদার ছোট্ট মুছিবত দিয়া পার কইরলেন সেইডা। ঘাবড়াইস না। এহন কান্নাকাটি কইরা খোদার কাছে মাপ চা। খোদার রাস্তায় কিছু খরচ কর। আহা- খোদায় যা করে ভালার লাইগাই করে।

খোদায় যা করে ভালোরা লাইগাই করে। কাসেম মোল্লার দিকে তাকিয়ে কাঁপা ঠোঁটে অদ্ভুতভাবে হাসলো বিন্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটাকে এর আগেও ক'দিন দেখেছে মন্তু। হ্যাংলা রোগাটে দেহ। তেলবিহীন উস্কোখুস্কো চুল। লম্বা নাক, খাদে ঢোকা ক্ষুদে ক্ষুদে দু'টি চোখ; সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত দেহটা টেনে টেনে নবাবপুরের দিকে এগোয়। কদাচিৎ বাসে চড়ে।

বাস স্টান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনে একটা আধপোড়া বিড়ি টানছিলো আর লোকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলো মন্তু।

পত্রিকার হিসেবে মন্তু এবার পনের-এর ব্যূহ ভেদ করবে। অর্থাৎ নাবালকের ডিঙ্গি থেকে াসাবালকের ডাঙ্গায় পা দেবে। বয়স সবে পনের হলেও নিদেনপক্ষে বার পাঁচেক জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে মন্তু-মন্তু শেখ।

ভাবতে গেলে জীবনটাই অদ্ভুত মন্তুর।

আরও অদ্ভুত লাগে, যখন সে নিজে বসে বসে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবে।

সুখীয়াল স্বপ্নে ভরা দিন।

তখন নেহায়েৎ বাচ্চা ছিলো মন্তু। সূর্য উঠতেই ক্ষেতের আইলে বাবার জন্য হুকো আর পান্তা নিয়ে হাজির হতো সে। বাবা জমিতে হালচাষ করতেন; মই দিতেন; আর ধান বুনতেন।

বছর শেষে যা ফসল ঘরে আসতো তা দিয়ে কোন রকমে দিন চলে যেতো ওদের।

বাবা বলতেন, মন্তুরে আমার লেখাপড়া শিখামু। ইসকুলে পাঠামু ওরে।

কি যে কও মিয়া! লেখাপড়ার আবার কদর আছে নাকি আজকাইল। নূরু চাচা বোঝাতেন বাবাকে। উয়ার চাইতে ক্ষেতের কাজ ভালা। ভালা কইরা চাষ কইরলে সোনা ফলে। মন্তুরে ক্ষেতের কাজ শিখাও।

না বাপু, তা অইবার নয়। মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়তেন বাবা।

বাবার চোখে স্বপ্ন ছিলো।

সে স্বপ্ন ভাঙতে দেরি হলো না।

তখন যুদ্ধের মওসুম। সৈন্যরা এসে জমিগুলো সব দখল করে নিলো ওদের। সেখানে ঘাঁটি করবে ওরা। প্লেন ওঠানামার ঘাঁটি।

সৈন্যরা এলো।

সাথে নিয়ে এলো অসংখ্য ট্রাক, লরি আর বুলডোজার।

আরো যে দুটো জিনিস সাথে করে এনেছিল ওরা, তা হলো দুর্ভিক্ষ আর মহামারী।

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে হারালো মন্তু। গাঁও ছেড়ে দলে দলে লোক ছুটছে শহরের পথে। সারি সারি লোক চলছে তো চলছেই। তেমনি একটা দলের সাথে শহরে চলে এলো মন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর নয়তো প্রেতপুরী। পথে ঘাটে, ডাস্টবিনে মৃতের ছড়াছড়ি। অলিতে গলিতে অসংখ্য ক্ষুধিতের মিছিল। সে মিছিলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল মন্তু। এমনি সময় দেখা ওর জুলমত সিকদারের সাথে। শহরে তখন পকেটমারের এক বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে জুলমত। মন্তুকে দেখে বললো, এখানে কেন পড়ে পড়ে মরছিস বাপু। আয় আমার সাথে আয়। রোজগারের বন্দোবস্ত করে দেবো!

জুলমতের কাছেই প্রথম হাতেখড়ি পড়লো মন্তুর। কালু, মতি, হীরা ওরাও ছিলো ওর সাথে। মতি নাকি সম্প্রতি ব্যবসা ছেড়ে কোন এক মন্ত্রীর কনফিডেন্সিয়াল এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছে। চালাক ছেলে বটে, লোকে বলে মানিকে মানিক চেনে। একবারে খাঁটি কথা।

বিড়িটা শেষ হতে কায়দা করে সেটা নর্দমায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে চকের দিকে এগুতে লাগলো মন্তু।

হোটেলে ঢুকে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিল সে। তারপর ওহিদ আলীর পানের দোকান থেকে কিমাম দেয়া একটা পান মুখে পুরে আর একটা বিড়ি ধরালো।

কিরে মন্তু, আইজকা কিছু রোজগার অইল? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওহিদ আলী।

আরে, মরদ কি কোন দিন খালি হাতে ফেরে! মুখের কোণে গর্বের হাসি টেনে পকেট থেকে একটা জ্বলজ্বলে আংটি বের করে ওহিদ আলীকে দেখালো মন্তু।

বিস্ময়ে চকচক করে উঠলো ওহিদ আলীর চোখ দুটো। মন্তু তখন আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

আংটিটার জন্য আজ সারাটি সকাল হয়রান হতে হয়েছে ওকে। বাব্বাঃ যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। আংটি একটা কিনবে তো তিন ঘন্টা ধরে তিনশ তিরিশটা আংটি পরখ করে তারপর কিনলো এটা। ছেলেটা বললো, নাও, হাতে পরে নাও তোমার।

না, এখন না, পরে পরবো। মেয়েটা বললো, কোটের পকেটে রেখে দাও তোমার।

মন্তুর বরাত! বরাত জোরই বলতে হবে। নইলে এই পকেটমারের যুগে কোটের পকেটে ভুলেও কেউ অলঙ্কার রাখে।

জেল রোডের মোড়ে এসে আংটিটাকে আর একবার পরখ করে দেখলো মন্তু। উঁচু দেয়ালে ঘেরা জেলটার দিকে চোখ পড়তে বিনয়ের সাথে জেলকে একটা সালাম ঠুকলো সে। জেল তার গুরু। এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

একবার জেলে গেছে পাঁচ দশটা নতুন রকমের প্যাঁচ, নতুন রকমের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে রেখেছে সে। গুরু মানবে না কেন? গুরুই তো। গুরুকে আর একটা সালাম ঠুকলো মন্তু। আংটিটা তখনও মুঠোর মধ্যে ওর।

পরীবানুর ছবিটা চোখের পাতায় ভেসে উঠছে এখন।

নবী সিকদারের লাল টুকটুকে নাতনী পরীবানু। একদিন এ আংটিটা আঙুলে পরেই মন্তুর পাশে এসে দাঁড়াবে সে। পরীবানু। পরীবানু নয় ফুলপরী। ও নামেই ওকে ডাকে মন্তু। ও নামেই আদর করে ওকে। সিকদার ব্যাটা বড় খিটমিটে লোক। সেদিন বললে, এত ফুছুর-ফাছুর ভালো লাগে না মিয়া। বিয়ে করতে চাও তো বলো। মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে দিই।

হক কথা। এই তো চায় মন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইলেই হলো। অলঙ্কার পত্তর নেই, কিছু নেই, মেয়ে কি মাগনা নাকি? ব্যাটা সিকদার এক মুখে চার কথা বলে। তিনপদ অলঙ্কার ফেলে দাও দিখিনি। এখনই নাতনীকে হাতে তুলে দিচ্ছি তোমার। শালা–চামার, চামার।

মত্তুকে বুঝেছে কি সে? তিনপদ অলঙ্কার বুঝি জোটাতে পারবে না মত্তু। এইতো আজকেই জুটিয়ে ফেলেছে সে একপদ। আর দু'পদে কয়দিন লাগবে। এক হপ্তা কি পনেরো দিন। বড় জোর এক মাস তারপর- তারপর ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হলো মত্তু।

বংশালের মাথায় এসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ালো সে।

মুকুলে একটা ছবি এসেছে। কালু বলেছে বড়ো মজাদার ছবি। শেষ শো'তে একটি চান্স নিলে মন্দ হয় না। আপন মনে কয়েকটা শিস্ দিলো মত্তু।

শো শেষ হলো রাত বারোটায়। কালো মেঘে ঢাকা গাঢ় অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন। হল থেকে বেরিয়ে, সোজা রাস্তায় এসে নামলো মত্তু। বগলে ওর সদ্য হাত সাফাই করা একটা বাঘ মার্কা ছাতা।

ছাতাটা মেলে ধরে জনশূন্য নবাবপুর রোড বেয়ে এগিয়ে চলতে বেশ লাগছিলো মত্তুর। গুন্‌গুন্ করে সদ্য দেখা সিনেমার দু'কলি গান ভাজতে লাগলো সে।

হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো মত্তু। একটু ভালো করে তাকাতে চিনলো সে। সেই লোকটা– সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত দেহটা টেনে টেনে রোজ যে নবাবপুরের দিকে এগোয়। হ্যাংলা–রোগাটে দেহ। তেলবিহীন রুক্ষ চুল। লম্বা নাক। খাদে ঢোকা ক্ষুদে ক্ষুদে দু'টি চোখ। মত্তুর মনে হলো লোকটা যেন পিটপিট করে তাকাচ্ছে ওর দিকে। না, ঠিক ওর দিকে নয়, ওর ছাতাটার দিকে।

ছাতার বাটটা শক্ত করে চেপে ধরলো মত্তু।

বৃষ্টিটা আরও একটু জোরে আসতেই লোকটা পা চালিয়ে ছাতার নিচে এসে দাঁড়ালো মত্তুর। উঃ এ বৃষ্টিতে ভেজা মানে বির্ঘাত নিউমোনিয়া। একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে মত্তুর দিকে তাকালো সে। গা–টা জ্বলে উঠলো মত্তুর। ইচ্ছে হলো এখনি ধাক্কিয়ে লোকটাকে রাস্তার একপাশে ফেলে দিতে। কিন্তু লোকটার হ্যাংলা দেহটার কথা ভেবে তা করলো না মত্তু। শুধু বার কয়েক চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে দেখলো তাকে।

আপনি কোনটায় গেছলেন? কথা না বলাটা অভদ্রতার পরিচয়, তা ভাল করেই জানে মত্তু।

কোনটায় মানে?– আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

লোকটার বোকা বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেলো মত্তুর। এরাত বারোটার সময় মানুষ কোত্থেকে ফিরতে পারে,–লোকটা মত্তুকে এত অবুঝ মনে করলো নাকি?

আসছেন কোত্থেকে। সোজা পথেই এবার জিজ্ঞেস করলো সে।

দৈনিক দেশের কথা অফিস থেকে।

সেখানে কাজ করেন বুঝি?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে সেক্রেটারিয়েটের ওখানে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, ওখানেও কাজ করি আমি। এল, ডি, ক্লার্ক। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা। ওখান থেকে আর বাড়ি যাইনে, সোজা চলে আসি পত্রিকা অফিসে। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায়।

দিন পনেরো ঘণ্টা কাজ করেন! বলেন কি সাহেব? তাহলে তো বেশ সুখেই আছেন। অনেক টাকা রোজগার হয়। এত টাকা করেন কি? মুরুব্বিয়ানা চালে কথাগুলো বললো মন্তু।

ম্লান হাসলো লোকটা। পরিবারটা তো আর নেহায়েত ছোট নয়, ভাইবোন সবাই মিলে মোট বারো জন। তা– দেড়শো টাকায় কিই বা হয়।

মাত্র দেড়শো টাকা। চোখ দুটো কপালে উঠলো মন্তুর। একটা লোক দিন পনেরো ঘণ্টা কাজ করে মাসের শেষে পায় মাত্র দেড়শো টাকা!

বোকা, বোকা, লোকগুলো সব কি বোকা। হো–হো করে হাসতে ইচ্ছে হলো মন্তুর।

আপনি কি করেন? এবার মন্তুর উত্তর দেবার পালা।

আমি? আমি বিজিনেস– মানে ব্যবসা করি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিলো মন্তু।

কিসের?

এই ছোটখাট– মানে সামান্য কারবার।

কথার ফাঁকে একটা জীর্ণ দালানের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। চুনকাম পড়েনি সে দালানে, কতদিন, কত বছর হবে তা কে জানে!

নড়বড়ে দরজার কড়াটা বারকয়েক নাড়তেই একটা বিদঘুটে শব্দ করে খুলে গেলো দরজাটা। দরজার ওপাশে একটা নারী ছায়ামূর্তির অস্তিত্ব অনুভব করলো মন্তু।

আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন। বৃষ্টিটা থামুক, তারপর যাবেন। আসুন।

দ্বিরুক্তি না করে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো মন্তু।

তখন শুধু বৃষ্টি নয়। বৃষ্টির সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তে শুরু করেছে। রাস্তায় পানি জমেছে অল্প অল্প।

কিন্তু ঘরে যা অন্ধকার, সামনে এগোনোই বিপজ্জনক। তাই দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলো মন্তু। লোকটা ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর তার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো ভেতরে। একটা বাতি না হলে চলবে কি করে, ভদ্রলোক এসেছেন।

কিন্তু কি করবো বলো। ঘরে যে এক ফোঁটা তেলও নেই।

কারো কাছ থেকে অল্প একটু ধার আনা যাবে না?

ধার করে করেই তো এ তিন দিন চলেছি। মেয়েলী কণ্ঠে মিনমিনে আওয়াজ।

একটা অজানা পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে মন্তুর চোখের পর্দায়। স্থির পাথরের মতো তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন– আসুন। অন্ধকারের ভেতরে ওর দিকে একটা হাতলভাঙ্গা চেয়ার এগিয়ে দিলো লোকটা। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। নইলে পথের মধ্যে বৃষ্টিতে কি যে অবস্থা হতো। হাত দুটো বারকয়েক কচলালো লোকটা।

মন্তু বসলো।

বাতি এলে, ঘরের চারপাশে আলতো চোখ বুলিয়ে নিলো মন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট অপরিসর ঘর। মাঝখানে একটা চটের বেড়া দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। একটা দড়ির খাটিয়া। একটা পুরোনো টেবিল, একটা চেয়ার আর দেয়ালে একটা ছোট্ট আলনা।

বার কয়েক ভ্রূ কোঁচকালো মন্তু।

এ্যা! মা, আমার টাকা! টাকা গেলো কোথায় মা? বুকফাটা চাপা আর্তনাদে চমকে উঠে ফিরে তাকালো মন্তু। লোকটা কি হার্টফেল করবে নাকি? নইলে অমন করছে কেন?

টাকা! টাকা! টাকা! কি সর্বনাশ হলগো আমাদের। কি সর্বনাশ হলো! সরু মোটা অনেকগুলো কণ্ঠের চাপা গোঙানির শব্দ যেন চাবুক মেরে গেলো মন্তুর বুকে, পিঠে, পেটে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

কি হয়েছে। আপনারা অমন করছেন কেন? ঠিক নিজেও বুঝতে পারলো না মন্তু। কখন সে সবার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা কঁকিয়ে যা বললো, তা শুনে রীতিমত ঘামিয়ে উঠলো সে। সেক্রেটারিয়েট থেকে পাওয়া একশ'টি টাকা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে পকেট থেকে। বাসে করে যখন সংবাদপত্রের অফিসে গিয়েছিলো, তখন বোধ হয় কেউ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে বলে তার ধারণা।

ওইতো, আপনার বুক পকেটেই তো রয়েছে টাকাগুলো। আনন্দে আটখানা হয়ে পড়লো মন্তু, যেন এভারেস্টের চূড়োয় উঠেছে।

না না, ওগুলো 'দেশের কথা' থেকে পেয়েছি। ওখানে পঞ্চাশ টাকা। সরবে প্রতিবাদ জানালো লোকটা। তারপর নির্বিকারভাবে মুখের লাগাম খুলে দিলো সে পকেটমারের চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চটকাবার উদ্দেশ্যে।

মন্তু তখনো নির্বাক।

বাইরে তখন ঝড় বইছে। বাজ পড়ছে প্রচণ্ড শব্দে।

রাস্তায় হাঁটুর উপর পানি।

বৃষ্টি থামলো না। বরং আরো বেড়ে গেলো।

আর, তাই মন্তুর যাওয়া হলো না।

টাকার শোকে একেবারে মুষড়ে পড়লেও, অতিথি সৎকার করতে ভুললো না লোকটা। ছেঁড়া কাঁথার ওপর বৌ-এর একখানা পুরোন শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে মন্তুর শোবার বন্দোবস্ত করে দিলো।

হ্যাঁ না কিছুই বললো না মন্তু। সোজা শুয়ে পড়লো সে।

শুলো কিন্তু ঘুমালো না। জেগেই রইলো মন্তু। আর অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই কতক্ষণে ঘুমায়।

দেয়ালের সাথে ঝুলান সাটের বুক পকেটে পঞ্চাশটা টাকা। পাঁচখানা দশ টাকার কড়কড়ে নোট! কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না সে।

দূরে কাদের দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হলো।

নিরালা পৃথিবী, নিঃশব্দ তন্দ্রায় নিমগ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি সাবধানে উঠে দাঁড়ালো সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে। আর একটু এগুতেই, কান্না মেশানো স্বরে কে যেন বললো, মাগো, হাঁড়িতে কি একটা ভাতও নেই। পেটটা যে পুড়ে গেলো।

অজানা পৃথিবীর আর এক পাঠ!

রীতিমত শিউরে উঠলো মন্তু।

বাচ্চা মেয়েটা এখনও ঘুমোয়নি। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেমন করেই বা ঘুমোবে সে।

মায়ের সান্ত্বনাবাক্য শোনা গেলো একটু পরে। কি আর করবে মা! রাতটা যে কোনমতে কাটাতেই হবে।

একটা কচি মেয়ে কিছু না খেয়েই রাত কাটাবে? পকেটে হাত দিয়েও টাকাগুলো নিতে পারলো না মন্তু। মোট দেড়শ'টি টাকা। এ দিয়েই এদের কোনমতে মাস কাটাতে হয়। এবার মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে কেমন করে চলবে এরা? মরে যাবে নির্ঘাত, মরে যাবে! মরে যাবে ওই কচি মেয়েটা! ওর হাড় বের-করা বউটা! আর ওই বাকি যে ক'জনা আছে সবাই। সবাই ওরা মরে যাবে। উঃ! ভাবতে গিয়ে মন্তুর কাঠিন্যে ভরা প্রাণটাও যেন কেমন করে উঠলো আজ। নিজের অভাব ভরা অতীত মনে পড়লো।

দূরে কার দেয়ালঘড়িতে আরো দুটো শব্দ হলো।

আর দেরি করলো না মন্তু। নিঃশব্দে পকেটের ভেতর হাতটা ঢুকিয়ে দিলো সে। সোনার আংটিটা এ আঁধারের ভেতরও কেমন চিক্‌চিক্ করছে। দু'হাতে আংটিটা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলো সে। পরীবানুর মুখটা ভেসে উঠলো চোখের পর্দায়।

মন্তু চোখ বুজলো।

চোখ খুললো।

তদারপর আস্তে আংটিটা ছেড়ে দিলো দেয়ালে ঝোলান শার্টের বুক পকেটে। খস করে একটা শব্দ হলো সেখানে। তাও কান পেতে শুনলো। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খল-খলিয়ে হাসছে আকাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোস্টার

দূর থেকেই দেখলেন আমজাদ সাহেব। লাল কালো হরফে লেখা অক্ষরগুলো সকালের সোনালি রোদে কেমন চিকচিক করছে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

বাজারে এক মেছুনীর সাথে ঝগড়া করে মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে ছিলো আমজাদ সাহেবের। তার ওপর সদ্য চুনকাম করা বাড়ির দেয়ালে এহেন পোস্টার দেখে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকলেন। আনু উ–উ।

আনুর দেখা নেই। বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লাটিম আর মার্বেল হাতে বেরিয়ে পড়েছে সে সেই ভোরে। কানু এসে বললো, কি বাবা? তোকে কে ডেকেছে। আনু কোথায়? চোখ রাঙ্গিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন আমজাদ সাহেব। এত কষ্ট করে, বাড়িওয়ালার হাত পা ধরে হোয়াইট ওয়াশ করালাম। দেয়ালে লিখে দিলাম বিজ্ঞাপন লাগিও না। তবুও– তবুও দেখ না পাজীগুলোর যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকতো। যত সব নচ্ছার কোথাকার।

আমায় গাল দিচ্ছ কেন। ওগুলো কি আমি লাগিয়েছি নাকি? মুখ ভার করলো কানু।

ছেলের কথায় আরো ক্রুদ্ধ হলেন আমজাদ সাহেব। শূয়ার কোথাকার, তোর কথা কে বলছে? বলছিলাম, যে বাঁদরগুলো এসব পোস্টার লাগায় তাদের ধরতে পারিস না? ধরে জুতোপেটা করে দিতে পারিস না তাদের? থাকিস কোথায়? রীতিমত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

পাশের বাড়ির আফজাল সাহেব বাইরে চিৎকার শুনেই বোধ হয় বেরিয়েছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার আমজাদ সাহেব? এই সকাল বেলা–?

আর বলবেন না সাহেব, সাধে কি আর চেঁচাচ্ছি। এসেই দেখুন না একবার। বলে আঙ্গুল দিয়ে দেয়ালের পোস্টারটাকে দেখালেন আমজাদ সাহেব।

ও। এ আর কি। ও তো সব জায়গায় লাগিয়েছে ওরা। শহরটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে সাহেব। তারিফ করতে হয় এই ছেলেগুলোর।

আঁ! আপনি বলছেন কি? রীতিমত অবাক হলেন আমজাদ সাহেব। আপনি ওই ছেলেগুলোর তারিফ করছেন?

তারিফ করবো না। আফজাল সাহেব বললেন। দেশের মধ্যে সাচ্চা কেউ যদি থেকে থাকে তো ওরাই আছে। ওরাই লড়ছে দেশের স্বার্থের জন্য।

আর মন্ত্রীরা বুঝি কিছু করছে না আপনি বলতে চান?

করছে না কে বলছে। আলবত করছে। আফজাল সাহেব উত্তর করলেন। খবরের কাগজে দেখেন না। আজ এখানে টি পার্টি, কাল ওখানে ডিনারের আয়োজন। পরশু নিউয়র্ক যাত্রা। করছে না কে বলছে। অনেক করছে ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা তো আপনারা বলবেনই। একচোখা লোক কিনা, তাই একদিকটাই দেখেন শুধু। বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না আমজাদ সাহেব। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

হালিমা বিবি তৈরি হয়েই ছিলেন বোধ হয়? ভেতরে ঢুকতেই মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করবার আর সময় পেলে না? এদিকে অফিসের সময় হয়ে এলো, একটু পরেই তো ভাত ভাত করে বাড়ি ফাটাবে।

স্ত্রীর সাথে এ সময়ে ঝগড়া করার মোটেই ইচ্ছে ছিলো না আমজাদ সাহেবের। তবুও কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ঘরে বসে বসে হুকুম সবাই দিতে পারে। কাজের বেলায় কেউ নয়। থলে থেকে তরকারি বের করতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেলেন হালিমা বিবি। কি বললে, কাজ করি না আমি, না? বলি এই ভোর সকালে উঠে বিছানাপত্তর গুটানো থেকে শুরু করে, ঘর ঝাড়ু দেয়া, বাসনপত্তর মাজা, চুলোয় আঁচ দেয়া এগুলো কি তুমি করেছো, না আমি। কে করেছ শুনি?

খুব একটা খারাপ কথা মুখে এসেছিলো আমজাদ সাহেবের। সামলে নিলেন অতি কষ্টে। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সামনে রোজ রোজ এ ধরনের ঝগড়াঝাটি সত্যি কি বিশ্রী ব্যাপার। স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করে গামছা আর লুঙ্গি হাতে কলগোড়ায় চলে গেলেন তিনি।

স্ত্রীর আক্ষেপভরা খেদোক্তি সেখানেও ধাওয়া করলো তাকে। কাজ করেও কোন নাম নেই। কোন স্বীকৃতি নেই। বার বছর বয়সে মাথায় ঘোমটা চড়িয়ে মিনসের ঘর করতে এসেছি। সেই থেকে কাজ আর কাজ। খেটে খেটে শরীর আমার হাড্ডিসার হয়েছে। তবুও নাম নেই, তবুও–। বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করলেন হালিমা বিবি। খোদা, আমার মরণ হয় না কেন? আজরাইলের কি চোখ কানা হয়েছে, আমায় দেখে না?

চটপট গোছলটা সেরে একটু পরেই ফিরে এলেন আমজাদ সাহেব। তখনও নিজের অদৃষ্টকে একটানা ধিক্কার দিচ্ছেন হালিমা বিবি। একটা চাকর রাখেনি লোকটা। আমায় বাঁদীর মতো খাটিয়ে নিয়েছে। একটা ভালো কাপড় কিনে দেয়নি কোনদিন। ছেঁড়া নেংটি পরে পরে আমি থাকি। তবুও নাম নেই। তবুও–।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লেন আমজাদ সাহেব। চুপ করো বলছি। নইলে এখনি গলা টিপে দেবো।

দাও না, দাও। সামনে এগিয়ে এলেন হালিমা বিবি।

সরোষদৃষ্টিতে তার দিকে এক পলক তাকালেন আমজাদ সাহেব। তারপর, আলনা থেকে জামাটা নামিয়ে নিয়ে সোজা রাস্তায় নেবে এলেন তিনি। রাস্তায় নেবে কেন যেন আবার পেছনে দেয়ালটার দিকে ফিরে তাকালেন আমজাদ সাহেব।

আর একখানা পোস্টার।

ঠিক আগের পোস্টারটার পাশেই সেঁটে দেওয়া হয়েছে। গোট গোট অক্ষরে লেখা। বাঁচার মতো মজুরি চাই।

এ মুহূর্তে কে যেন এক টিন জ্বলন্ত পেট্রোল ঢেলে দিয়েছে আমজাদ সাহেবের গায়ের ওপর। দপ্ করে জ্বলে উঠলেন আমজাদ সাহেব। আনু উ-উ।

আনু তখনো ফেরেনি! কানু এসে ভয়ে ভয়ে বললো! কি বাবা? কি–বাবা–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ–আ। তীব্র দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করলেন তিনি। তুই কেন, আনু কোথায়?

কানু বানিয়ে বললো ও স্কুলে গেছে।

ও স্কুলে গেছে, আর তুমি ঘরে বসে বসে করছো কি। আঁ? ছেলেকে ধমকে উঠলেন আমজাদ সাহেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার দেখছিস কি, যা–না একটা বাঁশ জোগাড় করে এনে নিচু থেকে গুতিয়ে পোস্টার দুটো ফেলে দে মাটিতে। আর শোন, সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই, খবরদার কেউ যেন পোস্টার–ফোস্টার না লাগাতে পারে হ্যাঁ। বুঝলি তো।

জ্বী–হ্যাঁ।

হ্যাঁ। যা বললুম মনে থাকে যেন। বলে অফিসমুখো হলেন আমজাদ সাহেব।

পেছন থেকে মেজো মেয়ে টুনি ডেকে বললো, বাবা, ভাত খেয়ে যাও। মা ভাত খেয়ে যেতে বলছে।

মেয়ের ডাকে পেছনে একবার ফিরে তাকালেও, থামলেন না আমজাদ সাহেব। আগের মতই চলতে থাকলেন।

না খেয়েই আজ অফিসে যাবেন তিনি।

শুধু আজ বলে নয়। বছরে বার মাসে তিন মাস না খেয়েই অফিস করেন আমজাদ সাহেব। কোন কোনদিন পেটের অবস্থা বেশি কাহিল হয়ে পড়লে, মোড়ে বিহারীদের সস্তা হোটেলটায় ঢুকে গোটা দুয়েক ডালপুরী আর কয়েক গ্লাস পানি খেয়ে অফিসে যান তিনি। মাসের প্রথম হলে, অফিসের পাশে দিল্লি রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে শিক কবাব আর চাপাতি উদরস্থ করেন।

AMARBOI.COM

আজ কিন্তু এ মুখো ও মুখো কোন মুখোই হলেন না আমজাদ হোসেন। অনেকটা দৌড়াতে দৌড়াতে অফিসমুখো ছুটলেন তিনি। নতুন সাহেব ভীষণ কড়া। পাঁচ মিনিট লেট হলে ডাহা পাঁচ টাকা জরিমানা করে বসে থাকে।

শা'র সাহেবের গুষ্ঠীর শ্রাদ্ধ হতো।

কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেলেন আমজাদ সাহেব। সরু বারান্দাটা পার হতেই সাহেবের সাথে একেবারে মুখোমুখি।

এই যে আমজাদ সাহেব। আজও আপনি লেট। পনেরো মিনিট।

পনেরো মিনিট নয় সার। পাঁচ মিনিট। কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেও কেমন যেন থেমে গেলো। মুখ কাঁচুমাচু করে বার কয়েক হাত কচলালেন তিনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নতুন জুতোর মচমচ শব্দ তুলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলন তাঁর চেম্বারের দিকে। ভেতরে ঢুকে সবার দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের আদি অকৃত্রিম চেয়ারটিতে এসে বসলেন আমজাদ সাহেব।

এল, ডি, ক্লার্ক হাশমত মিয়া, বার কয়েক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি আমজাদ সাহেব, চোখ দুটো এত লাল কেন? ভাবীর সাথে ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি?

কথা শুনে দাঁতে জিভ কাটলেন আমজাদ সাহেব। কি যে বলেন, খানদানী পরিবারে বৌয়ের সাথে ঝগড়া? ছ্যা–ছ্যা। জানেন, আমার নানা ছিলেন খাঁটি শেখ। আর দাদা–।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরে না না, তা কি আর জানিনে। জানি। তবে এমনি একটু ঠাট্টা করলুম আপনার সাথে। বললেন হাশমত মিয়া।

মনে মনে বড় গর্ববোধ করলেন আমজাদ সাহেব। বললেন, ঠাট্টা করে, যে বলছেন, তা আমি বুঝেছি। তবে কিনা, চোখ দুটো লাল হবার পেছনেও কারণ আছে একটা।

কারণটা বলতে গিয়ে, দেয়ালে পোস্টার লাগানো আর তা দেখে তাঁর ভীষণ চটে যাওয়ার ইতিবৃত্তটাই শোনালেন আমজাদ সাহেব।

হাশমত মিয়া বললেন, এতে রাগ করবার কি আছে?

আলবত আছে। আমজাদ সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। কতগুলো বখাটে ছোকড়া, বুঝলেন হাশমত সাহেব, কাজকর্ম কিছুই নেই। সারাদিন শুধু এই করেই বেড়ায়। আসলে কি জানেন– এরা হচ্ছে দেশের শত্রু। মানে এরা বিদেশের দালাল। কেন, আপনি পরশু প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা শোনেন নি? আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন আমজাদ সাহেব। হাশমত মিয়া বললেন, চুপ, সাহেব আসছে।

সাহেব ঠিক এলেন না। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে আবার চলে গেলেন বাইরে।

কেন যেন আজ অফিসের কাজে মোটেই মন বসছিলো না আমজাদ সাহেবের। এটা ওটা অনেক কিছু ভাবছিলেন তিনি।

কালু মুদির পাওনা, দুধওয়ালার বাকি, মেয়ের বিয়ে– অনেক চিন্তাই মাথার ভেতর গিজগিজ করছিলো তাঁর।

পাশের সিটে বসা হাশমত মিয়া খস্‌খস্‌ শব্দে কলম চালাচ্ছিলেন আপন মনে।

সামনের সারিতে বসা রমেশবাবু তাঁর নস্যির ডিবে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন পকেটময়, আর বিরক্তিতে ভ্রূ বাঁকাচ্ছিলেন বার বার।

সদ্য বিয়ে করা ডেসপাচার মূলকুত মিয়া কাজের ফাঁকে ফিস্‌ফিসিয়ে নতুন বৌ–এর গল্প করছিলেন পাশের সিটে বসা আকবর আলির সাথে। সবার দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফাইলের ভেতর ডুব দিলেন আমজাদ সাহেব।

মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা একটানা ঘুরছিলো ভনভন শব্দে।

দেয়ালঘড়িতে তখন বোধ হয় বেলা একটা।

হঠাৎ ওপাশের টেবিল থেকে ক্যাশিয়ার হুরমত আলি চাপা স্বরে বললেন, শুনছেন আমজাদ সাহেব?

কি।

অফিসে নাকি ছাঁটাই হবে।

ছাঁটাই? তড়িত আহত হওয়ার মতো আচমকা চমকে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

হ্যাঁ, ছাঁটাই। আস্তে বললেন হুরমত আলি।

খবরটা এক মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো অফিসের আনাচে কানাচে। চলন্ত কলমগুলো শ্লথ হলো; থেমে পড়লো; খসে পড়লো অনেকের হাত থেকে। ফেকাশে দৃষ্টি তুলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো সবাই।

ছাঁটাই? সেকি? কাঁপা ঠোঁটে বিড়বিড় করে উঠলেন হাশমত মিয়া। ও গড সেইভ মি। সেইভ গড। চাপা আর্তনাদ করে উঠলো এংলো ইন্ডিয়ান টাইপিস্টটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমজাদ সাহেব নিষ্কম্প। নিশ্চুপ। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিলো না তাঁর। মাথার ভিতর শুধু গিজগিজ করছিলো কালু মুদির পাওনা, দুধওয়ালার বাকি, মেয়ের বিয়ে–। কপালের শিরাগুলো টনটন করছিলো তাঁর।

সব অফিসেই ছাঁটাই হচ্ছে সাহেব। নিচ্ছে না, শুধু বের করছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললেন হুরমত আলি।

কপালটা দু'হাতে চেপে ধরে এল–ডি ক্লার্ক রমেশবাবু বললেন, কাল সেক্রেটারিয়েট থেকেও নাকি সাতজনকে ছাঁটাই করেছে শুনলাম।

ও গড, সেইভ মি। সেইভ মি গড। আর একবার আর্তনাদ করে উঠলো এংলো ইন্ডিয়ান টাইপিস্টটা।

ডাফটসম্যান আকবর আলি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। ছাঁটাই করবে মানে– ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? এটা মগের মুল্লুক নয়। তাঁকে সমর্থন করে বললেন মূলকুত মিয়া। আমাদের বৌ পরিবার নেই? ভাই বোন নেই? তারা চলবে কেমন করে? ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি যে ছাঁটাই করে দেবে?

আঃ মূলকুত সাহেব। আস্তে আস্তে; এত চিৎকার করছেন কেন? চাপা স্বরে তাকে তিরস্কার করলেন বুড়ো ক্যাশিয়ার হুরমত আলি।

আমজাদ সাহেব তখনও নিশ্চুপ, নিষ্কম্প।

বিকেলে, অফিস ছুটির মিনিট কয়েক আগেই টাইপ করা নামগুলো টাঙ্গানো দেখা গেলো বারান্দায় নোটিশ বোর্ডের ওপর।

অনেকগুলো নাম।

একটা। দু'টো, তিনটে। তিনটে নামের নিচের নামটার দিকে চোখ পড়তেই মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ করে বারান্দায় বসে পড়লেন আমজাদ সাহেব। খোদা, খোদা একি করলে!

গড! ও গড! গড!

ভগবান। ছেলেপিলেগুলো যে না খেয়ে মরবে ভগবান।

অনেকটা টলতে টলতে অফিস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন আমজাদ সাহেব। একটা নিরালা পার্কে ঢুকে একখানা আধভাঙ্গা বেঞ্চের ওপর ঝুপ করে বসে পড়লেন তিনি। নিরালায় একটু চিন্তা করবেন। কিন্তু চিন্তা করতে বসে বহুমুখী চিন্তার ধাক্কায় অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠলেন আমজাদ সাহেব।

দূরে একটা হলদে বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে পাশের বাড়ির একটা ছেলের সাথে ঈশারায় কথা বলছে। সেদিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চিঠির আদান-প্রদান হলো এ জানালা থেকে ও জানালায় দৃষ্টি সেদিকে থাকলেও, ভাবছেন তিনি অন্য কিছু। চাকরিটা তাহলে সত্যিই গেলো।

আরে আমজাদ যে। কি ব্যাপার, এখানে কি করছো? পেছনে পরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালেন আমজাদ সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিদ সাহেব দাঁড়িয়ে। এককালের সহপাঠী; বর্তমান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

ম্লান হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন আমজাদ সাহেব। কি হে, কেমন আছ? ভালতো?

ভালো আর কোথায়? ঘরে বৌয়ের অসুখ,

অসুখ?

হ্যাঁ। সেই পুরোনো রোগটাই আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ডাক্তার দেখাওনি?

ডাক্তারতো বলেছে রক্ত বলতে কিছু নেই শরীরে। বলে একটু থামলেন আবিদ সাহেব। তা ভাই, একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারো। বড় কষ্টে আছি।

কেন তুমি চাকরি করতে না। সেটা কি হলো? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমজাদ সাহেব। সে তো গত পরশুই খতম। বলে ম্লান হাসলেন আবিদ সাহেব।

সাতজনকে ছাঁটাই করেছে আমাদের ওখান থেকে, শুননি?

ছাঁটাই! ছাঁটাই! ছাঁটাই!

উঃ কি হবে এই পোড়া পৃথিবীটার?

কপালের ফুলে ওঠা শিরা দু'টো টিপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন আমজাদ সাহেব।

AMARBOI.COM

বাসার কাছে এসে পৌঁছতেই চোখ দু'টো দপ্ করে জ্বলে উঠলো তাঁর। হাত পা সমেত গোটা শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠলো, রাগে-ক্ষোভে। সদ্য চুনকাম করা তাঁর একতালা দালানটার দিকে আগুনঝরা দৃষ্টিতে আর একবার তাকালেন আমজাদ সাহেব। ময়লা পায়জামা আর ছেঁড়া শার্ট পরা একটি কুড়ি বাইশ বছরের রোগা ছেলে দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে। ধড়ে প্রাণ রাখবো না শালার। চাপা রোষে গর্জেই উঠলেন তিনি। শালার গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করবো আজ। হাত দু'টো নিসপিস করছিলো আমজাদ সাহেবের। এতদিন পর হাতের মুঠোয় পেয়েছেন ছেলেটাকে, যতসব বখাটে ছোকড়া-শা'র আজ আর আস্ত রাখবো না, পিষে ফেলবো পায়ের তলায়।

পোস্টার দেয়ালে সেঁটে দিয়ে ছেলেটা ধীরে ধীরে ততক্ষণে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন আমজাদ সাহেব। হঠাৎ পোস্টারটার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পুরোনো খবরের কাগজের ওপর লাল কালিতে লেখা গোট গোট অক্ষর। ছাঁটাই করা চলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে ভাবি কতগুলো কুষ্ঠ রোগীকে নিয়ে একটা ছবি বানাবো। যাদের সারা দেহে পচন ধরেছে- তবু তারা চিৎকার করে বলছে না না। আমাদের কিছু হয়নি তো!

তাদের হাত পা'গুলো সব গলে গলে খসে পড়ছে। তবু তারা উগ্রকণ্ঠে বলছে- ও কিছু না, ও কিছু না। আমাদের কিছু হয়নি তো। ওদের পুঁজভরা দেহ থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তবু তারা আতর আর গোলাপ জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে চিৎকার করছে- কিছু হয়নি তো! তারা মরে ভূত হয়ে গেছে। তবু তাদের প্রেতাত্মা দুর্বার আক্রোশে আর্তনাদ করে বলছে- আমরা মরিনি তো!

ইচ্ছে করে আমার পাশের বাড়ির ছোট বউটিকে নিয়ে একটা ছবি বানাই। ছোট বউটি, যার স্বামী আজ দশ বছর ধরে জেলখানায় পচে মরছে।

কি অপরাধ তার, কেউ জানে না।

কি দোষে তাকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে তা তার পাষাণ বউটিকে জিজ্ঞেস করলেও সে মুখ ফুটে কিছু বলে না।

অথচ বউটি কি গভীর যন্ত্রণায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো তড়পায়। দিনে, রাতে নীরবে।

তবু চিৎকার করে সে কাঁদবে না।

তবু মুখ ফুটে সে কিছু বলবে না।

ইচ্ছে করে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে ছবি তৈরি করতে।

বহুদিন আগে যাকে প্রথমে আরমানিটোলায় পরে পল্টনে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সহস্র জনতার মিছিলের মাঝখানে। সেই একুশের ভোরে যে আমার কানে কানে বলেছিল- বন্ধু, যদি আজ মরে যাই তাহলে আমার মাকে কাঁদতে নিষেধ করে দিও। তাকে বলো সময়ের ডাকে আমি মরলাম।

সময় পাল্টে গেছে হয়তো তাই আজ সেই বন্ধু আমার আমলাদের ঘরে ঘরে যুবতী মেয়েদের ভেট পাঠায় দু'টো পারমিটের লোভে।

আহা, তাকে নিয়ে যদি একটা ছবি বানাতে পারতাম।

আমার ছোট বোনটি!

সে একটা ছায়াছবির বিষয়বস্তু হতে পারতো।

তার বড় আশা ছিলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। দু' দু'বার কঠিন রোগ ভোগের পর ডাক্তার তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিলো।

বললো ব্রেন এফেক্ট করতে পারে।

কিন্তু সে শুনলো না। রাত জেগে জেগে পড়লো সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাস করলো। ভালোই পাস করলো সে– প্রথম বিভাগে।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাগোনা শুরু হলো তার।

রোজ যায়, রোজ আসে।

একদিন দেখলাম সিঁড়ির গোড়ায় বসে বসে কাঁদছে।

বললাম। কিরে, কি হয়েছে তোর?

বললো। আমায় ভর্তি করলো না ওরা।

কেন?

আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ দেরি করলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, কলেজে পড়ার সময় স্টাইক করেছিলাম তাই। এর কিছুদিন পরে ব্রেনটা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেলো তার।

বোনটা আমার পাগল হয়ে গেলো।

আহা, বড় সখ ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে।

মাঝে মাঝে ভাবি, কতগুলো অসংস্কৃত লোককে নিয়ে একটা ছবি বানাবো যারা দিনরাত শুধু সংস্কৃতির কথা বলে।

কালচারের কথা বলে।

ভাষার কথা বলে।

ঐতিহ্যের কথা বলে।

বলে আর বলে।

কারণে বলে।

অকারণে বলে।

AMARBOI.COM

বলে বলে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাল তমালের স্নিগ্ধ ছায়ায়। তারপর স্বপ্ন দেখে। ধূসর মরুভূমির স্বপ্ন।

তৈমুর লং আর চেঙ্গিস খাঁর স্বপ্ন।

হিটলার আর মুসোলিনীর স্বপ্ন।

আহা, কি সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে ওরা।

ইচ্ছে করে সেলুলয়েডে কয়েকটি মানুষের ছবি আঁকি। যাদের মুখগুলো শূকর–শূকরীর মতো। যাদের জিহ্বা সাপের ফণার মতো।

যাদের চোখ জোড়া ইঁদুর ছানার মতো।

যাদের হাতগুলো বাঘের থাবার মতো।

আর যাদের মন মানুষের মনের মত সহস্র জটিলতার গিঁটে বাঁধা। যারা শুধু পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে আর অহরহ মিথ্যে কথা বলে।

যারা শুধু দিনরাত ভাতের কথা বলে।

অভাবের কথা বলে।

মাংসের ঝোলের কথা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর মরে। গিরগিটির মতো। সাপ-ব্যাঙ–কেঁচোর মতো।

মরেও মরে না।

গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বংশ বৃদ্ধি করে রেখে যায়। আহা, আমি যদি সেই তরুণকে নিয়ে একটা ছবি বানাতে পারতাম। যার জীবন সহস্র দেয়ালের চাপে রুদ্ধশ্বাস।

আইনের দেয়াল।

সমাজের দেয়াল।

ধর্মের দেয়াল।

রাজনীতির দেয়াল।

দারিদ্র্যের দেয়াল।

সারাদিন সে ওই দেয়ালগুলোতে মাথা ঠুকছে আর বলছে– আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে মুক্তি দাও। আমার ইচ্ছাগুলোকে পায়রার পাখনায় উড়ে যেতে দাও আকাশে। কিম্বা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দাও। সেখানে তারা প্রাণভরে সাঁতার কাটুক।

সারাদিন সে শুধু ছুটছে, ভাবছে– আবার ছুটছে।

এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে।

ঈর্ষার দেয়াল।

ঘৃণার দেয়াল।

মিথ্যার দেয়াল।

সংকীর্ণতার দেয়াল।

কত দেয়াল ভাঙবে সে?

তবু সে আশাহত হয় না। ইচ্ছার আগুন বুকে জ্বেলে রেখে তবু সে ছুটছে আর ভাঙছে।

সহস্র দেয়ালের নিচে মাথা কুটে কুটে বলছে– মুক্তি দাও।

আমাকে মুক্তি দাও।

যদিও সে জানে মানুষের আয়ু, অত্যন্ত সীমিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুরগুলো একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিলো।

সাদা কুকুর।

কালো কুকুর।

মেয়ে কুকুর।

পুরুষ কুকুর।

তাদের চিৎকারে শহরে যেখানে যত ভদ্রলোক ছিলো সবার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

তারা ভীষণ বিরক্ত হলো।

রাগ করলো।

এবং কুকুরগুলোকে গুলি করে মারার জন্যে বন্দুক হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকরা দেখলো।

পথ ঘাট মাঠ সব কুকুরে কুকুরারণ্য।

দাওয়ায় কুকুর।

কার্নিশে কুকুর।

হোটেলে কুকুর।

রেস্তোরায় কুকুর।

AMARBOI.COM

স্কুল। পাঠশালা। অফিস। আদালত। সর্বত্র কুকুরে কুকুরময়। সবাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। সমস্ত কণ্ঠ হতে বিকট শব্দ হচ্ছে চারদিকে।

সহসা ভদ্রলোকরা গুলি করতে লাগলো।

গুলির শব্দে শহরে যত বেশ্যা ছিলো, সবাই ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ছোট বেশ্যা।

বড় বেশ্যা।

যুবতী বেশ্যা।

বুড়ি বেশ্যা।

কুৎসিত বেশ্যা।

সুন্দরী বেশ্যা।

ওরা মৃত কুকুরগুলোর জন্যে করুণ কান্না জুড়ে দিলো।

বেশ্যাদের কান্নায় সমস্ত শহরে বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

আর।

ওদের কান্না দেখে ভদ্রলোকেরা হাতে ধরে রাখা বন্দুকগুলো ঘৃণার সঙ্গে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো।

এবং

কুকুরের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি সংলাপ

[আজ থেকে উনিশ বছর আগে যে সংলাপ পথে-প্রান্তরে শুনেছিলাম]

ভাইসব! আমরা কি চেয়েছিলাম। কি পেয়েছি।

আমরা চেয়েছিলাম একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। যেখানে সুখ থাকবে, শান্তি থাকবে।

কিন্তু আমরা কি পেয়েছি।

কিছু না।

কিছু না।

কিছু না।

ওরা আমাদের সুখ কেড়ে নিয়েছে।

আমাদের ভাইদের ধরে ধরে জেলখানায় পুরেছে।

জেলখানার ভেতর গুলি করে দেশপ্রেমিকদের হত্যা করেছে ওরা।

আমার মাকে কাঁদিয়েছে।

আমার বাবাকে বরখাস্ত করেছে।

আমার ভাইবোনদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন ওরা আমাদের ভাষাও কেড়ে নিতে চায়!

না।

না।

না।

আমরা তা হতে দেব না।

আমাদের মুখের ভাষাকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না।

হরতাল।

সারা দেশব্যাপী আমরা হরতাল করবো।

না না, সেটা ঠিক হবে না। তারচেয়ে এসো আমরা সারা দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ করি।

কি হবে হরতাল করে।

ওরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে।

হরতাল হবে না।

মিছিল বের করতে পারবে না

না।

না।

বেআইনী আইনকে আমরা মানি না।

আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো।

ভাঙবো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা গুলি করেছে।
শুনেছো ওরা গুলি করেছে।
ওরা গুলি করে কয়েকটি ছাত্র মেরে ফেলেছে।
কোথায়?
মেডিক্যাল কলেজের মোড়ে
আশ্চর্য।
এজন্যে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম।
এজন্যে আমরা পাকিস্তান এনেছিলাম।
এই সরকারকে আমরা মানি না।
খুনী ডাকাতদের আমরা মানি না।
পদত্যাগ চাই।
ওদের পদত্যাগ চাই।
বরকতের খুন আমরা ভুলবো না।
রফিক আর জব্বারের খুন আমরা ভুলবো না।
বিচার চাই।
ফাঁসি চাই ওই খুনীদের।
ভাইসব। সামনে এগিয়ে চলুন।
ওদের গোলাগুলি আর বেয়নেটকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলুন।

[আজকের সংলাপ। পথে-প্রান্তরে যে সংলাপ শুনছি।]
কি চাই?
একুশে ফেব্রুয়ারির চাঁদা।
কি করবেন?
একটা ম্যাগাজিন বের করবো।
ম্যাগাজিন বের করে কি হবে?
বাঙলা একাডেমি থেকে ওরা পুরস্কার দেবে বলেছে। ওখানে জমা দেব।

নাহ্। তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। ওরা নামজাদা সব গায়ক গায়িকাদের বুক করে বসে আছে। আর তোমরা সব আলসের হদ্দ, চুপ করে ঘরে বসে গরুর গোস্ত খাচ্ছো?

চিন্তা করবেন না স্যার। আয়োজন আমরাও কম করিনি। ওদের চেয়ে আমাদের ফাংশন, আপনি দেখবেন অনেক ভালো হবে।

ভালো হবে কি। ভালো হতেই হবে। এর সঙ্গে আমার মান-সম্মান জড়িয়ে রয়েছে। বুঝলে না, আমি হলাম তোমাদের প্রেসিডেন্ট। আর হ্যাঁ। আমার বক্তৃতাটা ভালো করে লিখে দিও কিন্তু। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাসটা যেন থাকে ওর মধ্যে। আর শহীদদের নামগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখো, গতবারের মতো আবার উল্টাপাল্টা লিখে রেখো না। না, না, তুমি চিন্তা করো না। আমি দিন কয়েকের মধ্যে বাড়ি আসছি। তারপর ওদের মাথা ভাঙবো।

কিন্তু তুমি আসবে কি করে?

কেন?

তুমি না বললে ছুটিছাটা নেই।

আছে, আছে, ওইতো দিন কয়েক পরে একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন। তুমি একটুও বোঝ না আমি আগের দিন রাতেই এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো। তারপর দেখো না শালাদের মাথা যদি না ভেঙ্গেছি। কি সাহস ওদের, আমার ক্ষেতের কুমড়ো চুরি করে নিয়ে যায়।

ওরা কোথায় মিটিং করবে?

পল্টনে।

আর তারা?

তারা করবে বায়তুল মোকাররমে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট খালি নেই?

নেই।

বাঙলা একাডেমি?

ওখানেও কারা যেন সেমিনার করছে।

তাহলে?

কি যে করবো বুঝতে পাচ্ছি না।

শোন এক কাজ করো। আমাদের মিটিংটা আমরা রেসকোর্সেই করবো।

আল্লা যা করে ভালোর জন্যেই করে। রেসকোর্সে মিটিং করলে এমন জমা জমবে না, বাকি সবার চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।

এই শোন। আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

কেন?

দেরি হলে প্রভোষ্ট ভীষণ রেগে যাবে। শেষে আর কোন দিনও বাইরে আসতে দেবে না।

কিন্তু আমার যে তোমার সঙ্গে অনেক অনেক কথা ছিলো।

ছিলো তো বুঝলাম। কিন্তু। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

কি?

কাল রাতে শহীদ মিনারের ওখানে এসো না।

ওখানে কেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সবাই ওখানে আলপনা আঁকতে যাবো। অনেক রাত পর্যন্ত থাকবো। ইচ্ছে মতো কথা বলা যাবে।

তোমাদের প্রভোষ্ট কি অত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে দেবে?

দেবে না মানে। বিশ আর একুশে বাধা দিলে ওর হাল খারাপ করে দেবো না আমরা।

স্যার।

কি?

ছাত্ররা সব ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে।

কেন? কেন? ছাত্ররা কেন আসছে?

বিজ্ঞাপন চাইছে?

কিসের বিজ্ঞাপন?

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সবাই সংকলন বের করছে কিনা।

হুঁ। এক কাজ করুন। এ বছরটা জয় বাংলার বছর। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। আমি একটা ফান্ড স্যাংশন করে দিচ্ছি। ওখান থেকে সবাইকে কিছু কিছু ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে দেন। এতে আমাদের কোম্পানির গুডউইল আরো বেড়ে যাবে। আর শুনুন।

ইয়েস স্যার।

আপনার পরিচিত কোন কবিটবি আছে?

কেন স্যার?

না, ভাবছিলাম, শহীদদের ওপরে চার লাইন কবিতা লিখে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করলে–

সেটা নিয়ে ভাববেন না স্যার। সেটা আমি নিজেই লিখে দিতে পারবো স্যার। আপনি জানেন না স্যার, আমারও একটু আধটু লেখার অভ্যাস আছে স্যার।

তাহলে তাই করুন।

আরেকটা কথা ছিলো স্যার।

কি?

আমাদের ওই পিয়নটা স্যার। এবারের ঘূর্ণিঝড়ে ওর ঘর বাড়ি সব শেষ হয়ে গেছে স্যার। ও এক মাসের বেতন এডভান্স চাইছে স্যার।

কিসের মধ্যে কি নিয়ে এলেন। যা বললাম তাই করুন গিয়ে এখন। ওসব-আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। বলে দিন হবে না।

কটা ভেঙ্গেছিস?

চারটা।

তুই?

আমি পাঁচটা গাড়ির নম্বর প্লেট। আর সতেরোটা সাইনবোর্ড।

জানিস, আমাদের পাড়ার সেই মোটা সাহেবটা, ওইযে সেই লোকটা যার মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম বলে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল মনে নেই তোর? সেই তখন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাপটি মেরে বসে আছি। দাঁড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি আসুক। গাড়িতে ইংরেজি নম্বর প্লেট। নাক খসে দেবো না? দিলাম, শালার গাড়ি সুদ্ধু ভেঙ্গে দিয়েছি।

ঠিক করেছিস। শালার আমরা সংস্কৃতি সংস্কৃতি করে জান দিয়ে ফেললাম। আর ব্যাটারা ইংরেজি নম্বর লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

ঠিক করেছিস।

[আগামী দিনে যে সংলাপ শুনবো। পথে-প্রান্তরে যে সংলাপ মুখে মুখে উচ্চারিত হবে]

বছরে কতদিন?

তিনশ' পয়ষট্টি দিন।

তিনশ' পয়ষট্টি দিনে ক'টা শহীদ দিবস?

দু'শো বিরানব্বইটা।

বাকি থাকে ক'টা?

তিয়াত্তরটা।

তিয়াত্তরটা আর বাকি রেখে কি হবে?

ওগুলোও ভরে ফেলো।

আগুন জ্বালো।

আবার আগুন জ্বালো।

পুরো দেশটায় আগুন জ্বালিয়ে দাও।

সাত কোটি লোক আছে।

তার মধ্যে না হয় তিন কোটি মারা যাবে।

বাকি চার কোটি সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক।

পুরো বছরটাকে শহীদ দিবস পালন করুক ওরা।

রচনাকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কচু পাতার উপরে টল টল করে ভাসছে কয়েক ফোঁটা শিশির।
ভোরের কুয়াশার নিবিড়তার মধ্যে বসে একটা মাছরাঙা পাখি। ঝিমুচ্ছে শীতের ঠাণ্ডায়।
একটা ন্যাংটা ছেলে, বগলে একটি শ্লেট আর মাথায় একটা গোল টুপি গায়ে চাদর।
পায়ে চলা ভেজা পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে।
অনেকগুলো পাখি গাছের ডালে বসে নিজেদের ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে।
কতগুলো মেয়ে।
ত্রিশ কি চল্লিশ কি পঞ্চাশ হবে। কলসি কলসি
একটানা কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে না। শুধু বলে যাচ্ছে।
কতগুলো মুখ।
মিছিলের মুখ।
রোদে পোড়া।
ঘামে ভেজা।
শপথের কঠিন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর।
এগিয়ে আসছে সামনে।
জ্বলন্ত সূর্যের প্রখর দীপ্তিকে উপেক্ষা করে।
সহসা কতগুলো মুখ।
শাসনের-শোষণের-ক্ষমতার-বর্বরতার মুখ।
এগিয়ে এলো মুখোমুখি।
বন্দুকের আর রাইফেলের নলগুলো রোদে চিক্‌চিক্ করে উঠলো।
সহসা আগুন ঠিকরে বেরুলো।
প্রচণ্ড শব্দ হলো চারদিকে।
গুলির শব্দ।
কচু পাতার উপর থেকে শিশির ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।
মাছরাঙা পাখিটা ছুটে পালিয়ে গেলো ডাল থেকে।
ন্যাংটা ছেলেটার হাত থেকে পড়ে গিয়ে শ্লেটটা ভেঙ্গে গেলো।
পাখিরা নীরব হলো।
মেয়েগুলো সব স্তব্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো।
একরাশ কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়লো গাছের ডাল থেকে।
সূর্যের প্রখর দীপ্তির নিচে একটা নয়- দুটো নয়, অসংখ্য কালো পতাকা এখন।
উদ্ধত সাপের ফণার মতো উড়ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশে ফেব্রুয়ারি।
সন উনিশ'শ বায়ান্ন।

খুব ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতো।
চাষার ছেলে গফুর।
একটি ছোট্ট ক্ষেত।
একটি ছোট্ট কুঁড়ে।
আর একটা ছোট্ট বউ।
ক্ষেতের মানুষ সে।
লেখাপড়া করেনি।
সারাদিন ক্ষেতের কাজ করতো।
গলা ছেড়ে গান গাইতো।

আর গভীর রাতে পুরো গ্রামটা যখন ঘুমে ঢলে পড়তো তখন ছোট্ট মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পুঁথি পড়তো সে, বসে বসে।

আমেনাকে দেখেছিলো একদিন পুকুর ঘাটে।
ঘোমটার আড়ালে ছোট্ট একটি মুখ।
কাঁচা হলুদের মতো রঙ।
ভালো লেগেছিলো।
বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে মেয়ের বাবা রাজি হয়ে গেলো।
ফর্দ হলো।
গফুরের মনে খুশি যেন আর ধরে না।
ক্ষেতভরা পাকা ধানের শিষগুলোকে আদরে আলিঙ্গন করলো সে।
রসভরা কলসিটাকে খেজুরের গাছ থেকে নামিয়ে এনে এক নিঃশ্বাসে পুরো কলসিটাকে শূন্য কর দিলো সে।
জোয়ালে বাঁধা জীর্ণ-শীর্ণ গরু দুটোকে দড়ির বাঁধন থেকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো- যা আজ তোদের ছুটি।
গফুর শহরে যাবে।
বিয়ের ফর্দ নিয়ে।
সব কিছু নিজের হাতে কিনবে সে।
শাড়ি, চুড়ি, আলতা, হাঁসুলি।
অনেক কষ্টে সঞ্চয় করা কতগুলো তেল চিট্‌চিটে টাকার কাগজ রুমালে বেঁধে নিলো সে। বুড়িগঙ্গার উপর দিয়ে খেয়া পেরিয়ে শহরে আসবে গফুর। বিয়ের বাজার করতে।

বাবা আহমেদ হোসেন।
পুলিশের লোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি সচ্চরিত্র।

তবু প্রমোশন হলো না তাঁর।

কারণ, তসলিম রাজনীতি করে।

ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা দেয়।

সরকারের সমালোচনা করে।

ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন বাবা।

মেরেছেনও।

যাঁর ধমকে দাগী চোর, ডাকাত, খুনী আসামীরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতো– তাঁর অনেক শাসন, তর্জন-গর্জনেও তসলিমের মন টললো না। মিছিলের মানুষ সে।

মিছিলেই রয়ে গেলো।

মা কাঁদলেন।

বোঝালেন, দিনের পর দিন।

আত্মীয়স্বজন সবাই অনুরোধ করলো।

বললো বুড়ো বাপটার দিকে চেয়ে এসব এবার ক্ষান্ত দাও। দেখছো না ভাইবোনগুলো সব বড় হচ্ছে! সংসারের প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। অথচ প্রমোশনটা বন্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয় তসলিম বাবার প্রমোশন, মায়ের কান্না, আত্মীয়দের অনুরোধ, সংসারের প্রয়োজন সব কিছুকে উপেক্ষা করে মিছিলের মানুষ মিছিলেই রয়ে গেলো।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর হৃদয়ে কোমল ক্ষত ছিলো।

সালমাকে ভালবাসতো সে।

সালমা ওর খালাতো বোন।

একই বাড়িতে থাকতো।

উঠতো বসতো চলতো।

তবু মনে হতো সালমা যেন অনেক-অনেক দূরের মানুষ।

তসলিমের হৃদয়ের সেই কোমল ক্ষতটির কোন খোঁজ রাখতো না সে। কিংবা রাখতে চাইতো না।

বহুবার চেষ্টা করেছে তসলিম।

বলতে বোঝাতে। কিন্তু সালমার আশ্চর্য ঠাণ্ডা চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারেনি সে।

এককালে ভালো কবিতা লিখতেন তিনি।

এখন সরকারের লেজারে টাকার অঙ্ক থরে থরে লিখে রাখা তাঁর কাজ।

কবি আনোয়ার হোসেন।

এখন কেরানি আনোয়ার হোসেন।

তবু কবি মনটা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়। যখন তিনি দিনের শেষে রাতে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝগড়া করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

যখন এ দেহ মন জীবন আর পৃথিবীটাকে নোংরা একটি ছেঁড়া কাঁথার মতো মনে হয়, তখন একান্তে বসে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে তাঁর। আনোয়ার হোসেনের জীবনে অনেক অনেক দুঃখ।

ঘরে শান্তি নেই। স্ত্রীর দুঃখ।

বাসায় প্রয়োজনীয় আসবাব–পত্র নেই। থাকার দুঃখ।

সংসার চালানোর মতো অর্থ কিংবা রোজগার নেই। বাঁচার দুঃখ।

কবিতা লিখতে বসে দেখেন ভাব নেই। আবেগের দুঃখ।

শুধু একটি আনন্দ আছে তাঁর জীবনে।

যখন তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে সামনের পানের দোকান থেকে কয়েকটা পান কিনে নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে থাকেন। আর পথ চলতে চলতে কবিতা লেখার দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকেন। তখন আনন্দে ভরে ওঠে তাঁর সারা দেহ।

কবি আনোয়ার হোসেন, ঘর আর অফিস, অফিস আর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যান না। যেতে ভালো লাগে না, তাই।

কোনদিন পথে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো একটা কি দুটো কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। তারপর এড়িয়ে যান।

ভালো লাগে না।

কিছুই ভালো লাগে না তাঁর।

AMARBOI.COM

অর্থ আর প্রাচুর্যের অফুরন্ত সমাবেশ।

অভাব বলতে কিছু নেই। মকবুল আহমদের জীবনে।

বাড়ি আছে।

গাড়ি আছে।

ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

ছেলেমেয়েদের ইনসুরেন্স আছে কয়েকখানা।

ব্যবসা একটা নয়।

অনেক। অনেকগুলো

পানের ব্যবসা।

তেলের ব্যবসা।

পাটের ব্যবসা।

পারমিটের ব্যবসা।

সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে।

কখনো নেতার বাড়িতে।

কখনো আমলাদের সভা-সমিতিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর জীবনেও দুঃখ অনেক।

দুটো পাটকল বসাবার বাসনা ছিল। একটার কাজও এখনো শেষ হলো না। শ্রমের দুঃখ।

বড় ছেলেটাকে বাচ্চা বয়সেই বিলেতে পাঠিয়ে ভালো শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিলো। স্ত্রী তার সন্তানকে কাছ ছাড়া করতে রাজি হলো না। জাগতিক দুঃখ।

তেলের কলের শ্রমিকগুলো শুধু বেতন বাড়াবার জন্যে সারাক্ষণ চিৎকার করে, আর হরতালের হুমকি দেয়। দুঃখ। উৎপাদনের দুঃখ। কিছু ছেলে ছোকরা এবং গুণ্ডা জাতীয় লোক পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে মিছিল বের করে। সভা বসিয়ে সরকারের সমালোচনা করে। যাদের টাকা আছে তাদের সব টাকা গরিবদের বিলিয়ে দিতে বলে। দুঃখ। দেশের দুঃখ।

এই অনেক দুঃখের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে তাঁর। যখন সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে রাতে ক্লাবের এক কোণে চুপচাপ বসে বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করেন তিনি। তখন অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে ওঠে তাঁর চোখ মুখ।

স্ত্রী বিলকিস বানুর সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা হয়। একই বাড়িতে থাকেন। এক বিছানায় শোয়। কিন্তু কাজের চাপে, টেলিফোনের অহরহ যন্ত্রণায় স্ত্রীর সঙ্গে বসে দু'দণ্ড আলাপ করার সময় পান না তিনি।

অথচ স্ত্রীকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন।

তাঁর সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

এবং যখন যা প্রয়োজন মেটাতে বিলম্ব করেন না।

স্বামীর সঙ্গ পান না, সে জন্যে বিলকিস বানুর মনে কোন ক্ষোভ নেই।

কারণ, সঙ্গ দেওয়ার লোকের অভাব নেই তাঁর জীবনে।

সেলিমও স্বপ্ন দেখে।

একটা রিক্সা কেনার স্বপ্ন।

বারো বছর ধরে মালিকের রিক্সা ভাড়ায় চালিয়ে চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

সারাদিনের পরিশ্রম শেষে তিনটি টাকা রোজগার হলে দুটো টাকা মালিককে দিয়ে দিতে হয়। একটা টাকা থাকে ওর।

সেই টাকায় বউ আর বাচ্চাটাকে নিয়ে দিনের খাওয়া হয়।

মাসের বাড়ি ভাড়া।

বিড়ি কেনা।

আর সিনেমা দেখা।

পোষায় না তার।

দেশ কি সে জানে না।

সভা-সমিতি-মিছিলে লোকগুলো কেন এতো মাতামাতি করে তার অর্থ সে বুঝে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশেরা যখন ছাত্রদের ধরে ধরে পেটায় তখন সে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন মন্তব্য করে না। তার ভাবনা একটাই।

একটা রিক্সা কিনতে হবে।

আরো একটা ভাবনা আছে তার। মাঝে মাঝে ভাব।

ছেলেটা আর একটু বড় হলে তাকেও রিক্সা চালানো শেখাতে হবে।

খেয়াঘাট পেরিয়ে শহরে এলো গফুর।

বগলে একটা ছোট্ট কাপড়ের পুটলী।

পুটলীতে বাঁধা একটা বাড়তি লুঙ্গি, জামা, আর কিছু পিঠে।

শহরে নেমেই সে অবাক হয়ে দেখলো মানুষগুলো সব কেমন যেন উত্তেজনায় উত্তপ্ত।

এখানে সেখানে জটলা বেঁধে কি যেন আলাপ করছে তারা।

খবরের কাগজের হকাররা অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করছে।

কাগজ কেনার ধুম পড়েছে চারদিকে।

সবাই কিনে কিনে পড়ছে।

উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এদেশের।

না! না!!

চিৎকার করে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন।

আমি মানি না।

স্ত্রী অবাক হয়ে তাকালো তাঁর দিকে।

স্বামীকে এতো জোরে চিৎকার করতে কোনদিন দেখেনি সে।

কেন, কি হয়েছে?

ওরা বলছে বাংলাকে ওরা বাদ দিয়ে দেবে। উর্দু, শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবে ওরা। জানো সালেহা, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় আমি কবিতা লিখি, সে ভাষাকে বাদ দিতে চায় ওরা।

সে কিগো! আমরা তাহলে কোন্ ভাষায় কথা বলবো?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকায় সালেহা।

না। না। আমি অন্যের ভাষায় কথা বলবো না! আমি নিজের ভাষায় কথা বলবো।

কবি আনোয়ার হোসেন চিৎকার করে উঠলেন।

বজ্র থেকে ধ্বনি নিয়ে গর্জন করে উঠলো তসলিম।

এই সিদ্ধান্ত আমি মানি না।

আমরা মানি না।

মানি না!

মানি না!!

মানি না!!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমতলায় ছাত্রদের সভাতে অনেকগুলো কণ্ঠ এক সুরে বলে উঠলো, আমরা মানি না।

বাচ্চারা কোন কিছুই সহজে মানতে চায় না।

তাদের মানিয়ে নিতে হয়।

আমলাদের সভায় মেপে মেপে কথাগুলো বললেন মকবুল আহমদ। প্রথমে আদর করে দুধ কলা খাইয়ে ওদের মানিয়ে নিতে হয়। তবু যদি না মানে চাবুকটাকে তুলে নিতে হবে হাতে। মানবে না কি? মানতে বাধ্য হবে তখন।

কতগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে শ্লোগান দিচ্ছে–

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আজ পান খাওয়া ভুলে গেলেন কবি আনোয়ার হোসেন। সেদিকে তাকিয়ে চোখজোড়া আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠলো তাঁর।

ভুলে গেলেন– কখন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

তিনি দেখছেন মিছিলের মুখগুলোকে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাঁকে।

কি সাব। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি দেখেন? বেল বাজাই শোনেন না?

রিক্সা চালক সেলিম।

তার রিক্সাটা নিয়ে এগিয়ে যায় সামনে।

ছেলেগুলো চিৎকার করছে। করুক। ওতে তার কোন উৎসাহ নেই। পারবে না। তুমি দেখে নিও। ওরা জোর করে উর্দুকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবে না।

গদগদ কণ্ঠে স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কবি আনোয়ার হোসেন। ছেলেরা ক্ষেপেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে ওরা ছাড়বে না।

স্ত্রী পান খাচ্ছিলো।

একটুখানি চুন মুখে তুলে বললো– হ্যাঁ গা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে তোমার বেতন কি বেড়ে যাবে? ক'টাকা বাড়বে বলতো।

কি যে হবে দেশের কিছু জানি না। বিদেশের চোর এসে ভরে গেছে পুরো দেশটা।

স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন পরে আজ কথা বলতে বসলেন মকবুল আহমদ। বাংলা বাংলা করে চিৎকার করছে ওরা। বাংলা কি মুসলমানের ভাষা নাকি? ওটাতো হিন্দুদের ভাষা। হিন্দুরা এদেশটাকে জাহান্নামে নেবে। কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন বিলকিস বানু।

কোথায় উর্দু আর কোথায় বাংলা! উর্দু হচ্ছে খানদানী ভাষা।

আমাদের ফ্যামিলিতে বাবা মা সবাই উর্দুতে কথা বলেন।

উর্দু বাংলা আমি কিছু বুঝি না। আমার সোজা কথা। তোমার ছেলেকে সাবধান করে দাও। ও যদি আবার সে সভা–সমিতি আর আন্দোলন করে তাহলে এদ্দিন প্রমোশন বন্ধ হয়েছিল, এবার আমার চাকরিটাই যাবে।

তসলিমের পুলিশ বাবা। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। মাও শিউরে উঠলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভাবতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেলো তাঁর।

তুই কেমন নিষ্ঠুর ছেলেরে।

তসলিমকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

তোর মা বাবা ভাই বোনগুলোর কথা ভেবেও কি তুই ওসব ক্ষান্ত দিতে পারিস না? চাকরিটা চলে গেলে আমরা খাবো কি?

তসলিম নিশ্চুপ ।

সালমা বললো–

খালুজান ক'দিন ধরে আপনার চিন্তায় চিন্তায় খাওয়া–দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। এসব কাজ না করলেই তো পারেন। কি হবে এসব করে?

সালমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো তসলিম। এর মধ্যে সালমাকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো তার। কিন্তু কিছুই বললো না। শুধু বললো–

তুমি ওসব বুঝবে না।

সদরঘাটে যেখানে অনেকগুলো খেয়ানৌকা ভিড় করে থাকে তার কাছাকাছি একটা ইট টেনে নিয়ে বসে পড়লো গফুর।

ক্ষিদে পেয়েছে। খাবে।

পুটলীটা ধীরে ধীরে খুললো সে।

শহরের লোকজনদের সে বলতে শুনেছে– কাল নাকি হরতাল।

শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

গাড়ি ঘোড়া চলবে না।

হরতাল কি গফুর বোঝে না।

AMARBOI.COM

পিঠা খেতে খেতে সে নানাভাবে হরতালের একটা অবয়ব চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু হরতালের কোন সঠিক চেহারা নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

সে ভাবলো, এটা হয়তো শহরেরই বিশেষ একটা রীতি কিম্বা নীতি। মাঝে মাঝে শহরের মানুষরা এরকম হরতাল পালন করে থাকে।

উঠে গিয়ে দু'হাতে বুড়িগঙ্গার পানি তুলে নিয়ে পান করলো গফুর। গামছায় মুখ হাত মুছলো। তারপর ট্যাক থেকে রুমালটা বের করে টাকাগুলো গুণে গুণে বার কয়েক দেখলো সে।

কাল দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

কেনাকাটা আজকে শেষ করতে হবে।

মুহূর্তে আমেনার মুখ মনে পড়লো তার।

কি করছে আমেনা এখন?

হয়তো পুকুর ঘাটে পানি নিতে এসেছে।

কিম্বা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে।

অথবা কচু বনে ঘুরে ঘুরে কচু শাক তুলছে।

সাতদিন পরে বিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে বড় ভালো লাগলো গফুরের।

সহসা বিকট একটা আওয়াজ শুনে চমকে তাকাল গফুর।

দেখলো কয়েকটি ছেলে মুখে চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে বলছে– কাল হরতাল।

আমাদের মুখের ভাষাকে ওরা জোর করে কেড়ে নিতে চায়।

আমাদের প্রাণের ভাষাকে ওরা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু আমরা মাথা নোয়াবো না।

আমরা আমাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবো না।

আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আর সে দাবিতে কাল হরতাল।

সবাই হরতাল পালন করুন।

গফুর অবাক হয়ে শুনলো।

সে ভাবলো কাউকে জিজ্ঞেস করবে ব্যাপারটা কি? কিন্তু সাহস পেলো না। অদূরে একটা লোক তাসের খেলা দেখাচ্ছিল।

নানা রকম খেলা।

আজগুবি খেলা।

গফুর ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

AMARBOI.COM

কিসের হরতাল?

আমি হরতাল মানি না।

রিক্সার ব্রেকটা খারাপ হয়ে গেছে। সেটা ঠিক করতে করতে আপন মনে গজ গজ করে উঠলো সেলিম।

রিক্সা না চালালে আমি রোজগার করবো কোত্থেকে?

আমি খাব কি?

আমার বউ খাবে কি?

আমার ছেলে খাবে কি?

ওসব হরতালের মধ্যে আমি নেই।

ব্রেকটা ঠিক করে সবে রিক্সাটা নিয়ে সামনে এগুতে যাবে সে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো–

ভাড়া যাবে?

সেলিম দেখলো একটা ছেলে।

বোধ হয় ছাত্র।

হাতে বই।

বগলে একগাদা কাগজ।

কোথায় যাবেন স্যার?

ইউনিভার্সিটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠেন।

তসলিম রিক্সায় ওঠে বসতেই সেলিম প্রশ্ন করলো–

আপনারা কালকে হরতাল করছেন কেন? রিক্সা না চালালে আমরা রুজি–রোজগার করবো কেমন করে? হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবো নাকি।

মুহূর্ত কয়েক সময় নিলো তসলিম। তারপর ধীরে ধীরে বললো–আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আর ওরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তাহলে বাংলা ভাষা এ দেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। তোমাকে আমাকে আমাদের সবাইকে উর্দুতে কথা বলতে হবে।

উর্দু আমি কিছু কিছু জানি।

সেলিম বিজ্ঞের মতো বললো–

কিন্তু আমার বউ উর্দু একেবারে বোঝে না। ও মুন্সিগঞ্জের মেয়ে কিনা তাই। তবে ছেলেকে আমি উর্দু বাংলা দুটোই শেখাচ্ছি।

তসলিম বললো–

উর্দুর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমরা উর্দু বাংলা দুটোকেই সমানভাবে চাই।

কিন্তু হরতাল করছেন কেন?

হরতালের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিক্ষোভ জানাতে চাই। আমাদের প্রতিবাদ জানাতে চাই।

অ।

কিছু না বুঝলেও বার কয়েক ঘাড় দোলালো সেলিম।

AMARBOI.COM

সরকারের চাকরি করি বলে কি আমরা আমাদের মতামতটাও বন্ধক দিয়ে দিয়েছি নাকি? আমরা কি ওদের ক্রীতদাস যে ওদের কথামতো আমাদের চলতে হবে।

চেয়ারে বসে ছটফট করতে লাগলেন কবি আনোয়ার হোসেন।

বড় কর্তার হুকুম এসেছে। কাল সবাইকে সময় মতো অফিসে হাজির হতে হবে। হরতাল করা চলবে না। যে হাজির হবে না তাকে সাসপেন্ড করা হবে।

কেন? আমাদের ভাষাটাকে তোমরা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে? আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো? কুকুর বেড়ালেরও নিজস্ব একটা ভাষা আছে। দেখি ওদের মুখ বন্ধ কর দাও তো! তোমাদের ছেড়ে দেবে? কামড়ে আঁচড়ে গায়ের রক্ত বের করে দেবে না? ওসব হুকুম আমি মানি না। যদি চাকুরি যায়, যাবে। মুটেগিরি করবো। দরকার হলে রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করবো। কিন্তু আমাকে তোমরা ক্রীতদাস বানিয়ে নিবে সেটা চলবে না।

রাগে গজ গজ করতে লাগলেন কবি আনোয়ার হোসেন।

ব্যাস কাল হরতাল। আমি অফিসে যাবো না, যা হয় হোক।

হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে টেবিলের এক কোণে রেখে দিলেন তিনি।

ওসব হরতালের হুমকিতে মাথা নোয়ালে দেশ চলবে না। হরতাল বন্ধ করতে হবে। সভা–সমিতি ভেঙ্গে দিতে হবে। রাস্তায় মিছিল করা বে–আইনী ঘোষণা করতে হবে। তবে ঠাণ্ডা হবে ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমলাদের সামনে লম্বা ভাষণ দিলেন মকবুল আহমদ।
মন্ত্রীরা ছুটোছুটি করছে।
এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।
নেতারা তর্কবিতর্কে মেতে উঠেছেন।
আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলছেন।
যে করেই হোক হরতাল বন্ধ করতে হবে।
রাস্তায় মিছিল বের করা বে-আইনী করতে হবে।
পাড়ার মাতব্বরদের ডাকা হয়েছে।
তাদের সঙ্গে পরামর্শ চলছে।
যত লোক লাগে আমরা দেবো।
যত টাকা লাগে আমরা যোগাবো।
পুলিশের প্রয়োজন হলে পুলিশ দেবো।
সব কিছু পাবেন আপনারা।
হরতাল বন্ধ করতে হবে।
মিছিল বন্ধ করতে হবে।
মাতব্বররা ঘাড় নোয়ালেন।
নামাজের সেজদা দেয়ার মতো।

AMARBOI.COM

কতগুলো উদ্ধত মুখ।
ঋজু।
কঠিন।
একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।
না।
আমরা মানি না।

সরকার একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেবে। প্রতিবাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে আমাদের। সে অন্যায় আমরা মাথা পেতে নেবো না।

আইন দিয়ে ওরা আমাদের শৃঙ্খলিত করতে চায়। সে শৃঙ্খল আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো।

আমরা গরু ছাগল ভেড়া নই যে, প্রয়োজন বোধে খোঁয়াড়ের মধ্যে বন্ধ করে রাখবে।

তর্কবিতর্ক চললো অনেকক্ষণ ধরে।
আলোচনার ঝড় উঠলো।
কেউ বললো-
আইন, আইন অমান্য করা ঠিক হবে না।
কেউ বললো-
এ আইন শোষণের আইন। এ আইন আমরা মানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো রাত বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে।

কাল কি হবে কেউ জানে না।

রাস্তায় পুলিশ নেমেছে। পুলিশের গাড়ি ইতস্তত ছুটোছুটি করছে।

পথঘাটগুলো জনশূন্য।

একটা খালি রক পেয়ে তার উপরে গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো গফুর। দুটো শাড়ি কিনেছে সে।

এক শিশি আলতা।

কিছু চুড়ি।

একটা নাকফুল।

সেগুলো বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নানা কথা ভাবতে লাগলো সে। আমেনার কথা।

বিয়ের পর কেমন করে সংসার করবে সে কথা।

আর কোনদিন যদি ছেলেপুলে হয় তার কথা।

ইচ্ছে করলে সে আজ গ্রামে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি কারণ সে হরতাল দেখবে।

হয়তো কোনদিন আর শহরে আসা নাও হতে পারে। তাই হরতাল সে দেখে যাবে।

দু' একটা কেনাকাটাও বাকি রয়ে গেছে।

একটা লাল লুঙ্গি কিনবে সে ভেবেছিলো।

কয়েক দোকানে ঘোরাঘুরিও করেছিলো।

কিন্তু ওরা বড় চড়া দাম চায়।

তাই গফুর ভাবলো, যদি কম দামে পাওয়া যায়। আর দু' একটা দোকানপাট খোলা থাকে তাহলে সে কিনবে সেটা।

লাল লুঙ্গি আমেনা ভীষণ পছন্দ করে।

শুয়ে শুয়ে গফুর দেখলো দুটো পুলিশের গাড়ী ছুটে চলে গেলো রাস্তা দিয়ে। গফুর চোখ বন্ধ করলো।

কবি আনোয়ার হোসেন উত্তেজিতভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

সালেহা ডাকলো–

কই, শোবে না?

না।

শান্ত গলায় জবাব দিলেন কবি–

জানো সালেহা, আজ বহুদিন পর আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেলো। আমি কবি হতে চেয়েছিলাম। কবিতা লিখতাম। কবিতা ছিল আমার স্বপ্ন। আমার সাধনা। ভেবেছিলাম সারাটা জীবন আমি কবিতা লিখেই কাটিয়ে দেবো। কিন্তু আমি– সেই আমি– দেখ আজ লেজার লিখতে লিখতে ক্লান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা সহানুভূতির সঙ্গে তাকালেন তাঁর দিকে?

লেখো না কেন? মাঝে মাঝে লিখলেই তো পারো। তুমি তো কবিতা লিখেই আমাকে পাগল করেছিলে, মনে নেই?

কথাটা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন। মনে আছে সালেহা। মনে থাকবে না কেন? শুধু কি জানো! আমার সেই মনটা নেই, যে মন নিয়ে একদিন আমি কবিতা লিখতাম।। আমার সেই মনটা না, লেজারের চাপে দুমড়ে গেছে। মরে গেছে।

এসো এখন শুয়ে পড়ো।

সালেহা ডাকলো।

না।

আবার বললেন আনোয়ার হোসেন।

তাঁর সারা মুখে কি এক অস্থিরতা।

স্ত্রীর কাছে এসে বসলেন তিনি–

সালেহা, আমি ঠিক করেছি, আমি আর ও চাকরি করবো না। এসব সরকারি চাকরি মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলে। আমি ছেড়ে দেবো। যেখানে আমার সামান্য স্বাধীনতা নেই সেখানে কেন আমি কুলুর বলদের মতো ঘানি টেনে যাবো। আমি আবার কবিতা লিখবো সালেহা। যে কবিতা পড়ে তোমার একদিন আমাকে ভালো লেগেছিলো– তেমনি কবিতা লিখবো আমি।

সালেহার পুরো চেহারায় কে যেন আলকাতরা লেপে দিলো।

না, না! চাকরি ছাড়া ঠিক হবে না। তাহলে সংসার চলবে কি করে? কবিতা লিখে তো আর টাকা পাবে না তুমি।

টাকা! টাকাই কি জীবনের সব কিছু সালেহা? মানুষের মন বলে কি কিছুই নেই?

শোনো। ওসব চিন্তা এখন রাখো।

সালেহা স্বামীর হাত ধরলো।

এসো, এখন শুয়ে পড়া যাক। কাল আবার ভোরে ভোরে উঠতে হবে না! আমি কিন্তু কাল অফিসে যাবো না।

কেন?

আমি হরতাল করবো। ওরা নিষেধ করেছে। বলেছে চাকরি যাবে, যাক সেটা পরোয়া করি না। আমার ভাষার চেয়ে কি চাকরি বড়?

কাল কি হবে কে জানে। হয়তো মারাত্মক কিছুও ঘটতে পারে। বসে বসে ভাবলো তসলিম। জীবনে এই প্রথম অনুভূতির জন্ম নিলো তার মনে।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতেই হবে। নইলে আন্দোলন এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

বাংলা ভাষাকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে ওরা।

আর একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে গেলে হয়তো পুলিশ গুলিও চালাতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো তসলিম মারা যাবে।

নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে সহসা শিউরে উঠলো সে। মনে হলো যেন নিজের মৃত্যুকে সে এ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছে।

ভাত খাবেন না!

সালমার কণ্ঠস্বরে চমকে তাকালো তসলিম।

সালমা বললো–

তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে. চলুন।

বলে চলে যাচ্ছিলো সালমা।

সহসা পেছন থেকে তাকে ডাকলো তসলিম–

সালমা, শোন! তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সালমা ফিরে তাকালো।

নীরব দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলো–

কি বলুন?

সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না তসলিম। চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বললো–

কথাটা আমার তুমি কিভাবে নেবে জানি না, হয়তো তুমি রাগ করবে–। বলতে গিয়ে থেমে গেলো সে।

AMARBOI.COM

সালমা নীরব।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

সহসা তসলিম আবার বললো–

বহুবার ভেবেছি বলবো তোমাকে। বলা হয়নি। হয়তো কোনদিন বলতাম না। কিন্তু আজ কেন জানি না বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার।

আবার নীরব হলো তসলিম।

সালমা মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে আছে।

মনে হলো ওর মুখখানা কৃষ্ণচূড়ার রঙে ভরে গেছে।

সালমা বললো–

চলুন, এখন খেয়ে নিন। পরে এক সময় না হয় শুনবো ওসব।

না না সালমা, যদি কাল কোন অঘটন ঘটে। ধরো যদি আমি মারা যাই। তাহলে?

মেয়েটি শিউরে উঠলো।

চোখজোড়া মুহূর্তে ছল ছল করে উঠলো তার।

ছিঃ। এসব কি বলছেন! আপনি মরবেন কেন? আপনি অনেক অনেক দিন বাঁচবেন। আসুন, এখন খেয়ে নিন। চলুন।

কথাটা শুনবে না?

না, এখন নয়। পরে শুনবো।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সামনে থেকে সরে গেল সালমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কি কাল বাইরে বেরুবে, না ঘরে থাকবে?

বিছানায় শোবার আগে মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন বিলকিস বানু।

হ্যাঁ, বেরুবো বৈকি। বেরুবো না কেন?

না, বলছিলাম কি যদি হরতাল হয় তাহলে?

হরতাল মোটেও হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

বিজ্ঞের মতো জবাব দিলেন মকবুল আহমদ।

হরতালের সব রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

যে হরতাল করবে তার লাইসেন্স আমরা কেড়ে নেবো। কেউ যদি অফিসে না আসে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবো। আমরা জানিয়ে দিয়েছি। পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছি সবাইকে। তারপরও কি কেউ হরতাল করবে বলে মনে হয় তোমার?

স্লিপিং স্যুটটা পরে নিয়ে বিছানায় এসে শুলেন মকবুল আহমদ। কিন্তু ছাত্ররা হয়তো এক আধটু গোলমাল করতে পারে। তাও আমরা ভেবে রেখেছি।

ক্রিম ঘষা শেষ হলে বিলকিস বানু বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলেন।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো? কাল কোন একটা কিছু হয়তো হতেও পারে। তুমি যেদিকে খুশি যেও, কিন্তু ওই ছাত্রদের পাড়ায় গাড়ি নিয়ে যেও না।

তুমি মিছেমিছি ভাবছো। শুয়ে পড়ো এখন।

চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন মকবুল আহমদ।

ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো গফুরের।

চেয়ে দেখলো পথঘাটগুলো তখনো জনশূন্য।

দুটো কুকুর রাস্তার মাঝখানে বসে ঝগড়া করছে।

গফুর উঠে বসলো।

পুটলীতে রাখা জিনিসপত্রগুলো পরখ করে দেখলো একবার।

পুবের আকাশে সবে ধলপহর দিয়েছে।

দু'পাশের উঁচু উঁচু দালানগুলোকে আকাশের পটভূমিতে ছায়ার মতো মনে হচ্ছে।

দু' একটা কাক গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে এসে খাবার খুঁজছে।

আবার উড়ে গিয়ে বসছে টেলিগ্রাফের তারের উপর।

দু'টো মেয়ে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে।

আবর্জনা পরিষ্কার করছে।

রাস্তার পাশে একটা কল থেকে হাত মুখ ধুলো গফুর।

ততক্ষণে লোকজন পথ চলতে শুরু করেছে।

দু' একটা রিক্সার টুং টুং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

একটা দুটো করে দোকানপাট খুলছে।

টাউন সার্ভিসের বাসগুলো মানুষ ভর্তি করে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরতাল!

কোথায় হরতাল?

গফুর অবাক হয়ে তাকালো চারপাশে।

সেলিম তার রিক্সাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

যাবার সময় বৌকে বলে গেল–

কালুকে আজ রাস্তায় বেরুতে দিসনে। গোলমাল হতে পারে।

কালু ওর ছেলের নাম।

মকবুল আহমদও বেরুলেন বাইরে।

স্ত্রী বিলকিস বানুকে সঙ্গে নিয়ে।

ডাইভারকে নির্দেশ দিলেন। রেসকোর্স ঘুরে সেক্রেটারিয়েটের দিকে যাবার জন্যে।

পুরোনো শহরেও একবার যাবেন তিনি।

কারখানায় যাবেন।

অফিস পাড়াগুলো ঘুরবেন।

হরতাল ব্যর্থ হয়েছে কি হয়নি তাই তদারক করবেন তিনি।

বিলকিস বানু সহসা শব্দ করে হেসে উঠলেন।

ওই যে দেখ দেখ। একটা বাস আসছে। দুটো রিক্সা। একটা ঘোড়ার গাড়ি। ওটা একটা প্রাইভেট কার, না!

দু'জনের মুখে হাসি।

চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে যেন খুঁজছেন তারা।

রাস্তায় গাড়ি দেখলে কিম্বা দোকান খুলেছে নজরে এলে উল্লাসে ভরে উঠছে তাঁদের চোখমুখ।

তোমাকে বলিনি আমি!

সগর্বে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মকবুল আহমদ।

কেউ হরতাল করবে না। দেশের দুশমনদের সাথে কেউ যোগ দেবে না। স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন বিলকিস বানু।

তুমি কি সত্যি সত্যি আজ অফিসে যাবে না?

বাইরে বেরুবার মুহূর্তে প্রশ্ন করলো সালেহা।

একটা কথার আর ক'বার উত্তর দেবো বল তো?

কবি আনোয়ার হোসেন রেগে গেলেন–

বলেছি তো যাবো না।

তাহলে এখন বেরুচ্ছো কোথায়।

পথ রোধ করে দাঁড়ালো সালেহা।

বাইরে হরতাল কেমন হলো দেখতে যাবো।

তারপর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ইউনিভার্সিটিতে যাবো। ছাত্ররা কি করছে।

না। আমি তোমাকে বেরুতে দেব না।

সালেহা দৃঢ় কণ্ঠে বললো–

শেষে কোথায় গিয়ে কি করবে– পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে তখন আমার কি অবস্থা হবে শুনি?

দেখ, বাজে বকো না। পথ ছাড়। পুলিশে ধরবে। আমি তার তোয়াক্কা করি না। আর আমার যদি কিছু হয় তাহলে তুমি বাপের বাড়ি চলে যেও।

উত্তরের আর অপেক্ষা করলেন না আনোয়ার হোসেন।

বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ভোর রাতে পুলিশের পোষাক পরে কোমরে পিস্তল এঁটে বাইরে বেরিয়ে গেছেন বাবা।

আজ তাঁর বড় ব্যস্ততার দিন।

তসলিমও ব্যস্ত।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পথে সালমার সঙ্গে দেখা হলো তসলিমের।

আজ বাইরে না গেলেই কি নয়!

এই একটি কথা বলার জন্যই হয়তো সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করছিলো মেয়েটি।

তসলিম থমকে দাঁড়ালো।

তুমি তো সবই জানো সালমা। জানো, আমি যাবো। তবু কেন বাধা দিচ্ছো।

দৃষ্টি নত করলো সালমা।

খালু বলছিলেন আজ গোলমাল হতে পারে।

বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কেঁপে গেলো তার।

তসলিম সেটা লক্ষ্য করলো।

এ মুহূর্তে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করছিলো তার।

কিছুই বলতে পারলো না। শুধু বললো–

চলি সালমা। আবার দেখা হবে।

বলে সালমার দিকে আর তাকালো না সে। নীরবে বেরিয়ে গেলো।

এরা মানুষ!

মানুষ না সব জানোয়ার।

রাস্তার মধ্যে একরাশ থু থু ছিটালো কবি আনোয়ার হোসেন।

সব শালা বেঈমান। টাকা খেয়ে হরতাল ভেঙ্গে দিয়েছে। বুঝবে যেদিন ওদের ঘাড়ে উর্দুর জোয়াল চাপিয়ে দেয়া হবে, সেদিন বুঝবে শালারা।

রাগে থর থর করে কাঁপছিলেন কবি আনোয়ার হোসেন।

যাবেন নাকি সাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা রিক্সাওয়ালা শুধালো।

না।

সহসা বিকটভাবে চিৎকার করে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন। তার ইচ্ছে হলো এক ঘুষিতে রিক্সাওয়ালার নাক চোখ মুখ ভেঙ্গে দিতে।

সব শালা বেঈমান। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ।

রাস্তায় থু থু ছিটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি।

তখন দুপুর।

আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই।

সূর্য জ্বলছে।

ছাত্ররা সবাই স্কুল কলেজ বর্জন করে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে একে একে এসে জমায়েত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়।

মধুর রেস্তোরাঁ।

ইউনিয়ন অফিস।

পুকুর পাড়।

গম-গম করছে অসংখ্য কণ্ঠস্বরে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সামনে রাস্তায় ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলোর নিচে অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশের কর্তারা পায়চারি করছে রাস্তায়।

আর কনস্টেবলগুলো হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

রাইফেলের নলগুলো দুপুরের রোদে চিকচিক করছে।

ইউক্যালিপ্টাসের ডাল থেকে অসংখ্য পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে।

সহসা অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকারে চমকে সেদিকে তাকালেন পুলিশের বড় কর্তারা।

আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়েছে।

আমরা কোন কথা শুনতে চাই না।

কোন বক্তৃতার এখন প্রয়োজন নেই।

আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো।

ভাঙবো

ভাঙবো।

অনেকগুলো কণ্ঠ বজ্রের মতো ধ্বনি তুললো।

নেতারা বলছেন-

না, একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা যাবে না। আইন অমান্য করা ঠিক হবে না। আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাবো। স্বাক্ষর সংগ্রহ করেই আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাবো।

না!

না!!

না!!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তোমাদের কথা মানবো না।

বিশ্বাসঘাতক।

এরা সব বিশ্বাসঘাতক!!

তোমাদের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো।

আইনের বেড়ি আমরা ভাঙবো।

ভাঙবো!

ভাঙবো!!

ভাঙবো!!!

অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকারে চমকে উঠলেন পুলিশের বড় কর্তারা।

পিস্তলে হাত রাখলেন।

ছোট কর্তারা ছুটে এসে দাঁড়ালেন কন্‌স্টেবলগুলোর পাশে।

সেপাইদের চোখেমুখে কোন ভাবান্তর নেই।

হুকুমের ক্রীতদাস ওরা।

কর্তাদের মুখের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে।

সূর্য জ্বলছে।

রাইফেলের নলগুলো চিক্‌চিক্ করছে রোদে।

ইউক্যালিপ্টাসের ডাল থেকে একটানা পাতা ঝরছে।

কোন নেতার কথা আমরা শুনবো না।

টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে সহসা চিৎকার করে উঠলো তসলিম।

আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো। ভাঙবো, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে নয়। দশজন দশজন করে আমরা বেরিয়ে যাবো রাস্তায়। মিছিল করে এগিয়ে যাবো এসেম্বলির দিকে। এই আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত।

এই আমাদের আজকের শপথ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

অসংখ্য কণ্ঠের গগন-বিদারী চিৎকারে দ্রুত গাড়ি থেকে নিচে নেমে এলেন পুলিশের বড় কর্তারা।

তাদের চোখের ভাষা পড়ে নিতে ছোট কর্তাদের এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না।

মুহূর্তে তারা ফিরে তাকালেন কন্‌স্টেবলগুলোর দিকে।

হুকুমের দাস সেপাইগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো রাস্তার মাঝখানে।

প্রথম দশজন ছাত্রের দল তখন তৈরি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার জন্যে।

একটি ছেলে তাদের নাম ঠিকানা কাগজের লিখে নিচ্ছে।

প্রচণ্ড শব্দে লোহার গেটটা খুলে গেলো।

পুলিশের দল আরো দুপা এগিয়ে এলো সামনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শপথের কঠিন দীপ্তিতে উজ্জ্বল দশজন ছাত্র।

দশটি মুখ।

মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে পুলিশের মুখোমুখি রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

সেপাইরা ছুটে এসে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের।

সবার বুকের সামনে একটা রাইফেলের নল চিক্‌চিক্ করছে।

আমতলা।

মধুর রেস্তোরাঁ।

ইউনিয়ন অফিস।

পুকুর পাড়।

চারপাশ থেকে ধ্বনি উঠলো–

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

তৃতীয় দল এলো।

চতুর্থ দল এলো।

ধরে ধরে সবাইকে দুটো খালি ট্রাকের মধ্যে তুলে নিলো সেপাইরা। পুলিশের বড় কর্তাদের চোখমুখে উৎকণ্ঠা।

কত ধরবো?

কত নেবো জেলখানায়?

ঢেউয়ের মতো বাইরে বেরিয়ে আসছে ছাত্ররা।

সহসা চোখমুখ জ্বালা করে উঠলো ওদের।

সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে।

দরদর করে পানি ঝরছে দু'চোখ দিয়ে।

কে যেন চিৎকার করে উঠলো–

কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে ওরা।

চোখে পানি দাও।

অনেকগুলো ছাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরটার ভেতরে।

চোখ জ্বলছে।

পানি ঝরছে।

কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেছে পুরো এলাকাটা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল টপকে ঝাঁকেঝাঁকে ছাত্ররা এগিয়ে গেলো মেডিক্যাল ব্যারাকের দিকে।

কবি আনোয়ার হোসেনের জামাটা একটা লোহার শিকের মধ্যে আটকে ছিড়ে গেল।

পেছনে ফিরে তাকালেন না তিনি।

চোখমুখ জ্বলছে তাঁর।

জ্বলুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্ররা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে দিয়েছে।

আন্দোলন সবে শুরু হলো। কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়া দিয়ে তাকে আটকানো যাবে না।

ভাইসব!

সহসা চিৎকার করে উঠলো তসলিম।

আপনারা বিশৃঙ্খলভাবে ছুটোছুটি করবেন না। আপনারা এদিকে আসুন। আমরা মেডিক্যাল ব্যারাকে আবার জমায়েত হবো।

পুলিশের গাড়িগুলো ততক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে সরে গিয়ে মেডিক্যাল ব্যারাকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

বড় কর্তাদের কাছে হুকুম এসেছে, যেমন করে হোক এ আন্দোলনকে এখানে শেষ করতে হবে।

একটু পরে এসেম্বলি বসবে।

এম-এল-এ'রা সবাই আসবেন।

তাঁদের আসার আগে পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে।

ছাত্রদের সরিয়ে দিতে হবে পুরো এলাকা থেকে।

বড় কর্তারা আরো সেপাহী চাইলেন।

আরো গাড়ি এলো।

আরো সেপাহী এলো।

আরো অস্ত্র এলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরো ছাত্র এলো।

আরো কঠিন শপথে দীপ্ত হলো ওদের মুখ।

মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তাটা প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবয়ব নিয়েছে। বিলকিস বানুর গাড়িটা ঘিরে দাঁড়ালো একদল ছাত্র।

এদিকে কি হচ্ছে.....ঘুরে দেখবার বাসনা নিয়ে দেখতে এসেছিলেন বিলকিস বানু।

কিন্তু ছাত্রদের হাতে এভাবে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেন নি।

তার গাড়ির চাকা থেকে বাতাস ছেড়ে দেয়া হলো।

কাঁচগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো ছাত্ররা।

আপনার সাহস তো কম নয়! লিপস্টিক মেখে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন! জানেন না আজ হরতাল?

আমি কিছু জানি না। কিছু জানতাম না। বিশ্বাস করুন।

ভয়ে আর আতঙ্কে গলাটা শুকিয়ে গেলো বিলকিস বানুর।

ঝড়ে ভেজা কাকের মতো থরথর করে কাঁপছেন তিনি।

মেয়ে মানুষ, আপনাকে মাফ করে দিলাম। গাড়ি এখানে থাকবে। পায়ে হেঁটে যেখানে যাবার চলে যান।

মুহূর্তে গাড়ির কথা ভুলে গেলেন বিলকিস বানু।

গাড়ির চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

বেঁচে থাকলে অনেক অনেক গাড়ি হবে তার।

একটা পুলিশও ছিলো না ওখানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো মকবুল আহমদের।

দু'চোখে পানি ঝরছে বিলকিস বানুর।

আমার চুল টেনে দিয়েছে ছাত্ররা।

আমার মুখে থু থু দিয়েছে ছাত্ররা।

আমার গাড়িটা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রিসিভার তুলে নিলেন মকবুল আহমদ।

পুলিশের বড় কর্তাকে ফোনে পেয়ে রীরিমতো গালাগাল দিলেন তিনি। গুণ্ডা বদমায়েশরা রাস্তাঘাটে মেয়েছেলেদের ধরে ধরে অপমান করছে। দেখতে পাচ্ছেন না? কি করছেন আপনারা? কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিতে যদি কাজ না হয় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? গুলি করে ওদের ঠুলি উড়িয়ে দিতে পারছেন না?

মেডিক্যাল ব্যারাকের উপর তখন অজস্র কাঁদুনে গ্যাসের বর্ষণ চলছে। স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিগুণ গতি নিয়েছে।

এসেম্বলির দিকে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে তসলিম। তার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বললেন কবি আনোয়ার হোসেন– আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। কার শক্তি আছে একে স্তব্ধ করে দেয়?

মেডিক্যালের রাস্তায় অসংখ্য ইটের টুকরো ছড়ানো।

পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে এখন ইটের যুদ্ধ চলছে।

পুটলীটা বগলে নিয়ে অবাক চোখে সেদিকে চেয়ে রইলো গফুর।

কি হচ্ছে এসব?

ভাববার চেষ্টা করলো সে।

বুঝবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে কারণ নির্ণয় করতে পারলো না।

সূর্যটা ঈষৎ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

আকাশে তখনো এক টুকরো মেঘ নেই।

পলাশের ডালে সোনালি রোদ লাল রং মেখে নুয়ে পড়েছে পথের দু'পাশে। কয়েকটা কাক তার স্বরে চিৎকার জুড়েছে মেডিক্যালের কার্নিশে বসে।

এতক্ষণ বাতাস ছিলো।

মুহূর্ত কয়েক আগে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

সহসা শব্দ হলো।

গুলির শব্দ।

আবার!

আবার!!

মুহূর্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

ছাত্র।

জনতা।

মানুষ।

এক ঝলক দমকা বাতাস হঠাৎ কোত্থেকে যেন ছুটে এসে ধাক্কা খেলো ব্যারাকের এক কোণে দাঁড়ানো আমগাছটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো মুকুল ঝরে পড়লো মাটিতে।
কাকগুলো চিৎকার থামিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।
সূর্য সহসা এক টুকুরো মেঘের আড়ালে মুখ লুকালো।

খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো পুরো শহরে।
ওরা গুলি করেছে।
ছাত্রদের উপরে গুলি চালিয়েছে ওরা।
ক'জন মারা গেছে?
হয়তো একজন। কিম্বা দু'জন। কিম্বা অনেক। অনেক।
দোকানপাটগুলো সব ঝড়ের বেগে বন্ধ হতে শুরু হলো।
দোকানীরা নেমে এলো রাস্তায়।
বাসের চাকা বন্ধ।
কলকারখানা বন্ধ।
বিকট শব্দে হুইসেল বাজিয়ে ইঞ্জিল ছেড়ে নিচে নেমে এলো ট্রেনের ড্রাইভাররা।
আজ চাকা বন্ধ।

রিক্সাটা একপাশে ঠেলে রেখে খবরটা যাচাই করার জন্য সামনের একটা পান দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো সেলিম।

ওরা নাকি ছাত্রদের উপর গুলি করেছে? কতজন মারা গেছে?
হিসেব নেই।
সবাই খোঁজ নিতে এগিয়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।
মেডিক্যালের দিকে।
এটা অন্যায়।
এ অন্যায় আমরা সহ্য করবো না।
মেডিক্যালের কাছাকাছি এসে জনতা এক বিশাল মিছিলে পরিণত হলো।
ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ছে মানুষগুলো।
এ হত্যার বিচার চাই আমরা।
যারা আমাদের ভাইদের খুন করেছে তাদের বিচার চাই আমরা।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।
ঘন অন্ধকার ঢেকে পুরো শহরটা।

সে অন্ধকারকে আশ্রয় করে দুটো এম্বুলেন্স নিয়ে মেডিক্যালের পেছনে মর্গের সামনে এসে দাঁড়ালেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

মৃতদেহগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।
ভোর হবার আগেই আজিমপুরায় কবর দিয়ে দিতে হবে ওদের।
সারা শরীর ঘামাচ্ছে।
পকেট থেকে রুমাল বের করে বারকয়েক মুখ মুছলেন আহমেদ হোসেন।
লাশগুলোর নামধাম ঠিকানা যদি কিছু থেকে থাকে লিখে নাও।
কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব দিলেন জনৈক সহকারী।

একজনের কাছে একটা পুটলী পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটো শাড়ি, কিছু চুড়ি আর একটা আলতার শিশি। এগুলো কি করবো স্যার?

রেখে দাও। কাল অফিসে জমা দিয়ে দিও। লাশগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নাও গাড়ির ভেতরে।

এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

লাশগুলো আর একবার দেখবেন কি স্যার?

আরেক সহকারী প্রশ্ন করলেন।

না। প্রয়োজন নেই।

শান্ত গলায় জবাব দিলেন আহমদ হোসেন।

রুমালে আবার মুখ মুছলেন তিনি।

ছেলে তসলিমের মূর্খতার জন্য এতোদিন প্রমোশন বন্ধ হয়েছিলো।

এবার সরকার হয়তো মুখ তুলে তাকাবেন তাঁর দিকে।

মনে মনে ভাবলেন তিনি।

মৃতদেহগুলো গাড়ির মধ্যে তোলা হচ্ছে।

সহসা একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে চমকে উঠলেন আহমেদ হোসেন। সমস্ত শরীরটা মুহূর্তে যেন হিম হয়ে গেলো তাঁর।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অতিক্ষীণ স্বরে তিনি ডাকলেন–

দাঁড়াও।

মুহূর্তে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলো।

মাতালের মতো টলতে টলতে একটা মৃতদেহের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

টর্চ! টর্চটা দেখি!!

জনৈক সহকারী টর্চটা জ্বেলে মৃতদেহের উপর ধরলেন।

মৃত তসলিমের রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আহমেদ হোসেন।

চেনেন নাকি স্যার?

জনৈক সহকারী প্রশ্ন করলেন তাঁকে।

আহমেদ হোসেন বোবা দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু তাঁর দিকে। কিছু বলতে গিয়ে মনে হলো জিহ্বাটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। কিছুতেই নড়াতে পারছেন না তিনি।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা।

একি সর্বনাশ হয়ে গেলো আমার! আমি এবার কি নিয়ে বাঁচবো!! ছোট ভাইবোনগুলো মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে।

জানালার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে সালমা।

বাইরের আকাশটার দিকে তাকালো সে।

বুকে তার অব্যক্ত যন্ত্রণা।

আর একটা দিনও কি বেঁচে থাকতে পারতো না তসলিম!

কেন সে এমন করে মরে গেলো?

মেডিক্যালের সবগুলো ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখলো সালেহা।

নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে নেই।
থানায় গেলো।
জেলগেটে বন্দিদের খাতা খুলে নাম পড়লো সবার।
নেই।
এখানেও নেই।
শূন্য ঘরে ফিরে এসে সারারাত অপেক্ষা করলো সালেহা।
ভোরে কাক যখন জেগে উঠলো।
কেউ এলো না।
তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সালেহা।
নেই।
সে বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।
কলসি কাঁখে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলো আমেনা।
দিন গেল।
রাত গেল।
লোকটা বিয়ের বাজার করতে সেই যে শহরে গেলো কই আর তো এলো না।
নকশী কাঁথায় কত ফুল।
কত পাখি!
আঁকলো আমেনা।
লোকটা যে গেলো কই আর তো ফিরে এলো না!

AMARBOI.COM

সূর্য উঠছে।
সূর্য ডুবছে।
সূর্য উঠছে।
সূর্য ডুবছে।
সুতোর মতো এক লহরী পানি বালির উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে।
ধলপহরের আগে রাস্তায় নেমে এলো এক জোড়া খালি পা।
সুতোর মতো সরু পানি ঝরণা হয়ে বয়ে যাচ্ছে এখন।
কয়েকটি খালি পা কংক্রিটের পথ ধরে এগিয়ে আসছে সামনে।
ঝরণা এখন নদী হয়ে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে।
সামনে বিশাল সমুদ্র।
সমুদ্রের মতো জনতা।
নগ্ন পায়ে এগিয়ে চলেছে শহীদ মিনারের দিকে।
অসংখ্য কালো পতাকা।
পত পত করে উড়ছে।
উড়ছে আকাশে।
মানুষগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে।
ইউক্যালিপ্টাসের পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে। ঝরে।
প্রতি বছর ঝরে।
তবু ফুরোয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটাকে দেখলেই গা জ্বালা করে রহমতের।

গর্বে মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না লোকটার। লম্বা সুঠাম দেহ। দেড় হাত চওড়া বুক। মাংসল হাত দুটো ইস্পাত-কঠিন। বড় বড় চোখ দুটোতে সব সময় রক্ত যেন টগবগ, টগবগ করে। গায়ের রঙটা কালো কুচকুচে। চামড়াটা ঠিক কাকের পাখনার মতো মসৃণ আর তেলতেলে। গর্বে মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না লোকটার। সকালে ভোরে ভোরে উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। রাত দশটায় ঘরে ফেরে। হাতমুখ ধুয়ে ভাত খায়। তারপর নিজ হাতে তৈরি আমকাঠের ইজিচেয়ারটাকে দাওয়ায় টেনে এনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। বসে বসে 'কিংস্টর্ক' সিগারেট ফোঁকে।

লোকটাকে দেখলেই গা-জ্বালা করে উঠে রহমতের। মনে মনে ঈর্ষা হয়, শুধু তার প্রতি নয়; তার গোটা পরিবারটাই ওর কাছে ঈর্ষার বস্তু।

সেদিন রাতের ভাত খেয়ে বারান্দায় বসে বসে লোকটা যখন সিগারেট ফুঁকছিলো, তখন জানালার ফাঁক দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রাগে গজগজ করছিলো রহমত। স্ত্রী মেহেরুনকে ডেকে এনে দেখাচ্ছিল। দেখ দেখ শা'র বাবুয়ানা দেখ। পায়ের উপর পা তুলে কেমন চুরুট টানছে। যেন নবাব সলিমুল্লার নাতি আর কি।

ইস্। দেমাক কত। মেহেরুন তার ঠোঁট-মুখ বিকৃত করেছিল। দেমাকের আর জায়গা পায় না। এত দেমাক থাকবে না, থাকবে না। তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল, বাসের ড্রাইভার, তার আবার এত দেমাক কেন? রহমত এর উত্তরে কিছু বলেনি। শুধু নীরবে দাঁতে দাঁত ঘষেছিল একটানা অনেকক্ষণ। আর মনে মনে লোকটার বংশ নিপাত করেছিল।

লোকটাকে সবাই চেনে এ পাড়ার। বাস ড্রাইভার রহিম শেখ। রহিম শেখ বাস চালায়। টাউন সার্ভিসের বাস। ওর কোন ধরাবাঁধা বেতন নেই। দৈনিক যা টিকেট বিক্রি হয় তা থেকে পেট্রোল খরচ আর মালিকে কমিশন বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা কন্ডাক্টর, সে আর যে ছোকরাটাকে নবাবপুর-ষ্টেশন-হাইকোর্ট বলে চিৎকার করবার জন্যে রাখে, সে ভাগ করে নেয়। টাকা যে খুব পায় তা নয়। তবু সেই অল্প ক'টা টাকা কাপড়ের ব্যাগে পুরে যখন সে বাসায় ফেরে, তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন-প্রাণ ভরে থাকে রহিম শেখের। কাজ তার গর্ব। কাজ করেই খায় সে। পরের কাছে হাত পাতে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। কিংবা তাদের ওই বাসের মালিকটার মতো পুঁজি খাটিয়ে বসে বসে মুনাফা লুটে না। কাজ করেই খায় সে। কাজ তার গর্ব।

বাসায় বউ আছে তার। আমেনা। বাড়িতে অবসর সময় বেতের ডালা, বাস্কেট আর মাদুর তৈরি করে সে। পরে স্বামীর হাতে বাজারে বিক্রি করতে পাঠায়। ছেলেমেয়েও কম নয়। তিন মেয়ে, দুই ছেলে। বড় মেয়ে মুন্নির বয়স এবার চৌদ্দতে পড়লো। ওর পায়রা পোষার সখ। সেই বছর তিনেক আগে মেয়ের আবদার রাখতে গিয়ে বাজার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজোড়া খয়েরি রঙ-এর পায়রা এনে দিয়েছিল রহিম শেখ। সেই একজোড়া বংশানুক্রমিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন বার জোড়ায় পৌঁছেছে। সারাদিন ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে মুন্নি। ওদের ঘরগুলো ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়া। খাওয়ানো। নতুন বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করা। সকাল আর বিকেলে পায়রাগুলোকে একবার করে আকাশে উড়িয়ে দেয়া। সন্ধ্যাবেলা বাসায় ঢুকলে সযত্নে খোঁপের দরজাগুলো একে একে বন্ধ করে দেয়া। ওদের নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকে মুন্নি। কিন্তু পায়রাগুলো ওর বড় বজ্জাত। মাঝে মাঝে দল বেঁধে মেহেরুনের ঘরে ঢুকে ওর চালডাল খেয়ে ফেলে। দেখলে রেগে আগুন হয়ে যায় মেহেরুন। প্রথমে পায়রাগুলোকে গালিগালাজ করে। যমের হাতে দেয়া, তারপর উঁচু গলায় পায়রার মালিকের উপর আক্রমণ চালায়। সব শেষে গোটা পরিবারটার উপরই রাগে ফেটে পড়ে মেহেরুন। এ তার রোজকার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এইতো সেদিন ভরদুপুরে কি গালাগালিটাই না পাড়ছিলো সে। মুন্নি তখন সবে গোসল সেরে ভেজা চুলগুলো রোদে শুকুচ্ছিলো বসে বসে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই মেয়ে, সামলে কথা বল বলছি, নইলে ভালো হবে না, কবুতরে চাল খেয়েছে তো আমরা কি করবো অ্যাঁ?

কি করবো মানে, বেঁধে রাখতে পার না?

ওগুলো কি গরু–ছাগল যে বেঁধে রাখবো?

বেঁধে না রাখতে পারলে, পুষবার এত সখ কেন শুনি? অন্যের ঘরে ঢুকে যখন তখন চালডাল খেয়ে ফেলে নষ্ট করে, বলি চালডালগুলো কিনতে কি পয়সা লাগে না, না মাগনায় পাই?

এরপর আরো কিছুক্ষণ উভয়ের তরফ থেকে তর্কবিতর্ক চলেছিলো। সবশেষে খোদাকে সাক্ষী রেখে মেহেরুন প্রতিজ্ঞা করেছিলো। দেখ মুন্নি, এবার যদি তোর কবুতর আমার চালডাল খায়, তাহলে সেই কবুতরের জান আমি রাখবো না হুঁ।

মুন্নি ঠোঁট উলটিয়ে বলেছিল, ইস এত সস্তা না।

কিন্তু মেহেরুনের কাছে ব্যাপারটা খুব যে সস্তা তা বিকেলেই টের পেয়েছিল মুন্নি। সাদা–কালো রঙ মেশানো পায়রা জোড়া বাসায় ফেরেনি। এদিক ওদিক তালাশ করলো মুন্নি। আমেনাও নিজের কাজ ফেলে রেখে মেয়ের সাথে তালাশে নামলো। অন্ধকার ঘন হয়ে এলো তবু পায়রা জোড়ার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল মুন্নির। মেহেরুনের ঘরের চারপাশে সতর্কভাবে বারকয়েক ঘুরাফেরা করলো সে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। কিন্তু ঘরের ভেতর জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না সে।

রাতে রহিম শেখ বাসায় ফিরলে আমেনা সবকিছু খুলে বললো তাকে। মুন্নি তখন পায়রার শোকে বসে বসে কাঁদছিলো দাওয়ায়। সবকিছু শুনে মেয়ের দিকে এক পলক তাকালো রহিম শেখ। রাগে ছ' ফুট লম্বা দেহটা তার থরথর কেঁপে উঠলো। অন্ধকার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গালিগালাজ যা কিছু জীবনের সঞ্চয় সব উজাড় করে দিলো সে রহমত আর মেহেরুনের উদ্দেশ্যে। পরে রাগটা একটু কমে এলে শ্বাস টেনে টেনে বললো, হারাম খেতে খেতে এদের হারাম খাওয়ার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ, কাজকর্ম একটা কিছু করে খাবে না–তো চুরিচামারি করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে খায়। শা-যাবি সব জাহান্নামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে যাক তুমি এসো, মেয়েকে নিয়ে এখন ভাত খাও। আমেনা স্বামীকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলো।

অনেক রাতে, জানালা আর কপাট বন্ধ করা পাকের ঘরটায় বসে কবুতরের ঝোল দিয়ে মজা করে ভাত খেয়েছিল সেদিন রহমত আর মেহেরুন। একমুখ ভাত চিবুতে চিবুতে মেহেরুন বলেছিল, যা করেছি, ঠিক করেছি, কি বলো?

হ্যাঁ, ঠিক। রহমত সায় দিয়েছিল। ব্যাটা বাসের ড্রাইভার বলে কিনা আমরা হারাম খাই। শা–তুমি যেমন ড্রাইভারি করে রোজগার কর; আমিও তেমন মানুষের হাত দেখে পয়সা কামাই। তোমারটা যদি হালাল হয়, আমারটা হারাম হতে যাবে কেন?

ঠিকই তো। মেহেরুন সমর্থন জনিয়েছিল তাকে। আর লোকটার দেমাক দেখো না। কালকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েকে বলছিলো, ভিক্ষে করা পয়সা নয় আমার। গায়ে খেটে রোজগার করি। একটা ফুটো পয়সারও আমার দাম আছে। শা–দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। রহমত মুখ বিকৃত করেছিলো। কথায় কথা বেড়েছিলো, আলাপ চলেছিলো অনেকক্ষণ।

মাঝখানে অনেকগুলো দিন।

দু'টি পরিবারের জীবন এমনি করেই এগুচ্ছিলো। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটলো। দুর্ঘটনা ঘটলো রহিম শেখের জীবনে। প্রথম দুর্ঘটনা। এর আগে পর পর ক'টা দিন একটানা ধর্মঘট করেছিলো ওরা। কমিশন কমানোর দাবিতে ধর্মঘট। আর ধর্মঘট শেষ হবার দিন চারেক পর সকালে, আর আর দিনের মত বাস নিয়ে বেরিয়েছিল রহিম শেখ। লম্বা, সুঠাম দেহ মাংসর হাত দুটো ইস্পাত কঠিন। বড় বড় চোখ দুটো রক্তজবার মত লাল। বাসটা ঠিকই চালাচ্ছিলো রহিম শেখ। কিন্তু হঠাৎ সামনের ট্রাককে পাশ কাটাতে যেতেই, তীব্রবেগে বাসটা গিয়ে ধাক্কা খেলো রাস্তার পাশের একটা ল্যাম্পপোস্টের সাথে। পরক্ষণেই সামনের কাঁচভাঙ্গার ঝনঝন শব্দ। দু'হাতে চোখ দুটো চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো রহিম শেখ। লাল চোখ বেয়ে লাল রক্তের স্রোত নেবে এলো তার।

বাসায় সবাই যখন এ খবর পেলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

মুন্নিকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলো আমেনা।

অনেক খোঁজ খবরের পর সন্ধান মিললো তার। চোখেমুখে ব্যান্ডেজ আঁটা, নিসাড় হয়ে শুয়ে আছে সে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কে?

আমি। গলা দিয়ে কথা সরছিলো না আমেনার।

একটু নড়েচড়ে রহিম শেখ আবার বললো, সাথে আর কেউ আসেনি?

এসেছে।

কে?

আমি বাবা। মুন্নি এগিয়ে বাবার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। চোখ দুটো তার পানিতে টলমল করছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যান্ডেজ বাঁধা চোখ দুটো দু'হাতে চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে রহিম শেখ বলে উঠলো উঃ! আমি সব হারিয়েছি। সব হারিয়েছি। এবার আমি কি করে বেঁচে থাকবো?

কাপড়ের খুঁটে চোখের পানি মুছে নিয়ে আমেনা বললো, ওগো, খোদা না করুন, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়; তুমি ঘাবড়িয়ো না। আমি আছি, দু'বেলা চারটে ভাত জোটে সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেনার কথায় মনকে সান্ত্বনা দিতে পারলো না রহিম শেখ। প্রশান্তভাবে বার কয়েক মাথা নাড়লো সে।

খবর পেয়ে রহমতও দেখতে এসেছিল তাকে। মেহেরুন বলেছিল লোকটার সাথে যত শত্রুতাই থাক না কেন, হাজার হোক, সে আমাদের প্রতিবেশী, তাকে একবার দেখে আসা উচিত।

হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে বলনি। রহমত সায় দিয়েছিলো তার কথায়। আজকাল কিন্তু রহিম শেখকে দেখলে তার প্রতি আর ঘৃণা বোধ হয় না রহমতের। আর ভয় লাগে না তাকে। বরঞ্চ তার প্রতি আজকাল অনুকম্পা জাগে ওর। করুণা হয়। হবেই বা না কেন? লোকটা তো আগের মতো আর দেমাক দেখিয়ে বেড়ায় না। দুটো চোখই হারিয়েছে সে। চোখ গেলে আর দুনিয়াতে কী-ই বা থাকে মানুষের। চাকরিটাও গেছে তার। এখন তো ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই রহিম শেখের। এখন তো আর দশজনের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয় সে। এই ভেবে তার প্রতি করুণা জাগে রহমতের। দয়া হয়। সেই লম্বা সুঠাম দেহটা যেন কেঁচোর মতো কুচকে একটুখানি হয়ে গেছে। মাথা উঁচিয়ে আজকাল আর চলতে পারে না সে। দাওয়ায় বসে ঝিমোয়। ক'দিন থেকে রহমত লক্ষ করছিলো, ভোর সকালে উঠে ছোট ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে যায় রহিম শেখ। অনেক রাত বাসায় ফিরে। তারপর দাওয়ায় পিদিমের আলোতে বসে বসে, মুন্নির হাতে থলে থেকে বের করা ফুটো পয়সা, আধ আনি, এক আনি সব হিসেব করায়।

ব্যাপার কি, অ্যাঁ? মেহেরুনকে একদিন জিজ্ঞেস করলো রহমত। মেহেরুন গালে হাত দিয়ে বললো, খোদা মালুম। আমি কি জানি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, কি আর করবে, ভিখ মাগতে যায় আর কি। বলতে গিয়ে এক টুকরো হাসি দোল খেয়ে উঠলো ঠোঁটের কোণে। রহমতও হাসলো। সুক্ষ্ম সূতোর মতো মিহি হাসি।

সে দিনটা ছিলো রোববার। রোববারে অফিস- আদালত সব বন্ধ থাকে। আর তাই ও দিনটা রহমতের রোজগার বেশ বেড়ে যায়। কেরানি বাবুরা সব হাত দেখাবার জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলে। কারো বা প্রমোশন। কারো বিয়ে। আবার কেউ কেউ ছেলেপুলের সংখ্যাও জানতে চায়। সবদিন এক জায়গায় বসে না রহমত। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে।

সেদিন সদরঘাটের মোড়ে বসবে বলেই ঠিক করলো সে। জায়গাটা খুব ব্যস্তসমস্ত। লোকজনের চলাফেরা খুব বেশি। ছুটির দিনে তো এমন ভিড় লাগে, মনে হয় যেন একটা হাট বসেছে।

রাস্তার পাশে একটা ভালো জায়গা ঠিক করে নিয়ে বসে পড়লো রহমত। পাশেই একটা খোঁড়া আর একটা শীর্ণকায় মেয়ে ছোট্ট একটা টিন হাতে ভিখ মাগতে বসেছে। এ বাবু, চারটে পয়সা দাও বাবু, দু'দিন কিছু খাইনি বাবু, চারটে পয়সা দাও।

অদূরে খবরের কাগজের হকাররা সব চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, ইত্তেফাক-আজাদ-মর্নিং নিউজ। হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো রহমত; তাকিয়ে দেখলো, চৌরাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টটার নিচে দাঁড়িয়ে রহিম শেখ। হাতে তার এক গাদা কাগজ। উর্ধ্বে একখানা কাগজ তুলে ধরে সে জোর গলায় হাঁকছে, গরম খবর সার-গরম খবর।

ইস, দেমাকে যেন পা মাটিতে পড়তে চায় না লোকটার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা আমার কি ছিল? বন্ধু-বান্ধব? কিছুই নয়, তবু ওদের স্মৃতি আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণহীন করে তুলেছে কেন? মানুষের মৃত্যু! সেতো এক চিরন্তন সত্য। মৃত্যু আছে বলেই সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আবার নব নব সৃষ্টিই মানুষকে যুগে যুগে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর প্রেরণা দিয়ে এসেছে।

কিন্তু তবুও ওদের মৃত্যুতে আমি এত ব্যথাতুর কেন? কত শত দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমি ডিঙ্গিয়ে এসেছি, কত লাখো হাজার মাংসহীন দেহকে রাস্তার আনাচে-কানাচে পড়ে থাকতে দেখেছি, দু'মুঠো ভাতের অভাবে, দিনের পর দিন তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে মানুষ কেমন করে মরে, তাও আমি দেখেছি। দীর্ঘশ্বাসের অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে আমি কতবার প্রত্যক্ষ করেছি- আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া পড়শী অনেকেই চলে যাচ্ছে মৃত্যুপথের মিছিল ধরে, চোখের জল চোখে শুকিয়ে; নতুনকে আলিঙ্গন করে নিয়েছি, পুরাতনের সমাধির পাশে বসে, জীবনকে প্রাণহীন হতে দিইনি কিছুতেই। কিন্তু আজ আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি কেন? যুদ্ধক্ষেত্রের এই বীভৎস রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি সৈনিকের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে শত্রু সৈন্যের রক্ত পানেচ্ছায়। আমি এত নিস্তেজ কেন?

অনেক কষ্ট করে কতগুলো ফুলের চারাগাছ সংগ্রহ করেছি, ওদের কবরের শিয়রে। যেখানে ক্রুশগুলো গাড়ানো আছে, আর এক পাশে পুঁতে দেব বলে। এ গাছগুলো একদিন বড় হবে। ওতে ফুল ফুটবে, তার সে ফুলগুলো এক একটা করে ঝরে পড়বে ওদের কবরের ওপর; ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে কবরের মানুষগুলো সব জেগে উঠবে, ফুল ওদের শোনাবে শান্তির আগমন বাণী; ওদের বিক্ষুব্ধ আত্মা শান্তি পাবে, ওরা শান্তি পাবে। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন রাত্রেও আজকের মতো ভীষণ শীত পড়েছিলো। গরমের দেশের লোক আমরা, এত শীত আমাদের সইবে কেন? দুটোর ওপর চারটে কম্বল চাপিয়েও বিছানায় শুয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম।

ফ্রন্ট থেকে মাত্র অল্প কয়েক মাইল দূরে মিলিটারি হাসপাতালের ডাক্তার আমি। রাত্রে মাত্র চার ঘন্টার বিশ্রাম। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম চলে আসে। কিন্তু সেদিন এর ব্যতিক্রম হলো, ঘুম এলো না। নানা রকম এলোমেলো চিন্তা এসে মাথায় গিজ গিজ করতে লাগলো। রেডিয়াম ঘড়িতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা ঘন্টা এর মধ্যেই কেটে গেছে। আর মাত্র তিনটে ঘন্টা বাকি আছে, কিন্তু ঘুম এখনো এলো না। চমকে উঠলাম, ঘুম! আমি জানি, নিশ্চিত করে জানি, একজন ষোল বছরের কচি ছেলে আজ রাত ভোর হবার আগেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। পৃথিবীর সমস্ত গোলা-বারুদ যদি একসাথে শব্দ করে ওঠে, তবুও তার সে ঘুম ভাঙবে না।

যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিন থেকেই জানতাম, ওর বাঁচবার কোন আশা নেই। সকরুণ দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে ব্যথিত স্বরে বলেছিল- ডাক্তার, আমার বাঁচবার কি কোন আশা নেই, ডাক্তার! জানতাম, বুকের পাঁজরে গুলি লাগলে সে রোগীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম– ভয় করবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

বেদনায় ভরা মুখখানা ওর আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তা ম্লান হয়ে গেলো। যখন সে একটা অসহনীয় বেদনা অনুভব করলো বুকের নিচে,–এক গ্লাস জল। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো, জল নিয়ে এলো নার্স, কিন্তু এক ফোঁটা জলও তার ভাগ্যে জুটলো না, গ্লাস ভরে গেলো উষ্ণ রক্তে, রক্ত বমন আরম্ভ হলো ওর, ভীত বিহ্বল চোখ দুটো বেয়ে এবার নামলো অশ্রুর বন্যা, কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া গেলো না, বললাম– কেঁদো না জর্জ, কাঁদলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে।

–আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না ডাক্তার! আমি জানি, আমার বাঁচবার কোন আশা নেই, ক্ষুব্ধ অভিমানে ও চাপা আর্তনাদ করে উঠলো।

ষোল বছরের এক কচি বালক। ফুল সবেমাত্র পাপড়ি মেলছিলো, ওর সম্মুখে ছিল আশা-আকাঙ্খা ভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু– না ফুটতেই পাপড়ি ঝরে গেলো। পুওর জর্জ!

উঃ! ওর কথাগুলো আজও বার বার আমার কানের ওপর মর্মর বেদনা সৃষ্টি করছে,–জানো ডাক্তার। এরা আমায় জোর করে আমার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

–কথা বলো না জর্জ। কথা বলা নিষেধ। কিন্তু আমার মানা সত্ত্বেও সে থামলো না স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছে, তবুও সে আপন মনে বলে চললো– হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই মরে যাবো। আমার মা, ছোট ভাই-বোন, কাউকে আমি দেখবো না, কাউকে আমি আর দেখবো না। কান্নায় ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এলো।

ঘুম আর আসবে না জানি, যা একটু তন্দ্রা এসেছিল, তাও ছুটে গেলো, চিন্তা স্রোতের গতি পরিবর্তনের ধাক্কায়, গুলির শব্দে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যে দৃশ্যটা দেখলাম, সে দৃশ্য দেখে পাষাণেরও চোখে জল আসে।

এডোয়ার্ড বলেছিলো নিজ হাতে সে তার জীবনের যবনিকা টেনে দেবে!

–যে বাঁচার ভেতর সার্থকতা নেই, যে জীবনের ভেতর এতটুকু মধুরতা নেই, সে জীবনের ঘানি টেনে কি লাভ ডাক্তার? বার বার আক্ষেপ করেছিলো এডোয়ার্ড। বেচারা তার দুটো চোখই হারিয়েছিলো, শুধু তাই নয়, মুখটা এমন কদাকার হয়ে গিয়েছিলো যে, দেখলে ভয় হতো। এক সময় সে যে খুব সুশ্রী ছিলো তা তার মুখের এক পাশেকার সুস্থ স্থানটুকু দেখলেই বোঝা যেতো। এডোয়ার্ড বলেছিলো, গত জুলাই মাসে ওর বিয়ে হবার কথা ছিলো ম্যারিয়ানার সাথে। ম্যারিয়ানা! রুদ্ধ হয়ে এলো এডোয়ার্ডের কণ্ঠস্বর। লাজুক মেয়ে ম্যারিয়ানা, ছোটকাল থেকে এক সাথেই আমরা বড় হয়েছিলাম। জানালার বাইরে অন্ধ দৃষ্টি মেলে এডোয়ার্ড বললো,....আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম। আমাদের গার্জেনরা তার যথোচিত মর্যাদা দিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে। বার কয়েক ঢোক গিললো এডোয়ার্ড, ডাক্তার, তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো, তখন আমাদের অন্তরে কেমন খুশির বন্যা বয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু– কিন্তু! দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে। কিন্তু একি হলো ডাক্তার! আমার সে জীবন কোথায় গেলো? আমি জানি, আমার সে জীবন আর ফিরে আসবার নয়, সে আর ফিরে আসবে না। জর্জের মতো এডোয়ার্ড অল্পবয়স্ক ছিল না, তাই চোখের জলকে সে সামলে নিয়েছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–যুদ্ধে এলে কেন? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলাম।

–হ্যাঁ যুদ্ধে কেন এলাম। মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বললো সে। –কিন্তু, তুমি ম্যারিয়ানার কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলে ডাক্তার। ম্যারিয়ানাও বলেছিলো, কেন যুদ্ধে যাবে? যুদ্ধ করে তোমার কি লাভ? সে দিন প্রথম ম্যারিয়ানার চোখে জল দেখেছিলাম, ও ভীষণ কেঁদেছিল আর বলেছিল, যুদ্ধে যেয়ো না এডোয়ার্ড। যুদ্ধে আমাদের কোন দরকার নেই। কিন্তু ম্যারিয়ানা জানতো না যে, আমাদের সরকার সৈন্যবৃত্তি গ্রহণ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যুদ্ধ করবার ইচ্ছা থাকুক কিংবা না থাকুক সবার গলায় একটা করে ব্রেনগান ঝুলিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া চাই–ই। আজ বার বার মনে হচ্ছে, ম্যারিয়ানা ঠিকই বলেছিলো যুদ্ধে আমাদের কি লাভ? বুলেটের সামনে, কুকুর বেড়ালের মতো মরা, তীব্র সেলের আঘাতে হাত পা আর চোখ হারিয়ে চিরতরে অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি পুরস্কারই আমরা পেয়ে থাকি?

একটুখানি চুপ করে এডোয়ার্ড আবার বললো– আমি জানি ম্যারিয়ানা আর আমায় গ্রহণ করবে না।

–নিশ্চয়ই সে গ্রহণ করবে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম।

–না–না–না, কি বলতে গিয়ে এডোয়ার্ড থেমে গেলো। তারপর অনেকক্ষণ কি চিন্তা করে ধীরে ধীরে বললো, হ্যাঁ, ম্যারিয়ানা হয়ত আমায় গ্রহণ করবে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে আমায় নিয়ে সুখী হতে পারবে না, উঃ! আমি সব কিছু হারিয়েছি।

তখন বিশ্বাস হয়নি এডোয়ার্ডের কথা, কিন্তু যখন রক্তাপ্লুত মেঝের ওপর তাকে রিভলবার হাতে পড়ে থাকতে দেখলাম, তখুনি বিশ্বাস করতে পারছিলাম যে, এডোয়ার্ড আত্মহত্যা করেছে। রিভলবারের গুলিতে মাথার হাড়গুলো চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এডোয়ার্ডের উত্তপ্ত মস্তিষ্কগুলোকে যখন মেঝের উপর থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছিল, তখনি জর্জ প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলো। –এরা আমার বাবাকে মেরেছে, আমার চার ভাইকে ধরে এরা কামানের মুখে জুড়ে দিয়েছে, আমায়ও মারলো এবং এরা আমায় বাঁচতে দিলো না। এরা কাউকে বাঁচতে দেবে না। সবাইকে মেরে ছাড়বে এরা। সবাইকে।

দুয়ারে মৃদু শব্দ হতে চমক ভাঙলো আমার। ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে। আমার পাওনা চারটে ঘণ্টার মধ্যে তিনটেই শেষ, এবার কে যেন দুয়ারে আরো জোরে শব্দ করলো, ওয়ার্ড ইনচার্জ–এর গলা শুনতে পেলাম, মিঃ চৌধুরী শীঘ্রি আসুন। চল্লিশ নম্বর সিটের রোগীটার অবস্থা ভীষণ খারাপ, ও আপনাকে খুঁজছে।

চল্লিশ নম্বর সিট। হ্যাঁ, জর্জের সিট নম্বর চল্লিশ। কিন্তু, সে আমায় খুঁজছে কেন? দেরি নয়, আলেস্টারটা গায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ওর উপর, নিস্তেজ হয়ে এসেছে ওর দেহ। ওর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, অতি জোর করেই বুঝি ও চোখ দু'টিকে মেলে, একবার চারদিকে চাইলো। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই এক টুকরো ম্লান হাসি হেসে, ঈশারা করে কাছে ডাকলো। আমার মুখটাকে জোর করে টেনে নিয়ে ও–ওর মুখের উপর রাখলো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মৃদু স্বরে কানে কানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললো, আশীর্বাদ করো ডাক্তার। এরপর যেন এমন একটা দেশে জন্মাই, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে এমন করে বলি দেয়া হয় না। আশীর্বাদ করো ডাক্তার। আ.....। কথা বন্ধ হয়ে গেলো চিরতরে। আরও কি বলতে চেয়েছিলো ও, কিন্তু পারলো না। আশ্চর্য হলাম আমি, এ কয়টা কথা বলতেই কি সে এতক্ষণ মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে ছিল কিন্তু এ তো শুধু কথা নয়, ওর অন্তিম মুহূর্তের একটা বাসনা।

এডোয়ার্ড আর জর্জের আত্মা চলে গেছে দূরে সমুদ্র পারে, তাদের ছোট্ট গ্রামগুলোতে, রিক্সাটকায় সমুদ্র পোতের গহ্বরে ভরে যেখান থেকে তাদের চালান দেয়া হয়েছিল, দেয়া হয়েছিল যুদ্ধের শিকার হিসেবে বধ্যভূমির দিকে। উঃ! হে বিধাতা, যদি সত্যিই তুমি থেকে থাক, তা'হলে ওদের ক্ষমা করো না। উগ্র সাম্রাজ্যলোলুপতায় যারা লাখো সহায়-সম্বলহীন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করে। কোটি কোটি নারীকে বৈধব্যের বেশ পরিয়ে দুঃখের হোমানলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। তাদের তুমি ক্ষমা করো না। বিস্ময়ে রোষান্বিত হয়ে উঠেছিল প্রশস্ত কপাল। অবাক হয়ে গিয়েছি বৃদ্ধ লুইয়ের কথায়।

আর, রক্ত পিপাসুক, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য যাঁরা লড়াই করে, তাদের তুমি আরও শক্তি দাও প্রভু! তাদের তুমি আরও সাহস দাও।

কিন্তু আর দেরি নয়। রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো প্রায়। ঘণ্টা কয়েক মাত্র বাকি, যুদ্ধশান্ত সৈনিকরা সব এখন বিশ্রাম নিচ্ছে, সকালের আক্রমণ আরো শক্তিশালী করবার জন্য।

ফুলের চারা গাছগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরে। বাঁ দিকে একটু এগিয়ে গেলেই সৈন্যদের গোরস্থান, সেখানেই আছে জর্জ, এডোয়ার্ডের কবর ও লুইয়ের সমাধি।

কে.....ও? সরে গেলো জর্জ, এডোয়ার্ড আর লুইয়ের কবরের পাশ থেকে?

আশেপাশে কোন জনবসতি নেই জানি, কিন্তু এ কিশোরী মেয়ে কোত্থেকে এলো এখানে?

আমাকে কিছু ভাবতে না দিয়েই ও হাত দিয়ে আমায় কাছে ডাকলো। তারপর চোখ দিয়ে ইশারায় বললো, পিছে পিছে এসো। ও চলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু, এক অপরিচিত মেয়ের পেছনে পেছনে আমি যাবো কেন?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ও ফিরে দাঁড়ালো, ধীরে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। উঃ কি তীব্র চাহনি। চোখ দুটো ঝলসে উঠলো আমার, চাপা আর্তনাদ করে উঠলাম, আসছি। তারপর পিছে পিছে এগিয়ে চললাম। একটা কথাও বললো না কিশোরী মেয়েটি। রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। কোথায়? এবং কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে?

কিসের পচা ভেপসা গন্ধ ভেসে এলো নাকে, হাত দিয়ে রুমালটা বের করে আনলাম পকেট থেকে, ক্রমশ আরও তীব্রতর হয়ে আসছে গন্ধটা। বমি করবার উপক্রম হলো আমার। তবুও এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে।

এক সময়ে মেয়েটা পিছন ফিরে দাঁড়ালো। অবাক হলাম, একটু আগে যে চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো এখন সে চোখ দুটোকে কত শান্ত, স্নিগ্ধ আর আবেগপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তুমি এখানে কি কাজ করো? মেয়েটির গলার স্বর আমার কানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেতারের ঝঙ্কার দিয়ে গেলো, বিস্ময়ে কপালের রেখাগুলো কুঁচকে এলো আমার। কে.....এ নারী। সাধারণ মহিলা না দেবী? মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

–আমি এখানে ডাক্তারী করি।

–ডাক্তারী করো? আমাকে ডাক্তার বলে মেয়েটির যেন বিশ্বাস হলো না, এমনি ভাব করলো সে, তারপর বললো–

–ডাক্তার হয়ে তুমি এ গন্ধটা কিসের বলতে পারছো না?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। নাকের উপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নিয়ে ভালো করে গন্ধটা পরীক্ষা করে দেখলাম আমি, তারপর বললাম, নিশ্চয়ই কোন জন্তু জানোয়ার মরে পচে আছে।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! মেয়েটির বিকট হাসিতে শিউরে উঠলাম আমি, মনে হলো যেন রূপকথার কোন এক রাক্ষুসে মূলোর মতো দাঁত বের করে আমাকে ব্যঙ্গ করলো। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, কতগুলো জন্তু জানোয়ার ওখানে মরে পচে আছে। ভ্রূ কুঁচকে কথা কয়টি বলে, এক অদ্ভুত বিজাতীয় হাসি টানলো মেয়েটি। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা আক্রোশে বার বার উচ্চারণ করলো সে, জানোয়ার! জানোয়ার! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হাঃ! হাঃ! হাঃ! পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটি আবার তাকালো আমার দিকে। ভয়ে কাঠ হয়ে এলো সমস্ত শরীর। একি সেই শান্ত স্নিগ্ধ নারীমূর্তি! না এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড!

হ্যাঁ, ওরা জানোয়ারই তো! নইলে এমন করে মরবে কেন? মেয়েটি আবার বললো।

এতক্ষণে খেয়াল ভাঙলো আমার। কোথায় চলেছি আমি? কোন্ মরীচিকার পথে? ফিরে দাড়ালাম আমি, কিন্তু এগোতে পারলাম না এক পা–ও। পেছন থেকে ডাক এলো, ডাক্তার কি অদ্ভুত করুণায় ভেজা সেই আহ্বান। তুমি বড্ড অস্বস্তি বোধ করছো, নয় কি ডাক্তার? কিন্তু তোমায় আমার বড্ড প্রয়োজন আছে ডাক্তার।

মেয়েটির চোখে অসংখ্য অনুরোধ।

সামনে এগিয়ে চলতে চলতে মেয়েটি আবার বললো, ওই যে, ওই দেখ ডাক্তার! জানোয়ারগুলো কেমন করে পড়ে আছে।

শিউরে উঠলাম আমি। সামনে যতদূর দেখা যায়, শুধু মৃতের স্তূপ। কোন এক সময় হয়তো এরা মানুষ ছিলো, কিন্তু, সঙ্গীনের খোঁচায় আর বুলেটের আঘাতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বিকৃতি লাভ করেছে যে ওদের মানুষ বলে ভাবা দুঃসাধ্য।

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, হাঃ! হাঃ! হাঃ! সেই বিকট হাসি, মেজর কলিনসের দাঁত বের করা সেই প্রবল অট্টহাসি–"হাঃ! হাঃ! হাঃ! আর টেবিলে চপেটাঘাত করে বলা সেই কথাগুলো–Struggle for existence। বাঁচবার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাবো! আর যত পারবো শত্রুদের হত্যা করবো। মানুষের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। মানুষ চাই না আমরা। আমরা, চাই মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম খনিগুলো। সোনা ফলানো শস্যভূমি আর বড় বড় কারখানাগুলো, আর চীন ভারতের মতো কলোনিগুলো, যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত রদ্দি মালগুলো চালাতে পারবো। তার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেবো ওদের ঘরে ঘরে। এটম বোম মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেব ওদের। আর মেশিন গান দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো ওদের শান্তির কপোতকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন্ পাপিষ্ঠরা এ নিষ্পাপ মানুষগুলোকে এমন করে হত্যা করেছে? নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কথা কয়টি।

–কি বললে ডাক্তার? মেয়েটি চকিতে আমার দিকে ফিরে চাইলো। তুমি ওদের পাপিষ্ঠ বললে? কিন্তু ওরা এ কথা শুনলে তোমাকেও এমনি করে মারবে। এরা তোমার চেয়েও অতি সামান্য কথা বলেছিলো, এরা শুধু বলেছিল আমরা যুদ্ধ চাই না। এ না চাওয়াটাই এদের কাল হয়েছে, ওরা এদের এক একটা করে ধরে এনে এখানে জড়ো করলো; আর নির্বিবাদে টিপে দিল মেশিন গানের ট্রিগার।

কিছুক্ষণ চুপ রইলো মেয়েটি। দূর সমুদ্রের বাতাসে ওর চুলগুলো উড়তে আরম্ভ করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটোকে কামড়িয়ে ধরে, পায়ের নিচেকার রক্তে ভেজা মাটির দিকে চোখ দুটো নামিয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর এক সময়ে আবার বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু কেন? কেন আমরা যুদ্ধ করবো? ওরাওতো আমাদের মা, ভাই, বোনের মত, ওদেরো ছেলেমেয়ে আছে, বাড়িতে সুন্দর ফুটফুটে বউ আছে, আরো আছে আত্মীয়পরিজন। ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, সাধ, স্বপ্ন আছে, যেমনটি আমাদের আছে, মানুষের কল্পিত একটা সীমারেখার এপারে, ওপারে বলেই কি আমরা পরস্পর শত্রু? তুমিই বলো ডাক্তার! সভ্যতার একি নিষ্ঠুর পরিহাস। মানুষকে সে মানুষের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্ররোচণা দেয়।

আবার কিছুক্ষণ থামলো মেয়েটি, দূরে পূর্বাকাশে শুকতারাটা জ্বল জ্বল করছে, মেয়েটি একবার সে দিকে ফিরে চাইলো, তারপর ক্ষুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যর্থতার তীব্র হুতাশনে ভেজা কণ্ঠে বললো, জীবনটা এ রকম হলো কেন ডাক্তার? কত স্বপ্ন ছিল আমার! যা নারীর চিরন্তন স্বপ্ন, একটা সুন্দর সুঠাম স্বামী, ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ছেলে, আর ফুর্তির জোয়ারে ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর। কিন্তু একি হলো ডাক্তার? একি হল? যুদ্ধ আমাদের একি সর্বনাশ করলো। টপ টপ করে জল পড়ছিলো ওর চোখ দিয়ে। সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না– দেখ, দেখ ডাক্তার! ওই দু'বছরের ছেলেটি, সে ওদের কাছে কি অপরাধ করেছিলো, যার জন্য এ ক্ষুদ্র দেহটাকে ওরা বুলেটের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে? দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম, এ দৃশ্য দেখবার নয়, কিছুতেই নয়।

এই মুহূর্তে আট বছর আগেকার আর একটা ছবি, পাশাপাশি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে।

পথে পথে মোড়ে মোড়ে আর রাস্তার আনাচে-কানাচে বসে বসে ঠুকছে, রক্ত মাংসহীন শবের দল, এক নয় দুই নয় হাজার হাজার। পথের কুকুর আর আকাশের শকুনদের ভোজসভা বসেছে নর্দমার পাশে। আধমরা মানুষগুলোকে টানা–হেচড়া করে মহা–উল্লাসে ভক্ষণ করছে ওরা। দ্বিতীয় মহাসমর। আর দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সোনার বাংলা, চারদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই! বস্ত্র নেই! নেই! নেই! কিছু নেই! শুধু আছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আর অভাব অনটন।

বলতে না বলতেই বাজার থেকে চালডাল সবকিছু গেলো অদৃশ্য হয়ে, আর হু হু করে বেড়ে গেলো জিনিসপত্রের দর। কালকের দু' পয়সার পাউরুটি রাত না পোহাতেই হয়ে গেলো দু'আনা। তারপর চার আনা। পাঁচ টাকা মণের চাল তা কিনা চোখের পলক না ফেলতেই গিয়ে ঠেকলো পঞ্চাশের কোঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিতার পর চিতা জ্বলে উঠলো সোনা ফলানো দেশের পল্লীতে পল্লীতে, মাটি খুঁড়ে কবর দেবার অবসর কই? খরস্রোতা নদীগুলোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মরা টানতে টানতে।

শান্তিপ্রিয় মানুষ সব ভীত, ত্রস্ত এই বুঝি সাইরেন বাজবে, আর সাথে সাথে আরম্ভ হবে নরহত্যা যজ্ঞ। এক মুহূর্তে বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষের বহু কষ্টে গড়া ওই সুন্দর শহর, বহু মূল্যবান মিউজিয়াম আর বহু সাধনার পর সৃষ্ট ওই বিশাল পাঠাগার।

এই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো কৃষকের রক্ত দিয়ে বোনা পাটের গাছগুলো, আর শ্রমিকের একমাত্র মাথা গুঁজবার সম্বল খোলার ঘরটি। বহু কথা, বহু ছবি, এক নিমেষে, চলচ্চিত্রের মত রেখাপাত করে গেলো আমার মানসপটে।

গরিব চাষী রহিম শেখের চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই ওর লিকলিকে বৌটির চোখে, আর অবলা মেয়েটির চোখে, পেটের অশান্ত পোকাগুলোর তীব্র দংশনে ছটফট করছে ওরা, ঘুম কি করে আসবে।

ইজ্জত গেল! ইজ্জত গেল ওদের। মান-সম্মান নিয়ে বাঁচা বুঝি দায় হয়ে পড়লো এবার। শিকারি কুকুরের মত ওঁত পেতে আছে গোরা সৈন্যগুলো সব। বদ্ধ দোরের আড়াল থেকে দুরু দুরু বুকে কাঁপছে গ্রাম্য তরুণীরা। মাতৃময়ী বাঙালি নারীর দেহ নিয়ে চারদিকে চলছে ছিনিমিনি খেলা, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানরা সব ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আঁস্তাকুড়ের ছাইয়ের গাদায়, শহরের নর্দমায়, আর জলপচা খানা ডোবায়।

এক হাত কাপড়। শুধু এক হাত কাপড় আর এক মুঠো ভাতের জন্য ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে ওদের আপন পেটের ছেলেমেয়েকে আর কলমা পড়ে বিয়ে করা বৌকে।

কি একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। শুধু একটা মহাসমর। আর মানুষগুলোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো আদিম যুগের নরখাদকের দেশে।

জানো ডাক্তার? মেয়েটির গলার স্বরে হঠাৎ চিন্তার স্রোতটা মাঝপথেই বাধাপ্রাপ্ত হলো, চেয়ে দেখলাম মেয়েটি আবার বলতে আরম্ভ করেছে– এ পৃথিবীতে বিচার বলে কিছু নেই। বিচার যদি থাকতো, তাহলে এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের কেউ বিচার করলো না কেন? ওদের রচিত আইনে আছে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, যার আশ্রয় নিয়ে ওরা দৈনন্দিন কত নিরাপরাধীকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মারে। কিন্তু ওদের বেলায় এ আইন কোথায় গেল? তুমিই বল ডাক্তার! পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় হত্যাকাণ্ড আর কোনদিন ঘটেছিল কি? দেখো, সেই খুনী আসামীদের মানুষগুলো সব মাথায় তুলে নাচছে, গলায় মালা পরিয়ে বলছে– পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর! অদ্বিতীয় মহামানব।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ও, বাতাসের মৃদু প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, দূরে ফ্রন্টের সৈন্যদের ঘুম আরো ঘনীভূত হয়ে এসেছে, ভোরের হিমেল হাওয়ার মৃদু পরশে।

ডাক্তার। আবার ওর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, তোমার কাজের খুব ক্ষতি করে ফেললাম ডাক্তার। কিছু মনে করো না, ভোর হয়ে এলো প্রায়। দেখছ না। আকাশের তারাগুলো সব একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে?

আমি চুপ, ও আবার বললো– আচ্ছা ডাক্তার, বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি কোনটা বলতে পারো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ এ প্রশ্নের হেতু? নিজের মনকেই নিজে প্রশ্ন করলাম প্রথমে, তারপর উত্তর দিলাম– হ্যাঁ, প্লেগ, যার দ্বারা আক্রান্ত হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মারা যায়।

–অদ্ভুত কথা শুনালে ডাক্তার। ভ্রূজোড়া কপালে উঠে এলো মেয়েটির। প্লেগ! প্লেগ একটা রোগ তা জানি, সে রোগের ঔষধ আবিষ্কার করবার জন্যও তোমরা অনেক চেষ্টা করছো। কিন্তু আশ্চর্য ডাক্তার, যুদ্ধ নামক যে ব্যাধিটা ঘণ্টায় হাজার হাজার মানুষের জীবন নাশ করে চলেছে, তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা কি করছো? তোমরা রোগের চিকিৎসা করো, একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্য তোমাদের কত সাধ্য সাধনা, কত সংগ্রাম। কিন্তু লাখো মানুষের মৃত্যুকে তোমরাা নির্লিপ্তের মতো উপেক্ষা করে যাচ্ছো কেন?

শুধু বিস্মিত হলাম না, অবাকও হলাম, এ নারী বলে কি?

ও আবার বললো– একটা কাজ করতে পারবে ডাক্তার। একটা মহৎ কাজ।

মুখ ফুটে কিছু বলতে হলো না আমার চোখ দুটোই জানিয়ে দিল– কি কাজ, আগে সেটাই বলো, পারিতো নিশ্চয়ই করবো।

–ভয় পেয়ো না ডাক্তার। তোমায় আমি এমন কোন কাজের ভার দেবো না, যা তুমি বইতে পারবে না। ও এবার আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। আমি অবাক হলাম, ওর চোখের পলক পড়ে না কেন? ও বলতে আরম্ভ করলো– তোমায় আমি বলবো না যে, তুমি যুদ্ধটা থামিয়ে দাও, শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও! কারণ তা তোমার একার কাজ নয়। তুমি একা তা পারবে না।

ওর দৃষ্টি তখন দূর দিগন্তের সীমারেখার দিকে প্রসারিত। চোখের তারায় তারায় স্ফুলিঙ্গ দেদীপ্যমান। ও আবার বলে চললো- কিন্তু একটা কথা জানো ডাক্তার? মাটির মানুষগুলো নিশ্চয়ই একদিন জাগবে। আর শয়তানদের মুখোশ খুলে ফেলবে তারা। তাদের জাগরণের দুর্বার স্রোতে কোথায় ভেসে যাবে যুদ্ধের দালালরা আর অত্যাচারী ধনকুবেররা তখন একটা নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেখানে দুঃখ, দুর্দশা অভাব অনটন বলে কিছু থাকবে না, মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, এত হিংসা–বিদ্বেষ, সব কিছুর অবসান হবে।

আর পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে, নয় কি ডাক্তার।

–কি কাজ তা তো এখনো বললে না তুমি। ওর কথার মাঝখানেই বাধ দিলাম। যদিও ওর কথাগুলো বাঁচবার উদ্দীপনা আর নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিচ্ছিল আমাকে। কিন্তু সময় বড্ড কম।

–হ্যাঁ ডাক্তার। কাজের কথাটাই বলবো এবার তোমায়। মেয়েটি এবার ডান দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর সামনে একটা ঝোপের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বললো– ওই যে ডাক্তার, চেয়ে দেখ, গাছের আড়ালে একটা দালানের ভাঙ্গা কার্নিশ দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে,–হ্যাঁ, আবছা দেখতে পাচ্ছি। আমি সায় দিলাম।

তোমাকে সেখানে যেতে হবে ডাক্তার।

কিন্তু কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত হাসি খেলে গেলো মেয়েটির দু'ঠোঁটের মাঝপথ দিয়ে, আমি শপথ করে বলতে পারি, অমন ব্যথাতুর হাসি আমার জীবনে আমি কাউকে হাসতে দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বললো, যাও ডাক্তার! নিজ চোখে দেখবে।

–কি ভাবছো ডাক্তার? আমার অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে ও আবার প্রশ্ন করলো।

–হুঁ!–কই কিছু না তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে।

–ভাবছিলাম? ও.....হ্যাঁ, ভাবছিলাম তোমার কথা।

.....আমার কথা?

হ্যাঁ, ভাবছিলাম পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক যদি তোমার মতো হতো, তাহলে কি সুন্দরই না হতো এ পৃথিবীটা।

–ও.....! মেয়েটি এবার আমার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে তাকালো, অন্ধকার দূর হয়ে ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ। আর দাঁড়ালাম না সেখানে, এগিয়ে চললাম সেই ভাঙা কার্নিশটা লক্ষ্য করে। কিছুদূর এসে একবার পিছন দিকে ফিরে চাইলাম, ও দাঁড়িয়ে আছে, নিথর নিষ্কম্প, পলকহীন চাহনি, তারপর গুনে গুনে আরও গোটা পঞ্চাশেক পদক্ষেপ সামনে এসে আর একবার ফিরে চাই, নেই ও নেই, ওর চিহ্নও নেই।

কাদের পদশব্দ? মাটির ওপর ভারি বুট জুতার আওয়াজ না? এক নয়, অনেক। গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালাম, খাকি ইউনিফর্ম পরা সৈন্যগুলো হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি করে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো, তারপর.....অনেকক্ষণ .....অনেক উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত কেটে গেলো, অপেক্ষায় আছি, ওরা কখন বেরুবে। হ্যাঁ, এক সময় ওরা বেরিয়ে এলো, এলোমেলো উস্কখুস্ক চুল, শৃঙ্খলাহীন পদবিক্ষেপে ওরা একের গায়ের উপর অন্যে হেলে পড়লো আর মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী কতগুলো শব্দের উচ্চারণ করতে লাগলো, যা সভ্য মানুষকে বলতে আমি কোনদিনও শুনিনি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আরো কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা ধীরে ধীরে কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হলে গেলো।

অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি। দেয়ালে চুনকাম পড়েনি, তাও কয়েক বছর হবে। মরচে পড়া জানালা দরজাগুলো কোন রকম ঝুলে আছে। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য মাকড়সার জাল। দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটো। কে?.....চমকে পিছিয়ে এলাম দু'হাত। আধভাঙা ডেসিং টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ফটোটা নামিয়ে নিলাম, অতি সন্তর্পণে। রুমাল দিয়ে ধুলোবালিগুলো ঝেড়ে নিলাম, তারপর দু'চোখে ভরে তার দিকে তাকালাম। সেই অপরূপা তরুণী, মুখের কোণে স্নিগ্ধ হাসির রেখা, নিচে ছোট করে লেখা নাম–লু–ই–সা।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা টানতেই খুলে গেলো, অনেকগুলো খাতা–পত্র সাজানো রয়েছে, থাকে থাকে, শুধু ধুলোবালি জমে আছে চারপাশে। একখানা খাতা হাতে তুলে নিলাম, কবিতার খাতা, প্রথম পৃষ্ঠাতেই লাল কালিতে লেখা বড় বড় করে কটা লাইন।

যুদ্ধ আমি চাই না, কারণ, যুদ্ধ এমন একটা ব্যাধি যে শুধু দুর্বল এবং রোগা লোকের জীবন হরণ করে না, সুস্থ সবল এবং সতেজ মানুষকেও হত্যা করে।

আমি শান্তি চাই, কারণ–শান্তি মানুষকে–তারপর পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। আর দেখে গেলাম, কবিতার পর কবিতা; শেষের কবিতা একটু শব্দ করেই পড়লাম–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে আমার ভীরু মন।
চলার পথে কভু যদি–
উন্মত্ত সাগর কিবা–
ক্ষুধিত ব্যাঘ্রেরও
সম্মুখীন হই।
তুমি আমারে পিছিয়ে এনো না।
শক্তি দিয়ো সাহস দিয়ো!
যেন–সে সাগর আমি ডিঙ্গাতে পারি।
সে বাঘ যেন হত্যা করতে পারি।
আর– আমার
রুটি, রুজি আর অধিকারের
দাবি নিয়ে যখন
আমি এগিয়ে যাবো।
সামনে উদ্ধত রাইফেল দেখে,
তুমি আমার মাথা নত করে দিও না।
আমার রুগ্ন মায়ের কথা চিন্তা করে
আমার নগ্ন বৌ–এর
সকরুণ চাহনির কথা মনে করে
আর– আমার হতভাগা
শিশুর শোচনীয় মৃত্যুর
কথা স্মরণ করে
তুমি আমাকে রুখে
দাঁড়াবার সামর্থ্য দিয়ো!
শক্তি দিয়ো!
যদি ওরা গুলি চালায় চালাতে দাও।
ভীত হয়ো না তুমি– কত
মারবে ওরা?
শত?.....হাজার? লক্ষ? কোটি?
এরচেয়েও বেশি?
না–গো–না, ওদের গুলি
ততক্ষণে ফুরিয়ে যাবে।
আর– এক কোটি প্রাণের
পরিবর্তে শতকোটি
প্রাণ মুক্তি পাবে–
শোষণের জিঞ্জির হতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া শেষ করে খাতাগুলো ড্রয়ারের ভেতর রেখে দিলাম। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, বেলা এগারোটা। খক্.....খক্ করে কে যেন কাশলো, আশেপাশে কোথায়! তারপর অস্পষ্ট কাতরানির শব্দ– মাগো।....আর যে পারি না মা।

পাশের রুমে ঢুকতেই মেঝের উপর অনেকগুলো বোতলের ভগ্নাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। মেঝেটা একেবারে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপলাম, পচা মদের গন্ধ বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে।

তারপর যে রুমটিতে পা দিলাম, সেটা একটা লম্বা হল রুম। সামনে একটা জ্যান্ত বাঘ দেখলেও বুঝি এত চমকাতাম না আমি যেমন করে চমকে উঠলাম। শুধু অবাক হলাম না, শরীর যেন হিম হয়ে এলো আমার। শরীরের তন্ত্রীগুলো এক মুহূর্তের জন্য অচল থেকে আবার সচল হয়ে এলো, পা দুটো দু'বার ঠক্ঠক্ করে কেঁপে তারপর স্থির হলো। ঝাপসা দৃষ্টিশক্তিকে আরো প্রসারিত করে আমি ওদের দিকে তাকালাম।

উলঙ্গ। একেবারে উলঙ্গ, বিবস্ত্রা নারী দেহ সব ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর, এখানে ওখানে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলার মতো। শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে ওদের শীর্ণ হাতগুলো, দেয়ালের আঙটার সাথে। কাতরাচ্ছে ওরা– মাগো! আর যে সইতে পারি না মা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। উঃ! বার কয়েক ঘুরপাক দিয়ে উঠলো মাথাটা। মানুষগুলো সব কি পশু হয়ে গেল নাকি? মনুষ্যত্বের এতটুকু নিদর্শনও কি তাদের ভেতর অবশিষ্ট নেই। অসংযত পা দুটো খুট করে শব্দ করে উঠলো, ক্ষুধিত সিংহের সামনে পড়লে, নিরস্ত্র মানুষ যেমন ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে, ওরাও ঠিক তেমনি আর্তনাদ করে উঠলো, –মাগো। এবার আর বাঁচবো না। আর, তারপর– কোটরে ঢোকা চোখগুলো উলঙ্গ করে, আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওরা। অজস্র অভিশাপ ঝরে পড়ছে ওদের ও চোখগুলো থেকে। ওরা অভিশাপ দিচ্ছে, ওদের জন্মদাতাকে; মানুষের আদিম বন্যতাকে, আর– ওদের জীবন–যৌবন হরণকারীদিগকে।

–হাঃ!–হাঃ! হাঃ! আবার মেজর কলিনসের সেই অট্টহাসি। আবার রক্তাক্ত সুরা হাতে বলে যাওয়া, মেজর কলিনসের সেই কথাগুলো, –হাঃ! হাঃ!! হাঃ! ইরান, তোরান আর মিসরের নেকাব পরা মেয়ের মোমের মতো দেহগুলো আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি হয়ে রইবে। রাশ্যার উজবেকি আর কাজাকি তরুণীর শালীনতাকে বুকে ছুরি হেনে, ওদের ন্যাংটা নাচাবো আমরা, ভারতের লজ্জাবতী মাংস-পিণ্ডগুলোর ঘোমটা উলটিয়ে আমরা চুমো খাব। আর আমাদের কামনা চরিতার্থের জন্য ওদের আমরা ব্যবহার করবো। ঠিক জুতো আর মুজোকে আমরা যে রকম ব্যবহার করে থাকি।

যন্ত্রচালিতের মতো এসে দাঁড়ালাম ওদের পাশে। অবাক হলো ওরা, যখন আমি ওদের বাঁধনগুলো একে একে খুলে দিতে লাগলাম। ওদের ভয় দূর হলো, লজ্জা এসে পূরণ করলো ভয়ের স্থান, ওরা শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে বুকটাকে ঢেকে, পাশের ঘরটাতে পালিয়ে গেলো। সব শেষ, শুধু আর একটি মাত্র বাকি, ওর বাঁধনটা খুলতে গিয়ে ইলেকট্রিকের সক্ পাওয়ার মতো আমি লাফিয়ে উঠলাম। এত ঠাণ্ডা, এত শীতল।

–হতভাগী মেয়েটা মারা গেছে। গলার স্বরটা কেঁপে উঠলো আমার। আর সাথে সাথে একটা মেয়ের করুণ চিৎকার শোনা গেলো পাশের ঘর থেকে– দিদিগো! দি–দি। ঝড়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগে সে ছুটে এলো আমার সামনে মৃতা মেয়েটির পাশে, আর তার উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটাকে ধরে চিৎকার দিলো প্রথমে, তারপর ওর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে কান্নার জোয়ারে ভেসে পড়লো মেয়েটি। কে?–লু–ই–সা? অবাক বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইলাম আমি। হ্যাঁ, লু–ই–সাই বটে। মৃতা তরুণীটি লুইসারি প্রতিকৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমায়।

ওঘর থেকে একজন চিৎকার করে বললো ওর নাম, লু–ই–সা, আজ দু'দিন ধরে ভীষণ ছটফট করছিলো ও।

–কাল বিকেলে ওকে আমি 'একফোঁটা জল, এক ফোঁটা জল' বলে চিৎকার করতে শুনেছি। বললো, আর একজন।

গায়ের আলেস্টারটা খুলে লুইসার নগ্ন দেহটা ঢেকে দিলাম আমি। প্রচণ্ড শীতের ভেতরেও আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। হতবিহ্বল নেত্রে আমি চেয়ে রইলাম, লুইসার শুকনো মুখটার দিকে। ওর জিভটা এখনও বেরিয়ে আছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে। মনে হলো সে চিৎকার করে বলছে– এক ফোঁটা জল! এক ফোঁটা জল। ওর ছোট বোনটা তখনও কাঁদছে, আরও চেঁচিয়ে আরও করুণ গলায়। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, ফোঁস করে ও সাপের মতো ফণা তুলে দূরে সরে গেলো। উঃ! এ খাকি পোশাকের প্রতি কি অদ্ভুত ঘৃণা জমে আছে ওদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে।

আবার পদশব্দ! বেশি নয় অল্প কয়েকটা। পাশের ঘরের মেয়েগুলো নিঃশ্বাস নেওয়াও বন্ধ করে ফেললো নাকি? নইলে এত গভীর নীরবতা কেন? কিন্তু ডাকবার অবসর কোথায়। লুইসার ছোট বোনটা, বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে তার মৃতা বোনটিকে ফেলে। নরখাদকের গন্ধ পেয়েছে তাই তারা পালাচ্ছে।

চোখ ফিরাতেই চেয়ে দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে মেজর কলিনস্। মেজর কলিনস্ হাসছে আর বলছে–হাঃ! হাঃ! তুমিও ফুর্তি করতে এসেছো ডাক্তার? হ্যাঁ ফুর্তি করো, ফুর্তি করো ডাক্তার! আমাদের সৈন্যরা ওদের ত্রিশটা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ফুর্তি করো ডাক্তার! ফুর্তি করো।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অনুভব করলাম জর্জ, এডোয়ার্ড আর লুইয়ের আত্মা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমায়, লুইসা আমার কানে কানে বলছে,–ডাক্তার।–লাখো হাজারো মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহের কথা কি এত শিগ্রীই তুমি ভুলে গেলে?

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে মেজর কলিনসের মুখে আমি বসিয়ে দিলাম চড়।

শান্তি সংগ্রামে আমার প্রথম পদক্ষেপ।

রচনাকাল : নভেম্বর, ১৯৫২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে চার বছর আগে যাকে হাইকোর্টের মোড়ে শেষবারের মতো দেখেছিলাম, যাকে জীবনে আর দেখবো বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি– সেই তপু ফিরে এসেছে। ও ফিরে আসার পর থেকে আমরা সবাই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। রাতে ভালো ঘুম হয় না। যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়, লেপের নিচে দেহটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে।

দিনের বেলা ওকে ঘিরে আমরা ছোটখাটো জটলা পাকাই।

খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে আসে ওকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। আমরা যে অবাক হই না তা নয়। আমাদের চোখেও বিস্ময় জাগে। দু'বছর ও আমাদের সাথে ছিলো। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরও আমরা রাখতাম। সত্যি কি অবাক কাণ্ড দেখতো, কে বলবে যে এ তপু। ওকে চেনাই যায় না। ওর মাকে ডাকো, আমি হলফ করে বলতে পারি, ওর মা–ও চিনতে পারবে না ওকে।

চিনবে কি করে? জটলার একপাশ থেকে রাহাত বিজ্ঞের মতো বলে, চেনার কোন উপায় থাকলে তো চিনবে। এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আমরাও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি ক্ষণিকের জন্য।

অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে রাহাতকে পাঠিয়েছিলাম, তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য।

সারাদিন এখানে সেখানে পই পই করে ঘুরে বিকেলে যখন রাহাত ফিরে এসে খবর দিলো, ওদের কাউকে পাওয়া যায়নি। তখন রীতিমত ভাবনায় পড়লাম আমরা। এখন কি করা যায় বল তো, ওদের একজনকেও পাওয়া গেল না? আমি চোখ তুলে তাকালাম রাহাতের দিকে।

বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়ে রাহাত বললো, ওর মা মারা গেছে।

মারা গেছে? আহা সেবার এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কি কান্নাটাই না তপুর জন্যে কেঁদেছিলেন তিনি। ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখেই পানি এসে গিয়েছিলো।

বউটার খবর?

ওর কথা বলো না আর। রাহাত মুখ বাঁকালো। অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে।

সেকি! এর মধ্যেই বিয়ে করে ফেললো মেয়েটা? তপু ওকে কত ভালবাসতো। নাজিম বিড়বিড় করে উঠলো চাপা স্বরে।

সানু বললো, বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে নাকি মেয়েটা। বলে তপুর দিকে তাকালো সানু।

আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি, কে বলবে এ চার বছর আগেকার সেই তপু, যার মুখে এক ঝলক হাসি আঠার মতো লেগে থাকতো সব সময়।

কি হাসতেই না পারতো তপুটা। হাসি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখতো সে। সে হাসি কোথায় গেল তপুর? আজ তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে কেন?

দু'বছর সে আমাদের সাথে ছিলো।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

তপু ছিলো আমাদের মাঝে সবার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হবে, ও–ই ছিলো একমাত্র বিবাহিত।

কলেজে ভর্তি হবার বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু। সম্পর্কে মেয়েটা আত্মীয়া হতো ওর। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি, আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসতো এখানে। ও এলে আমরা চাঁদা তুলে চা আর মিষ্টি এনে খেতাম। আর গল্প গুজবে মেতে উঠতাম রীতিমত। তপু ছিল গল্পের রাজা। যেমন হাসতে পারতো ছেলেটা, তেমনি গল্প করার ব্যাপারেও ছিল ওস্তাদ।

যখন ও গল্প করতে শুরু করতো, তখন আর কাউকে কথা বলার সুযোগ দিতো না। সেই যে লোকটার কথা তোমাদের বলছিলাম, না সেদিন। সেই হোঁৎকা মোটা লোকটা, ক্যাপিটালে যার সাথে আলাপ হয়েছিল, ওই যে, লোকটা বলছিলো সে বার্নাডশ' হবে, পরশু রাতে মারা গেছে একটা ছ্যাকরা গাড়ির তলায় পড়ে।.... আর সেই মেয়েটা, যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো.....ও মারা যাবার পরের দিন বিলেতি সাহেবের সাথে পালিয়ে গেছে....রুণী মেয়েটার খবর জানতো! সে কি রুণীকে চিনতে পারছো না? শহরের সেরা নাচিয়ে ছিলো, আজকাল অবশ্য রাজনীতি করছে। সেদিন দেখা হল রাস্তায়। আগে তো পাটকাঠি ছিলো। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। দেখা হতেই রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়ালো। বিয়ে করেছি শুনে জিজ্ঞেস করলো, বউ দেখতে কেমন?

হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ, কথা বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না; রাহাত থামিয়ে দিতে চেষ্টা করতো ওকে।

রেণু বলতো, আর বলবেন না, এত বকতে পারে–।

বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।

তবু থামতো না তপু। এক গাল হাসি ছড়িয়ে আবার পরম্পরাহীন কথার তুবড়ি ছোটাত সে, থাকগে অন্যের কথা যখন তোমরা শুনতে চাও না নিজের কথাই বলি। ভাবছি, ডাক্তারিটা পাশ করতে পারলে এ শহরে আর থাকবো না, গাঁয়ে চলে যাবো। ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবো সেখানে।

আর, তোমরা দেখো, আমার ঘরে কোন জাঁকজমক থাকবে না। একেবারে সাধারণ, হাঁ, একটা ছোট্ট ডিসপেনসারি, আর কিছু না। মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত ছিল তপু।

এককালে মিলিটারিতে যাবার সখ ছিল ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বরাত মন্দ। ছিলো জন্মখোঁড়া। ডান পা থেকে বাঁ পাটা ইঞ্চি দু'য়েক ছোট ছিলো ওর। তবে বাঁ জুতোর হিলটা একটু উঁচু করে তৈরি করায় দূর থেকে ওর খুঁড়িয়ে চলাটা চোখে পড়তো না সবার।

আমাদের জীবনটা ছিলো যান্ত্রিক।

কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠতো সবার আগে। ও জাগাতো আমাদের দু'জনকে, ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছো না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছ কেন, ওঠো। গায়ের উপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমাদের ঘুম ভাঙাতো তপু। মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়ে বলতো, দেখ, বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না ওঠো।

আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরি করতো তপু।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আমরা বই খুলে বসতাম। তারপর দশটা নাগাদ স্নানাহার সেরে ক্লাশে যেতাম আমরা।

বিকেলটা কাটতো বেশ আমোদ ফুর্তিতে। কোনদিন ইস্কাটনে বেড়াতে যেতাম আমরা। কোনদিন বুড়িগঙ্গার ওপারে। আর যেদিন রেণু আমাদের সাথে থাকতো, সেদিন আজিমপুরার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের ভেতরে হারিয়ে যেতাম আমরা।

রেণু মাঝে মাঝে আমদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড়মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। তপু বলতো, দেখো রাহাত আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান?

কি?

এই যে আঁকাবাঁকা লালমাটির পথ, এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।

একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে? ভ্রূ জোড়া কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করতো রাহাত।

না না কবি হতে যাব কেন। ইতস্তত করে বলতো তপু। কেন যেন মনে হয়....।

স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন নামতো তার।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

দিনগুলো বেশ কাটছিলো আমাদের। কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়লো। হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ানো মাঠটাতে অগুনতি লোকের ভিড় জমেছিলো সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়োরা এসে জমায়েত হয়েছিলো সেখানে। কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারো হাতে শ্লোগান দেবার চুঙ্গো, আবার কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলান কয়েকটা রক্তাক্ত জামা। তর্জনি দিয়ে ওরা জামাগুলো দেখাচ্ছিলো, আর শুকনো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এলোমেলো কি যেন বলছিলো নিজেদের মধ্যে।

তপু হাত ধরে টান দিলো আমার, এসো।

কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, ওদের সাথে।

চেয়ে দেখি, সমুদ্রগভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

এসো।

চলো।

আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।

একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

যা ভেবেছিলাম, দৌড়ে এসে তপুর হাত চেপে ধরলো রেণু। কোথায় যাচ্ছ তুমি। বাড়ি চলো। পাগল নাকি, তপু হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বললো, তুমিও চলো না আমাদের সাথে। না, আমি যাবো না, বাড়ি চলো। রেণু আবার হাত ধরলো ওর।

কি বাজে বকছেন। রাহাত রেগে উঠলো এবার। বাড়ি যেতে হয় আপনি যান। ও যাবে না।

মুখটা ঘুরিয়ে রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক পলক তাকালো রেণু। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, দোহাই তোমার বাড়ি চলো। মা কাঁদছেন।

বললাম তো যেতে পারবো না, যাও। হাতটা আবার ছাড়িয়ে নিলো তপু।

রেণুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো। বললাম, কি ব্যাপার আপনি এমন করছেন কেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি বাড়ি যান।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে টলটলে চোখ নিয়ে ফিরে গেলো রেণু।

মিছিলটা তখন মেডিক্যালের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে।

তিন জন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।

রাহাত শ্লোগান দিচ্ছিলো।

আর তপুর হাতে ছিলো একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিলো, রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।

মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কি বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।

তপু! রাহাত আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি তখন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দু'জন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মতো জমে গিয়েছিলো, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম, রাহাত পালাও।

কোথায়? হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো রাহাত।

তারপর উভয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে। সে রাতে, তপুর মা এসে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন এখানে। রেণুও এসেছিলো, পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিলো তার। কিন্তু আমাদের দিকে একবারও তাকায়নি সে। একটা কথাও আমাদের সাথে বলেনি রেণু। রাহাত শুধু আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিলো, তপু না মরে আমি মরলেই ভাল হতো। কি অবাক কাণ্ড দেখতো, পাশাপাশি ছিলাম আমরা। অথচ আমাদের কিছু হলো না, গুলি লাগলো কিনা তপুর কপালে। কি অবাক কাণ্ড দেখতো।

তারপর চারটে বছর কেটে গেছে। চার বছর পর তপুকে ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনদিন।

তপু মারা যাবার পর রেণু এসে একদিন মালপত্রগুলো সব নিয়ে গেলো ওর। দুটো স্যুটকেস একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক, আর একটা বেডিং। সেদিনও মুখ ভার করে ছিলো রেণু।

কথা বলেনি আমাদের সাথে। শুধু রাহাতের দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, ওর একটা গরম কোট ছিলো না, কোটটা কোথায়?

ও, ওটা আমার স্যুটকেসে। ধীরে কোটটা বের করে দিয়েছিলো রাহাত। এরপর দিন কয়েক তপুর সিটটা খালি পড়ে ছিলো। মাঝে মাঝে রাত শেষ হয়ে এলে আমাদের মনে হতো, কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে আমাদের।

ওঠো, আর ঘুমিও না, ওঠো।

চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু ওর শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠতো। তারপর একদিন তপুর সিটে নতুন ছেলে এলো একটা। সে ছেলেটা বছর তিনেক ছিলো।

তাররপর এলো আর একজন। আমাদের নতুন রুমমেট বেশ হাসিখুশি ভরা মুখ।

সেদিন সকালে বিছানায় বসে 'এনাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিলো সে। তার চৌকির নিচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনের 'স্কাল'টা বের করে দেখছিলো আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ছিলো সে। তারপর এক সময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, রাহাত সাহেব, একটু দেখুন তো, আমার 'স্কালে'র কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন?

কি বললে? চমকে উঠে উভয়েই তাকালাম ওর দিকে।

রাহাত উঠে গিয়ে 'স্কাল'টা তুলে নিলো হাতে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে। হাঁ, কপালের মাঝখানটায় গোল একটা ফুটো, রাহাত তাকালো আমার দিকে, ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হলো না আমার। বিড়বিড় করে বললাম, বাঁ পায়ের হাড়টা দু'ইঞ্চি ছোট ছিলো ওর।

কথাটা শেষ না হতেই ঝুড়ি থেকে হাড়গুলো তুলে নিলো রাহাত। হাতজোড়া ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলো ওর। একটু পরে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বললো বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দু'ইঞ্চি ছোট। দেখো, দেখো।

উত্তেজনায় আমিও কাঁপছিলাম।

ক্ষণকাল পরে 'স্কাল'টা দু'হাতে তুলে ধরে রাহাত বললো, তপু।

বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।

—০—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~